চাঁদমামা
উপন্যাস সমগ্র ২

চাঁদমামা

উপন্যাস সমগ্র

২

সম্পাদনা

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ই-বুক প্রস্তুত ও পরিবেশনায়

বইরাগ পাবলিকেশন

www.boiraag.in

contact@boiraag.in

বইরাগ পাবলিকেশন বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষার ই-বই প্রকাশ করে, বইগুলি অ্যামাজন কিন্ডল, গুগল প্লেবুক এবং কোবো তে পাওয়া যায় যা নিশ্চিন্ততা দেয় বইগুলির বৈধতার! আপনি আপনার বইটি ইবুক হিসেবে প্রকাশ করতে চাইলে যোগাযোগ করুন আমাদের সঙ্গে। আমাদের প্রকাশিত ইবুক ক্যাটালগের জন্যে দেখুন আমাদের ওয়েবপেজ

সূচিপত্র

‘চাঁদমামা’-তে প্রকাশিত উপন্যাসের তালিকা

১. যক্ষপর্বত
২. বিচিত্র তিন কন্যা
৩. মায়া সরোবর
৪. ভালুক তান্ত্রিক
৫. ধূমকেতু
৬. ভয়ঙ্কর দেশে
৭. তিন জন তান্ত্রিক
৮. কাঁসার দূর্গ
৯. জ্বালা দ্বীপ
১০. সোনার উপত্যকা
১১. পাঁচটি প্রশ্ন
১২. পিতা পুত্র
১৩. দস্যু যুবরাজ
১৪. অপূর্বের দুঃসাহসিক অভিযান
১৫. জাদু প্রাসাদ
১৬. অভিশপ্ত পুষ্প
১৭. রহস্যময় কণ্ঠহার
১৮. অপূর্ব সুন্দরী
১৯. ইউলিসিসের অভিযান
২০. মহামতি অশোক
২২. স্বর্ণ সিংহাসন

বিচিত্র তিন কন্যা

কয়েক হাজার বছর আগের কথা। শ্রাবস্তী নগরে এক দানশীল রাজা ছিলেন। আশেপাশে যত রাজা ছিলেন তাঁদের চেয়ে তাঁর নামডাক ছিল বেশি। তিনি দানশীল ছিলেন বলেই যে খ্যাতি ছিল তাই নয়। তাঁর ছিল লক্ষ লক্ষ সেনা। বহু দাস-দাসী। প্রজাদের সংখ্যা অনেক। তাঁর ধনভাণ্ডারে ভরতি ছিল হিরা, পান্না, চুনি, জহরত প্রভৃতি মূল্যবান পাথর। ঘড়া ঘড়া সোনা ছিল, রুপা ছিল। তাঁর ভাগ্য ছিল সুপ্রসন্ন। যে কাজে তিনি হাত দিতেন সফল হতেন। তাঁর সঙ্গে যার বিয়ে হয়েছিল, তিনি ছিলেন অপরূপ সুন্দরী। তাঁর বিষয়ে যে আর একটি কথা না বললেই নয়। তাঁর কোনো অহংকার ছিল না। যেকোনো গরিব প্রজা তাঁর কাছে গিয়ে খালি হাতে ফিরে আসত না। যেমন তাঁর আয় হত তেমনি তিনি দানও করতেন। তাই দানশীল রাজা বলতে যেকোনো দেশের লোক তাঁকেই বুঝত। অন্যান্য দেশের লোকও ওই রাজার নাম করত।

বেশ চলছিল। হঠাৎ বিষাদের ছায়া নেমে এল। কী সুন্দর জীবনযাপন করতেন রানি কান্তিরেখা। কী যে রোগ তাঁর ধরল কে জানে। বৈদ্য ডাকার আগেই মারা গেলেন। রাজা চোখের সামনে অন্ধকার দেখলেন। তাঁর দুঃখে প্রজারাও দুঃখ পেল। কিন্তু রাজাই দুঃখ পান, আর প্রজারাই দুঃখ পাক, যে মারা যায় সে তো আর ফিরে আসে না। মৃত্যুর হাত থেকে কারও রেহাই নেই। তা সে রাজাই হোক আর প্রজাই হোক।

সময় কাল সব কিছুর সমাধান করে। দিন যায় মাস আসে। মৃত রানিকে প্রজারা ভুলে যায়। রাজার মনে পড়ত মাঝে মাঝে। কিন্তু ভাবনাগুলো থেমে থাকে না। একটা যেতে না যেতেই অন্যটা এসে তার জায়গা জুড়ে বসে। সকলের মনে এক চিন্তা। রানি তো কোনো সন্তান রেখে মারা যাননি। রাজার পরে কে সিংহাসনে বসবে? এ-কথা প্রজারা ভাবল। সেনারা ভাবল। মন্ত্রী রাজাকে আবার বিয়ে করতে অনুরোধ করল।

রাজা মন্ত্রীর কথা ফেলতে পারলেন না। এক শুভ দিনে রাজা আবার বিয়ে করলেন। কিন্তু রাজার ভাগ্য মন্দ। দ্বিতীয় রানিও অসুখে পড়লেন এবং মারা গেলেন। এই বার্তা বাতাসের বেগে ছড়িয়ে পড়ল।

বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই দ্বিতীয় রানিরও এভাবে মারা যাওয়াতে প্রজারা অবাক হয়ে গেল। তারা কি এক হতভাগা রাজার প্রজা! শুধু দেশেই নয় অন্য দেশেও এই খবর দ্রুত পৌঁছে গেল।

দেশের লোক জানল, বিদেশিদের কাছেও অজানা রইল না। সমস্যা থেকেই গেল। তাই রাজা আবার অনুরুদ্ধ হলেন বিয়ে করতে। প্রথমে রাজা রাজি হলেন না। কিন্তু মন্ত্রী নাছোড়বান্দা। অনেক দিন পরে যদিও-বা রাজি হলেন, কোনো মেয়ের বাবা নিজের মেয়েকে অকালে হারাতে রাজি হলেন না। মন্ত্রী নানা ভাবে চেষ্টা করল। রাজাকে না জানিয়ে ছলে-বলে-কৌশলে বহু মেয়ের বাপের সঙ্গে গোপনে অর্থের লোভ দেখিয়ে কথা বলল।

খুঁজতে খুঁজতে এক গরিব মা তার মেয়ের সঙ্গে রাজার বিয়ে দিতে রাজি হল। মেয়েটি গরিব হলেও সুন্দরী ছিল। মেয়ে দেখে মন্ত্রীরা খুব খুশি। ছুটে গেল রাজার কাছে। ওই মেয়েকে বিয়ে করতে অনুরোধ করল। রাজা দানশীল বিষণ্ণ মনে বললেন, 'মৃত্যু ধনী গরিব মানে না। এত ধনসম্পত্তি থাকতেও আমি কি পেরেছি রানিদের বাঁচাতে? তাই গরিব ঘরের মেয়ে বলে আমার অবহেলা করার কিছু নেই। তবে আমি আমার ভাগ্য সম্পর্কে খুব সন্দিহান। তাই বলে প্রজাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলার ইচ্ছা আমার নেই। তোমাদের যা ইচ্ছে তাই হোক।'

এ-কথা শুনে মন্ত্রীরা প্রচণ্ড আগ্রহে রাজার বিয়ের তোড়জোড় করতে লাগল। কয়েক দিনের মধ্যেই শুভ মুহূর্তে ওই গরিব মেয়ের সঙ্গে রাজার বিয়ে হল। বিয়ের পরমুহূর্ত থেকেই সকলেরই মনে ভয়। কখন কী হয়। কারণ বিয়ের ক-দিনের মধ্যেই তো আগের দুই রানি পর পর মারা গেলেন।

রাজার বিয়ে, রাজার ব্যক্তিগত ব্যাপার যেন আর রইল না। সবসময় মন্ত্রী, রাজকর্মচারীগণ, রাজবৈদ্য, রাজজ্যোতিষী প্রত্যেকে সতর্ক থাকত। সবসময় তারা রানির খোঁজখবর রাখত।

গরিব ঘরের সুন্দরী মেয়ে, নতুন রানির নাম পদ্মমুখী।

সবাই মনে মনে অনেক কিছু আশঙ্কা করছিল কিন্তু এবার তা আর হল না। দিন যায় মাস যায় রানি আর মরে না। মন্ত্রীদের মন থেকে ভয় কেটে যায়। রাজকর্মচারীদের মন থেকে রানির বিপদের আশঙ্কা লোপ পায়। মন্ত্রী থেকে প্রজারা সবাই বলাবলি করতে থাকে, 'এই তৃতীয় রানির গর্ভে অবশ্যই সন্তান হবে।'
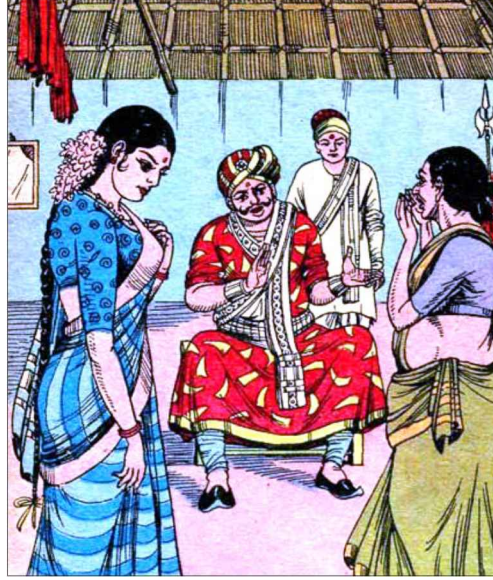
রাজা আর প্রজাদের ইচ্ছে পূরণ হল। দু-এক মাসের মধ্যেই রানি গর্ভবতী হলেন। এই শুভ সংবাদ দ্রুত দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল।

ফলে মন্ত্রী, রাজকর্মচারী, রাজবৈদ্য, রাজজ্যোতিষী ও প্রজারা অত্যন্ত আনন্দিত হল।

তারপর যথা সময়ে শুভক্ষণে রানি পদ্মমুখীর তিনটি বাচ্চা হল। রাজা ভেবেছিলেন একটি ছেলে হবে। কিন্তু দাই জানিয়ে গেল তিনটি বাচ্চা হয়েছে। ছেলে না মেয়ে কিছুই জানা গেল না।

কিছুক্ষণ পরে রাজা জানতে পারলেন যে তিনটি কন্যা হয়েছে। রাজা প্রথমে মনে একটু ধাক্কা খেলেও পরে সামলে নিলেন। মনে মনে ঠিক করলেন, 'এই মেয়েদেরই আমি যোগ্য ছেলেদের মতো তৈরি করব।'

মেয়েদের তিনি কীভাবে গড়ে তুলবেন, কীভাবে লেখাপড়া শেখাবেন, কোন কোন অস্ত্রশিক্ষা মেয়েদের দেবেন সব কিছুরই তিনি রূপরেখা মনে মনে এঁকে নিলেন।

কয়েক দিন পরে ওই তিনটি বাচ্চার নাম রাখলেন সুহাসিণী, সুভাষিণী, সুকেশিণী। দিনে দিনে তিন কন্যা বাড়তে লাগল। তিন জনেই সুন্দরী। পুতুলের মতো দেখতে। যত দিন যায় তাদের রূপ তত বাড়ে। দেখে রাজা ও রানির মনে খুব আনন্দ হল।

কিন্তু আনন্দ আর বেশিদিন টিকল না। কিছুদিন অন্তর তিন কন্যার মধ্যে এক কন্যার অথবা তিন জনেরই কোনো-না-কোনো বিপদ ঘটত। বিপদগুলো

ছোটোখাটো। কিন্তু বিপদ ঘটলেই রাজার উদ্‌বেগ বাড়ত। আবার বিপদ কেটে গেলে রাজার দুর্ভাবনা দূর হত।

দেশ শাসন, প্রজাদের মঙ্গলের জন্য নতুন নতুন কাজের কর্মসূচী গ্রহণ, মন্ত্রী, রাজকর্মচারী প্রমুখদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা প্রভৃতির ফাঁকে ফাঁকে মেয়েদের কথা রাজার মনে উঁকি মারত।

একবার সুহাসিণী রাজার সঙ্গে উদ্যানে বেড়াচ্ছিল। এমন সময় এক বিরাট সাপ তাকে ছোবল মারতে গেল। ঠিক সেইসময় রাজা দেখে তাকে কেটে ফেললেন। তা না হলে সেই দিনই রাজার তিন কন্যার মধ্যে এক কন্যা মারা যেত।

আর একবার মা-র সঙ্গে সুভাষিণী নদীর তীরে বেড়াতে গেল। ওদের বেড়ানোর সময় হঠাৎ নদীতে বান এল। বানের জল প্রচণ্ড বেগে তীরে উঠে এল। ভাসিয়ে মাঝ নদীতে নিয়ে গেল সুভাষিণীকে। সৌভাগ্যক্রমে ঠিক সেইসময় এক গ্রামের মানুষ সেই নদীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। ওইভাবে ডুবতে দেখে সে নদীতে ঝাঁপ দিল। তুলে আনল সুভাষিণীকে তীরে। সে যাত্রা রাজার আর এক কন্যা এইভাবে মরতে মরতে বেঁচে গেল।

ঠিক এইভাবে আর একবার তৃতীয় কন্যা সুকেশিণী এক ফাঁড়ায় পড়ল। সে এক অদ্ভুত ঘটনা। একবার সুহাসিণী, সুভাষিণী ও সুকেশিণী তিন জনেই উদ্যানে ফুল তুলতে গিয়েছিল। তিন জনেই ফুল তুলে ঝাঁপিতে রেখে ফিরছিল। প্রথমে ছিল সুভাষিণী তার পেছনে সুহাসিণী ও সকলের পেছনে সুকেশিণী। হঠাৎ সুকেশিণী আর্তনাদ করে উঠল। বাকি দু-জন পিছন ফিরে দেখে সুকেশিণী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে। ওরা তখন ছুটে গেল মায়ের কাছে। যা ঘটেছিল সব বলল মাকে। মা ওদের নিয়ে ছুটে এলেন সেখানে। সুকেশিণীর ঝাঁপি কাছেই পড়ে ছিল। ঝাঁপির ফুল থেকে একটা কাঁকড়া বিছে বেরিয়ে এল। রানি বুঝলেন, তাঁর মেয়েকে বিছে কামড়েছে। তৎক্ষণাৎ সেটাকে মেরে ফেলে রানি মেয়েকে নিয়ে অন্তপুরে
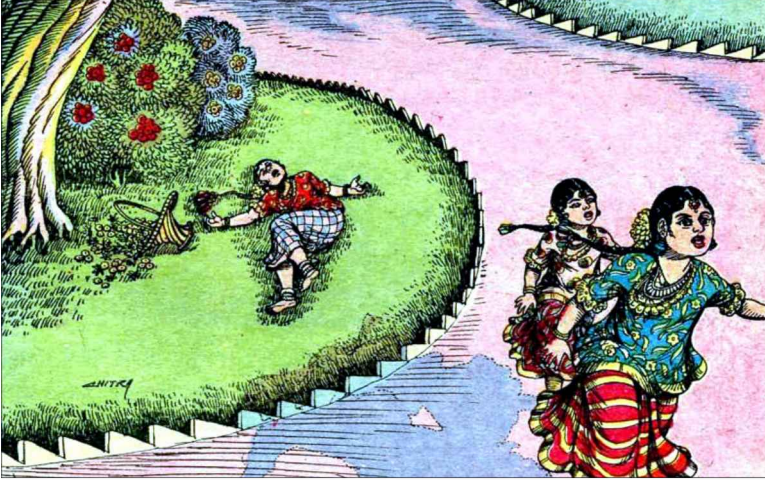
ফিরলেন। রাজবৈদ্যকে ডেকে পাঠালেন। বৈদ্য ওষুধ দেবার অনেকক্ষণ পরে সুকেশিণী উঠে বসল।

এভাবে সবসময় মেয়েদের একটা-না-একটা বিপদ ঘটায় রাজার দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না। শেষে রাজজ্যোতিষীকে ওই তিন কন্যার ভূত ভবিষ্যৎ দেখতে বললেন।

জ্যোতিষী বুঝতে পারল যে রাজা তার উপর এক বিরাট দায়িত্ব দিচ্ছেন। জ্যোতিষী যা বলবে তার বক্তব্যের উপর রাজার মেজাজ, রাজার ভবিষ্যৎ কর্মসূচী, রাজার বংশের ভবিষ্যৎ সব কিছু নির্ভর করছে। তার গণনা যদি ভুল হয় তাহলে আর রক্ষা থাকবে না। তাই জ্যোতিষী গভীর মনোযোগ সহকারে মেয়েদের ভবিষ্যৎ বিচার করতে বসল।

অনেকক্ষণ বসে বসে বিচার করার পর জ্যোতিষী কোনো কথা না বলে মাথা নীচু করে রইল। জ্যোতিষীর হাবভাব দেখে রাজা আরও ঘাবড়ে গেলেন। উদ্‌বিগ্ন হয়ে তাকে প্রশ্ন করলেন, 'ভবিষ্যৎ কি ভীষণ খারাপ? কোনোরকম দ্বিধা না করে সব খুলে বলুন।' জ্যোতিষীর পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে রাজা বললেন।

তখন জ্যোতিষী বলল, 'মেয়েরা দিনকে দিন খুব সুন্দর হবে। তাদের এমনি কোনো রোগ থাকবে না। যত দিন যাবে এদের শরীর উজ্জ্বলতর হবে। এদের রূপ তত খুলবে। তবে ওই সুন্দর রূপই এদের কাল হবে। যখন-তখন এদের যেকোনো বিপদ ঘটে যাচ্ছে এবং ঘটবে।' জ্যোতিষী রাজার চোখে জল দেখে হঠাৎ থেমে গেল। জ্যোতিষী থেমে যাওয়ায় রাজা তাকে বললেন, 'না না আপনি থামলেন কেন বলে যান, বলুন।'

আপনার মনে ব্যথা দেওয়ার ইচ্ছে আমার ছিল না। কিন্তু আপনার কাছে মিথ্যে কথা বলা যায় না।' জ্যোতিষী সবিনয়ে বলল।

'না না বলুন। এ দুঃখ আমার প্রাপ্য। আপনি না বললে কীভাবে যে বিপদের হাত থেকে আমার এই শিশুদের বাঁচানো যায় তার ব্যবস্থা করব কী করে?' রাজা দানশীল বললেন।

তারপর জ্যোতিষী বলল, 'রাজকুমারীদের সাত বছর বয়স পর্যন্ত এক-একটা দিন এক-একটা যুগের মতো কাটবে। প্রত্যেক দিন কোনো-না-কোনো মারাত্মক ঘটনা ঘটার আশঙ্কা আছে। তবে কোনোরকমে এই সাত বছর কেটে গেলে আপনার তিন কন্যার প্রত্যেকটির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে। তারপর এদের আর কোনো কিছুতেই ভয় থাকবে না। পৃথিবীর কোনো শক্তিই এদের প্রতিরোধ করতে পারবে না। এরা যা করতে চাইবে তাই করতে পারবে।'

জ্যোতিষীকে বিশেষ উপহার দিয়ে রাজা তাকে বিদায় করলেন। তারপর তিনি অন্দরমহলে গিয়ে তিন কন্যার বিষয়ে জ্যোতিষী যা বলল, সব রানিকে বললেন। রানি শুনতে শুনতে অচেতন হয়ে গেলেন।

দাসীরা এসে রানিকে পালঙ্কে শুইয়ে সেবা করল। রানির জ্ঞান ফেরার পর একথা-সেকথা বলে রাজা সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। ঠিক এমন সময় তিন কন্যার পরিচারিকা ছুটে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'রানিমা, আপনার তিন কন্যা উদ্যানে হঠাৎ পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারিয়েছে।'

শুনে রাজা ও রানি ছুটে গেলেন উদ্যানে। রাজা খবর পাঠালেন রাজবৈদ্যকে। রাজবৈদ্য ছুটতে ছুটতে এল।

রাজপ্রাসাদে, অন্দরমহলে সাড়া পড়ে গেল। মন্ত্রী থেকে শুরু করে প্রত্যেকের মধ্যে ছোটাছুটি লেগে গেল। এই তিন মেয়ের উপর রাজপরিবারের শান্তি নির্ভর করছিল। তাই সকলে উদ্‌বিগ্ন হয়ে উঠল। রাজা ও রানির মনের অবস্থা অবর্ণনীয় ছিল।

দুই

রাজা এবং রানি উদ্যানে ছুটে গিয়ে দেখেন তিনটি মেয়েরই জ্ঞান নেই। ওরা অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে। শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। মুখে এক ফোঁটা রক্ত নেই। সমস্ত শরীর হলুদ হয়ে গেছে। কাঠ হয়ে পড়ে আছে ওরা। রানি দু-হাত তুলে ভগবানকে ডাকতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই বৈদ্য এসে পরীক্ষা করে দেখে কিছুই বুঝতে পারল না। আশেপাশে দেখল। অদূরে একটি ফল পড়ে ছিল। তাতে দাঁত দিয়ে কামড়ানোর কয়েকটি দাগ ছিল। ফলটাকে ভালো করে দেখে, শুঁকে বৈদ্য বলল, 'ও তাহলে এই ব্যাপার! এই বিষফল খাওয়ার ফলে বাচ্চাদের এই অবস্থা হয়েছে।'

তারপর বৈদ্য ওদের নাকের কাছে কী যেন ওষুধ রাখল। সেটা শোঁকার ফলে বাচ্চারা উঠে পড়ল। বৈদ্য ওই ফল হাতে নিয়ে পরিচারিকাকে জিজ্ঞেস করল, 'এই ফল বাচ্চারা পেল কোত্থেকে?'

জবাবে পরিচারিকা বলল, 'অন্যদিনের মতো আজকেও আমরা এই উদ্যানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। মেয়েরা খুব জল তেষ্টা পেয়েছে বলল। আমি জল আনতে চলে গেলাম। আসতে আসতে দেখি দুটো মেয়ে পড়ে আছে আর ছোটোটির হাতে একটি ফল। আমি কাছে আসতেই ওর হাত থেকে ফল পড়ে গেল। পরক্ষণেই ছোটোটিও মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। এই অবস্থা দেখে আমি আপনাদের খবর দিতে ছুটে গেলাম। এ ছাড়া কিছু জানি না।'

বৈদ্য এদিক-ওদিক তাকিয়ে উপরের দিকে তাকাল। উপরের দিকে তাকিয়ে দেখে একটা চিল বসে আছে। বৈদ্য চিৎকার করে বলল, 'ওই তো ওই পাপিষ্ঠ চিলটাই এই ফল কোত্থেকে এনে এইখানে ফেলেছে। ওটাকে মেরে ফেলুন।'

উদ্যানে যারা জমেছিল, ওদের মধ্যে একজন তির ছুড়ে মারতে যেতেই সেটা মুহূর্তে কোথায় যে উড়ে চলে গেল আর তাকে কেউ চোখে দেখতে পেল না।

ইতিমধ্যে রাজার তিন কন্যা বৈদ্যের ওষুধের ফলে সেরে উঠল। যারা সেখানে ছিল তারা প্রত্যেকে খুশি হল। তারপর তিন কন্যাকে নিয়ে রাজা ও রানি অন্দরমহলে গেলেন। নরম পালঙ্কে শোয়ানো হল। ক্রমশ ওদের চোখে-মুখে আগের সৌন্দর্য ফুটে উঠল। রাজা ও রানি এই ঘটনায় অত্যন্ত খুশি হয়ে বৈদ্যকে উপহার দিয়ে বিদেয় দিলেন।

এই ঘটনার সময় রাজার তিন কন্যা, সুহাসিণী, সুভাষিণী ও সুকেশিণীর বয়স মাত্র চার বছর। জ্যোতিষীর কথা অনুসারে আরও তিন বছর এদের কপালে ফাঁড়া আছে। এই তিন বছর যে কীভাবে কাটবে রাজা ভেবে পাচ্ছিলেন না। সবসময় বাচ্চাদের চোখের সামনে রাখা একটা বিরাট সমস্যা। রাখলেই যে বিপদ ঘটবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়? ভাবতে ভাবতে রাজা ক্লান্ত হন।

একদিন রাজা উদ্যানে বেড়ানোর সময় একটা বড়ো পাথর তাঁর চোখে পড়ল। সেই পাথরের উপর লেখা ছিল 'পাতাল বাড়ি'। অনেক কষ্টে পাথর সরিয়ে দেখেন সেখান থেকে সিঁড়ি নেবে গেছে।

রাজা সেই সিঁড়ি দিয়ে নাবলেন। নাবতে নাবতে অনেকখানি নেবে দেখেন তিনি এক মহলে আছেন। কে যে এই বিরাট বাড়ি মাটির নীচে বানাল তা রাজা জানতেন না। কোন রাজার আমলে যে এই মহলের সৃষ্টি তা রাজা ভেবে পেলেন না। ওই মহলের দেওয়ালগুলো ছিল শ্বেত পাথরের। ঝকঝক করছিল মেঝে। নানা ধরনের কারুকার্যে ভরা মেঝে। রুচিবান মানুষের উদ্যোগে সৃষ্ট মহল।

অবাক দৃষ্টি মেলে রাজা দানশীল ঘুরে ঘুরে মহলটাকে দেখলেন। তারপর আবার সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলেন উদ্যানে। পাথরটাকে সরিয়ে যেভাবে ছিল সেভাবে রাখলেন। তবে উপরের লেখাগুলো যাতে দেখা না যায় তারজন্য পাথরটাকে উলটে রাখলেন। এত করেও নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। ওই পাথরের উপর লতাপাতা এনে ছড়িয়ে দিলেন।

রাজা দানশীল ফিরে এলেন রাজপ্রাসাদে। পাতাল বাড়ির কথা মন্ত্রী সেনাপতি তো দূরের কথা রানিকেও বললেন না। রাজা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন পাতাল বাড়ির কথা কাউকে জানাবেন না। এই রহস্যময় পাতাল বাড়ির সন্ধান পাওয়ার পর রাজার মাথায় নতুন এক পরিকল্পনা ঢুকল। মেয়েদের নিরাপদে রাখার কথা নতুন করে ভাবতে লাগলেন। প্রথমে তিনি মনে মনে একটা বিরাট পরিকল্পনার ছক তৈরি করে নিলেন। তারপর এক-পা এক-পা করে এগোলেন।

রাজা প্রথমে এক-শো জনের তিন বছরের খাদ্যসামগ্রী ওই পাতাল বাড়িতে মজুত করলেন। অত্যন্ত বিশ্বাসী অনুচরদের দিয়ে তিনি এই কাজ করালেন। তবে

যারা ওই খাদ্য নিয়ে পাতাল বাড়িতে ঢুকল তারা আর সেখান থেকে বেরোতে পারল না। রাজা তাদের সেখানেই বন্দি করে রাখলেন। তারপর তিন জন পরিচারিকা ও তিন কন্যাকে নিয়ে তিনি ওই পাতাল বাড়িতে গেলেন। রাজার তিন মেয়েকে নিয়ে যাওয়ার সময় রানি ভাবলেন রাজা বোধ হয় অন্যদিনের মতো উদ্যানে তাদের নিয়ে বেড়াতে গেলেন।

রাজা দানশীল উদ্যানে তিন জন পরিচারিকা ও কন্যাদের নিয়ে ওই পাথরের কাছে দাঁড়ালেন। ঝটপট লতাপাতা ও পাথর সরিয়ে পরিচারিকাদের বললেন মেয়েদের নিয়ে ওই সিঁড়ি দিয়ে নাবতে। রাজার কথা শুনে ওরা তো অবাক। ওদের অবস্থা

দেখে রাজা ওদের গম্ভীরভাবে নির্দেশ দিলেন। ওরা ভয়ে ভয়ে সিঁড়ি দিয়ে নাবতে লাগল। ওদের পরে রাজাও নাবলেন। নাবার আগে পাথরটাকে সরিয়ে সিঁড়ির মুখে রাখলেন। পরিচারিকারা এক-একটা সিঁড়ি নাবছিল আর তাদের ভয় তত বাড়ছিল। নিজের মেয়েদের এবং তাদের নিয়ে রাজা যে কোথায় যাচ্ছেন তা তারা বুঝতে পারছিল না। আবার রাজাকে যে মুখের উপর জিজ্ঞেস করবে তারও সাহস হচ্ছিল না। তাই ওরা জীবন মুঠোয় করে সিঁড়ি বেয়ে নাবছিল। সমস্ত সিঁড়ি নেবে মহলে পৌঁছে ওরা দেখল রাজার বহু অনুচর সেখানে রয়েছে। ওদের দেখে পরিচারিকারা যেমন ভয় পেল তেমনি অতগুলো চেনা মুখ দেখে সাহসও পেল।

তারপর রাজা দানশীল সেখানকার এক-শো জন অনুচর ও এই তিন জন পরিচারিকাকে বুঝিয়ে বললেন, 'তোমরা খুব ভালো করেই জানো যে আমার কপালে স্ত্রী ছিল না। তৃতীয় স্ত্রী যাও-বা টিকলেন এবং জননী হলেন কিন্তু যে সন্তান আজ আমার কপালে জুটেছে ওদের পদে পদে ফাঁড়া আছে। ওদের বয়স এখন চার বছর। কিন্তু এই চার বছরের মধ্যে ওরা যে কীভাবে একের-পর-এক বিপদে পড়েছে এবং তার থেকে উদ্ধার পেয়েছে তা আমি যেমন জানি, তোমরাও জানো। জ্যোতিষীর মতে ওদের সাত বছর বয়স পর্যন্ত পদে পদে বাধা আছে, বিপদ আছে, ফাঁড়া আছে। তিন বছর কেটে গেলে নাকি ওদের জীবনে আর কোনো ফাঁড়া নেই। জগতের কোনো শক্তিই নাকি ওদের পরাজিত করতে পারবে না। ওরা নাকি নির্ভীক হবে। ওরা নাকি করতে পারবে না এহেন কোনো কাজ পৃথিবীতে থাকবে না। আজ আমার এই তিন কন্যাকে তোমাদের হাতে তিন বছরের জন্য দিয়ে যাচ্ছি। আগামী তিন বছর তোমরাই ওদের দেখাশোনা করবে, খাওয়াবে পরাবে এবং ওদের বাঁচিয়ে রাখবে। তোমাদের খাওয়া-পরার যাতে কোনো অসুবিধা না হয় তার সমস্ত ব্যবস্থা আমি এখানে করে রেখেছি। এই তিন বছরের মধ্যে কোনোদিন যাতে তোমাদের কোনো অসুবিধা না হয় তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি থাকবে আমার। আর একটি কথা এই তিন বছর এখানে আমি বাদে আর কেউ আসবে না।'

রাজা তাঁর বক্তব্য কে কীভাবে শুনছে দেখে নিলেন। দেখে নিয়ে আবার বললেন, 'আমার এই তিন কন্যা যে এখানে আছে সেই কথা, তোমরা যারা এখানে আছ, তারা বাদে বাইরের আর কেউ জানবে না। এমনকী রানিও না। তাই তোমাদের হয়তো কষ্ট হবে তবু সতর্কতার জন্য এই তিন বছর তোমরা এখানেই থাকবে। তোমরা কেউ বাইরে গেলে তোমাদের অজান্তেই কথাটা বেরিয়ে যেতে পারে। আর একবার প্রকাশ হয়ে গেলেই আমার মেয়েদের জীবনে আবার একের-পর-এক বিপদ ঘটতে পারে। আমার ধারণা এই পাতাল বাড়িতে থাকলে আমার মেয়েদের জীবনে এই তিন বছরে কোনো বিপদ ঘটবে না। আর একটি কথা। এই পাতাল

বাড়িতে যে আমার মেয়েরা আছে এ খবর যদি কেউ বাইরে প্রকাশ করে তাহলে তাকে কঠোরতম শাস্তি দেওয়া হবে। আমি যেভাবে চলতে বলছি সেভাবে চললে তিন বছর পরে আমি তোমাদের প্রত্যেককে পুরস্কার দেব। এত পুরস্কার দেব যে তা হবে তোমাদের কল্পনার অতীত। এখানে তোমাদের কোনো কিছুর অভাব হবে না। তোমাদের অথবা আমার মেয়েদের যদি কিছুর দরকার হয় তাহলে

আমাকে বলবে। আমি দেব। এ ছাড়া আমি মাঝে মাঝে এসে তোমাদের খবর নেব। আচ্ছা এখন আসি।'

রাজার এই কথা এক-শো জন অনুচর ও তিন জন পরিচারিকা মন দিয়ে শুনছিল। সিঁড়ি দিয়ে পাতাল বাড়িতে নাবার সময় যারা ভয় পেয়েছিল তাদের মনে ক্রমশ সাহসের সঞ্চার হল। এবং শেষে তারা সাগ্রহে রাজার ইচ্ছা পূরণ করতে চাইল।

পরিচারিকাদের মধ্যে একজন রাজাকে বলল, 'প্রথম প্রথম আপনি কেন যে এই পাতাল বাড়িতে আনছেন বুঝতে না পেরে খুব ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু এখন আমরা সব পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি। এখন আমাদের আর কোনো ভয় নেই। আর কোনো দুশ্চিন্তা নেই। এই শিশুদের আমরা যে কত যত্নের সঙ্গে লালনপালন করব তা একমাত্র ভগবানই জানবেন। আমরা এদের চোখের মণির মতো দেখব। এদের জন্য আপনি কোনো দুশ্চিন্তা করবেন না। তবে আমাদের মনে একটা খটকা আছে। আপনি এখন রাজপ্রাসাদে ফিরে গিয়ে রানিমাকে যে বলবেন না, মায়ের মন কি অত সহজে মেয়েদের অভাব ভুলতে পারবে? অবশ্য কী করবেন না করবেন, কী বলবেন না বলবেন আপনি তা নিশ্চয় ভেবে দেখেছেন।'

'ঠিকই ধরেছ। আমি কী বলব কী করব সবই ভেবে রেখেছি। তোমাদের যে কঠিন দায়িত্ব দিয়ে যাচ্ছি তা তোমরা আন্তরিকতার সঙ্গে পালন কর।' বলে রাজা দানশীল রাজপ্রাসাদে ফিরে গেলেন।
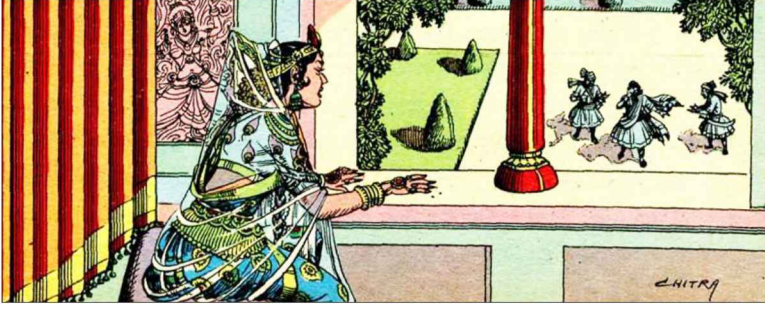
এদিকে অন্দরমহলে রানি অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। রাজা কোনোদিন এর আগে এতক্ষণ ধরে মেয়েদের নিয়ে বেড়াননি। রানি অস্থির। একবার উদ্যানে যাচ্ছেন আবার অন্দরমহলে ফিরে আসছেন। ফিরে এসেই পরিচারিকাদের প্রশ্ন করছেন। কিন্তু তাদের কাছ থেকে কোনো সদুত্তর পাচ্ছেন না। মেয়েদের নিয়ে তাঁর সবসময় আতঙ্ক। এত যখন দেরি করছেন নিশ্চয়ই কোথাও কিছু ঘটেছে। মায়ের মনে খারাপ চিন্তাই আগে আসে। আর খারাপ চিন্তা মানেই আরও দুশ্চিন্তা। এই দুশ্চিন্তার ফলে রানি ঘন ঘন রাজার অপেক্ষায় পথের দিকে তাকাচ্ছিলেন।

ঠিক সেইসময় রাজাকে দূর থেকে আসতে দেখলেন রানি। রাজার পাশে তিন কন্যাকে না দেখতে পেয়ে রানির বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। রাজা এমন ভাবে হাঁটছিলেন যেন বিরাট কিছু ঘটে গেছে। কাছে আসতেই রানি দেখতে পেলেন রাজার চোখে জল। বিরাট গাছের গোড়া কুড়ুল দিয়ে কেটে ফেললে যেমন হুড়মুড় করে পড়ে যায় ঠিক তেমনিই কিছুক্ষণের মধ্যেই রানির দেহ মেঝেতে পড়ে গেল।

তিন

রাজভবনে রাজার অনুচর রানির পরিচারিকা প্রত্যেকে রাজা ও রানিকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। অনেকক্ষণ ধরে রাজার লোকজন রাজা ও রানিকে ঘিরে রইল। কারও মুখে কোনো কথা নেই। সকলের চোখে-মুখে আপনজন হারানোর দুঃখের ছাপ। খবর পেয়ে বৈদ্য সেখানে এল। রানিকে কী একটা ওষুধ দিল। কিছুক্ষণ পরে রানি জ্ঞান ফিরে পেলেন। রানির জ্ঞান ফেরার পর রাজার উদ্‌বেগ যেন কিছুটা কমল।

জ্ঞান ফেরার কিছুক্ষণ পরে রাজার দিকে ক্লান্ত চোখে তাকিয়ে মেয়েদের ব্যাপারে রানি বিস্তারিত জানতে চাইলেন। রাজা রানিকে সান্ত্বনা দিতে দিতে বললেন, ‘আমি অন্যান্য দিনের মতো আজকেও তিন জন পরিচারিকা ও এক-শো

জন দাস নিয়ে উদ্যানে মেয়েদের সঙ্গে করে বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমি, পরিচারিকা ও এক-শো জন দাস চোখে চোখে মেয়েদের রেখেছিলাম। মেয়েদের জীবনে টানা সাতটি বছর যে বিপদ-আপদের ঝুঁকি আছে, পদে পদে ফাঁড়া আছে তা যে শুধু আমি জানি তাই নয়, পরিচারিকা ও দাসরাও জানে। তাই সবাই মিলে হাজার চোখে সবসময় মেয়েদের আগলে রাখি। কিন্তু হঠাৎ কোত্থেকে যে এক প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া এল কেউ তা বুঝে উঠতে পারিনি। যেমন তার গতি তেমনি তার প্রচণ্ডতা। ঝড়ের তীব্রতার ফলে একমুহূর্ত সবাইকে চোখ বুঝতে হয়েছিল। পরমুহূর্তে সবাই চোখ খুলে দেখি তিনটে শকুনি আমার তিন মেয়েকে নিয়ে উড়ে যাচ্ছে।' বলে রাজা আরও কী যেন বলতে যাওয়ার আগেই রানি 'ও মাগো' বলে অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে পড়ে গেলেন।

পরিচারিকারা রানির সেবা করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে রানির আবার জ্ঞান ফিরে এল। তখন রাজা আবার রানির অনুরোধে শুরু করলেন, 'এ সব কিছুই যেন চোখের পলকে ঘটে গেল। তখন আমি, পরিচারিকারা এবং অন্যান্য এক-শো জন তাড়াতাড়ি যেদিকে শকুনিগুলো গেল সেইদিকে ছুটতে লাগলাম। ছোটার অভ্যেস না থাকায় আমি সকলের পেছনে পড়ে গেলাম। কিন্তু সকলের ছোটাছুটির কোনো ফল হল না। ওই শকুনিগুলো আর দেখা গেল না। কিছুই যখন দেখা যাচ্ছে না তখন কার পিছনে ছুটব। কিছুক্ষণ ওই শকুনিদের যাওয়ার পথের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। কিন্তু কেউ কিছু দেখতে পেলাম না। কান্নায় আমার বুকের ছাতি ফেটে যেতে লাগল। বিপদ যখন আসে একা আসে না। হঠাৎ দেখি আমার চোখের সামনে ওই এক-শো জন দাস ও তিন জন পরিচারিকা পাখি হয়ে গেল। ওরাও উড়ে গেল ওই শকুনিদের যাওয়ার পথে। আমি অবাক হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ওদের উড়ে যাওয়া দেখতে লাগলাম। ওরাও ক্রমশ মিলিয়ে গেল। এসব স্বপ্নে দেখলে হয়তো কিছুটা বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু চোখের সামনে এসব ঘটতে পারে তা আমি কোনোদিন কল্পনাও করতে পারিনি। সবাই পাখি হয়ে গেল। আমি কিন্তু যে রাজা সে রাজাই রয়ে গেলাম। আরও কত কিছু দেখার জন্য যে ভগবান আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন কে জানে।' বলতে বলতে রাজা কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে জ্যোতিষী এল। জ্যোতিষীকে দেখে রানি ছুটে গিয়ে তার পায়ে পড়ে বললেন, 'আপনি বলেছিলেন মেয়েদের সাবধানে রাখতে। আমি পারিনি। এখন আপনি বলুন, মেয়েরা আমার বেঁচে আছে কি না। আমি মেয়েদের ছেড়ে একমুহূর্তও বাঁচতে পারব না। অজানা আশঙ্কায় আমার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠছে। আমার মনে হচ্ছে শকুনিগুলো ওদের হয়তো খেয়ে ফেলেছে। ভালো করে গণনা করে দেখুন। যা সত্য তাই বলবেন। আমার কাছে কিছু
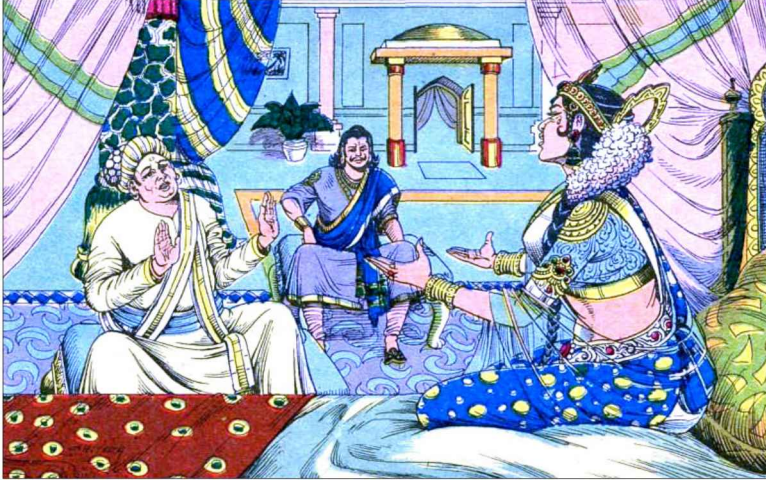
লুকোবেন না।' রানি আর কথা বলতে পারলেন না। অঝোরে কাঁদতে লাগলেন।

জ্যোতিষী কিছুটা হতভম্ব হয়ে গেল। রানির কান্না দেখে তারও চোখে জল এসে গেল। নিজেকে সামলে নিয়ে সে মেয়েদের ঠিকুজি আবার ভালো করে পরীক্ষা করে দেখে রাজা ও রানিকে বলল, 'এই বছর আপনাদের মেয়েদের জীবনে বিপদ-আপদ আছে বটে কিন্তু মৃত্যু তো নেই। মেয়েরা আপনার বেঁচে আছে। কিন্তু ওরা যে কোথায় আছে কীভাবে আছে তা বলতে পারছি না কিন্তু মেয়েরা যে বেঁচে আছে তাতে কোনো দ্বিমত নেই। আমি অন্য এক গণনার মাধ্যমে বুঝতে পারছি আপনার মেয়েরা এবং তাদের সঙ্গে যারা ছিল তারা প্রত্যেকে মেয়েদের সঙ্গেই আছে। আগামী তিন বছরের মধ্যে যেকোনোদিন ওরা আপনার কাছে ফিরে আসতে পারে। তাই এখন সমস্ত কিছুর জন্য ভগবানের উপর নির্ভর করা ছাড়া আর তো কোনো উপায় দেখছি না। আপনি ধৈর্য ধরুন। আমাদের এখন সেই সুদিনের অপেক্ষা করতেই হবে। এ ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।'

রাজার মেয়েদের হারানোর খবর নিয়ে ছুটতে ছুটতে আসা, যা যা ঘটেছে রাজার মুখে তার বর্ণনা শোনা এসবের কোনো কিছুর ব্যাপারে কারও মনে কোনোরূপ সন্দেহ জাগেনি। ওসব যে রাজার কল্পনা তা কেউ কখনো ভাবতে পারেনি। পরিচারিকা ও দাসদের পাখি হয়ে যাওয়া সবাই সরল মনে বিশ্বাস করল। অনেক ভেবেই রাজা এই গল্প তৈরি করেছিলেন।

কেউ অবিশ্বাস না করলেও রাজা তো জানেন তিনি মিথ্যা কথা বলছেন। অন্যদের কাছে নয় নিজের রানির কাছে, মেয়েদের সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলেছেন মেয়েদের মায়ের কাছে। তিনি সব কিছুই করেছেন মেয়েদের মঙ্গলের জন্য।

তাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য।

যে উদ্দেশ্যেই মিথ্যা কথা বলে থাকুন না কেন তারজন্য তিনি অত্যন্ত অনুতপ্ত ছিলেন। মনে তিনি দুঃখও পেয়েছিলেন। কিন্তু সে দুঃখ কারও কাছে তিনি ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করেননি। এই প্রকাশ না করার যে কষ্ট দিনের পর দিন তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে।

অপরপক্ষে রাজার প্রতিটি কথা বিশ্বাস করে, জ্যোতিষীর বক্তব্যে আস্থা রেখে, মেয়েরা বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবে, ফিরে আসবে এই আশায় রানি অপেক্ষা করতে লাগলেন। রাজার মুখে শুনে মনে হয়েছিল রানির যে মেয়েদের বুঝি শকুনিরা শেষ করে ফেলবে। কিন্তু জ্যোতিষীর কথায় তিনি ভরসা পেলেন। রাজাকে অনুরোধ করলেন চারদিকে লোক পাঠিয়ে তিন কন্যাকে খোঁজাতে। রাজা তো জানেন কন্যারা কোথায় আছে। তবুও রানির মন রাখার জন্য চারদিকে লোক পাঠালেন।

রাজার লোক ঘোড়ায় চড়ে চারদিকে রওনা হয়ে গেল। ওরা খোঁজাখুঁজি করতে লাগল নগর প্রান্তরে। কিন্তু যারা আছে মাটির গভীরে, পাতালভবনে, তাদের মাটির উপরে খুঁজে পাবে কেন? তাই রাজার লোক অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তিন কন্যাকে পেল না। যত দিন যায় তত যারা খুঁজতে বেরিয়েছিল তাদের মনে আতঙ্ক বাড়তে থাকে। অবশেষে ওরা নিরাশ হয়ে ফিরে এল, অক্ষমতা জানাল রাজার কাছে।

ওদের ফেরার অপেক্ষায় রানি দিন গুনছিলেন। ওরা এল। কিন্তু মেয়েদের আনতে পারল না। এত খুঁজেও না পাওয়ায় রাজা মনে মনে খুব খুশি। কারণ তিনি এমন এক জায়গায় মেয়েদের রেখে এসেছেন যেখানকার খবর কেউ জানে না। কেউ আবিষ্কার করতে পারে না। মনে মনে খুশি হলেও রাজা বাইরে এমন ভাব প্রকাশ করতে লাগলেন যেন তিনি খুব বিষণ্ণ ও খুব দুঃখিত।

প্রত্যেক দিন কাক-পক্ষীও যাতে টের না পায় এমনভাবে রাজা পাতালে গিয়ে মেয়েদের দেখে আসতেন। তাদের যাতে কোনো অসুবিধা না হয় সেদিকেও তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল।
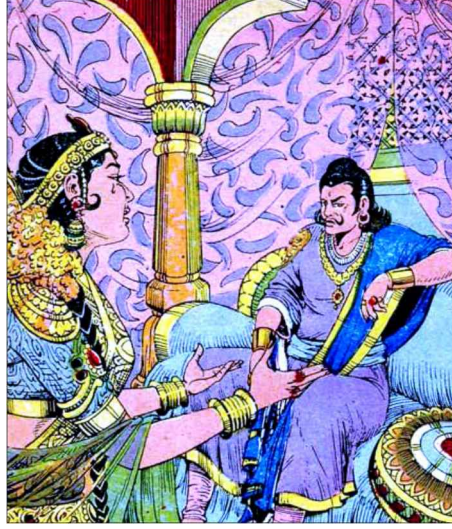
এইভাবে গোড়ার দিকে কয়েক দিন মেয়েদের দেখে এসে রাজা মনে মনে ভাবলেন, 'প্রত্যেক দিন এভাবে ওখানে যাওয়া ঠিক নয়। তাতে কেউ-না-কেউ একদিন দেখে ফেলতে পারে। তখন সমস্ত গোপনতা প্রকাশ হয়ে পড়বে। তাই তিনি ঠিক করলেন আর যাবেন না। কিন্তু বিকেল হলেই রাজার মন মেয়েদের দেখার জন্য হাঁকপাঁক করত। তাঁর মনে হত এক দিনের জন্যও মেয়েদের দেখতে না পেলে তিনি বাঁচতে পারবেন না। অথচ এভাবে দিনের পর দিন গোপনে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। অথচ তিনি না গিয়েও পারছেন না। একজনের চোখে পড়লে অন্যজনকে সে বলবেই। এইভাবে মুখে মুখে জানাজানি হয়ে যাবে। রানিও একদিন জানবে। আর রহস্যের সূত্র ধরা পড়লে রানি এবং অন্যেরা ভালোভাবেই জানবে যে রাজা তাদের মিথ্যা কথা বলেছিল। আর একবার রাজা মিথ্যেবাদী হিসেবে প্রমাণিত হলে তখন নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া হবে।

সরল বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে রানি শান্তি পাচ্ছিলেন কিন্তু রাজার মনে শান্তি ছিল না।

সেদিন রাজা পাতাল গৃহ থেকে অনেক দেরিতে ফিরে সকাল সকাল শুয়ে পড়লেন। মনের দিক থেকে ক্লান্ত থাকায় শোয়া মাত্রই রাজা ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমিয়ে তিনি যেন স্বপ্ন দেখলেন, সুহাসিণী তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তাঁকে বাবা বাবা বলে ডাকছে। তার ডাক শুনে রাজা ভাবলেন তিনি স্বপ্ন দেখছেন। কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি যখন রাজার গায়ে হাত দিয়ে, তাঁকে ঠেলে ডাকতে লাগল তখন রাজার স্বপ্ন ভঙ্গ হল। চোখ খুলে মেয়েটিকে দেখেও যেন তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না সেটা স্বপ্ন না সত্য। মেয়েটি রাজার গায়ে হাত দিচ্ছে, রাজা টের পাচ্ছেন, তাহলে স্বপ্ন হয় কী করে। রাজা সুহাসিণীকে কোলে তুলে নিয়ে তার কানের কাছে মুখ রেখে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলেন, 'একি মা? এই মাঝ রাত্রে তুই এখানে কী করে এলি? তোকে কে নিয়ে এল? সে কোথায়? তুই এখানে একা কেন? আমার তো মা তোকে দেখে অবাক লাগছে!' রাজা এইভাবে অনেকগুলো প্রশ্ন তাকে করতে লাগলেন।

সুহাসিণী এসব প্রশ্ন শুনে অনেকক্ষণ কোনো কথা বলল না। তারপর রাজার হাত ধরে টানতে টানতে একটি বড়ো ছবির কাছে নিয়ে গিয়ে বার বার ওই ছবিটির দিকে তর্জনী দেখাতে লাগল।

রাজা এসবের কোনো অর্থ বুঝতে পারলেন না। মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওরে মা, আমি ছবির কথা জিজ্ঞেস করছি না। আমি জিজ্ঞেস করছি, তুই এখানে এলি কী করে? তুই সত্যি করে বল, তোকে ওই ছবি দেব। শুধু একটা নয় অনেকগুলো ছবি দেব। তুই শুধু বল এখানে এলি কী করে?'

তখন সুহাসিণী বলল, 'ওই তো, ওই ছবি দিয়ে এলাম। দেখ না ওই ছবিটা। ওই তো পথ।'

তখনও রাজা মেয়ের কথা ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না। ওই ছবির সঙ্গে পথের যে কী সম্পর্ক তা রাজার মাথায় ঢুকল না। তবু মেয়ে যখন বার বার একই কথা বলছে তখন ছবিটা নাড়াচাড়া করে দেখা যাক ভেবে ওটা সরালেন। সরিয়ে তিনি থ বনে গেলেন। অনেকক্ষণ চোখ ফেরাতে পারলেন না। কোনো কথা বলতে পারলেন না। ছবিটা সরিয়েই দেখতে পেলেন একটা দরজা। মেয়েকে কোলে নিয়ে ওই দরজা খুলে তিনি সামনের দিকে এগোতে লাগলেন। কিছুক্ষণ এগিয়ে তিনি বুঝতে পারলেন যে সেটি একটি সুড়ঙ্গ। সেই সুড়ঙ্গ পথে মেয়েকে হাঁটানো যায় না। তাই তাকে কোলে নিয়েই তিনি এগিয়ে যেতে লাগলেন।

সুড়ঙ্গ পথে অনেক দূর যাবার পর সুহাসিণীর পরিচারিকাকে রাজা দেখতে পেলেন। সুহাসিণী নাকি পরিচারিকার ঘুমন্ত অবস্থায় ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। ঘুম ভাঙতেই তাকে দেখতে না পেয়ে ছোটাছুটি করে খুঁজতে খুঁজতে পরিচারিকা ওইখানে পৌঁছেছে। একটি বড়ো আয়না ছিল। সেখান থেকে একটি দরজা দেখতে পেয়ে সেই পথে এগিয়ে পরিচারিকা নাকি ওখানে পৌঁছেছে।

রাজা বুঝতে পারলেন যে, মেয়েকে খুঁজতে খুঁজতেই পরিচারিকা ওই সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়েছে।

সুহাসিণীকে হারিয়ে পরিচারিকার ভীষণ ভয় হয়েছিল। সে পাগলের মতো তাকে খুঁজতে লাগল। রাজার কোলে মেয়েকে দেখে তার ধড়ে প্রাণ এল। তারপর রাজা সুহাসিণী ও পরিচারিকা এগিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু ঘুরে ঘুরে যেখান থেকে ওরা শুরু করেছিল সেখানেই ওরা ফিরে আসছিল। ভিন্ন ভিন্ন পথে গিয়েও একই

জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছিল। ফলে রাজা ও পরিচারিকা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। একবার একবার করে অনেক বার ঘুরেও রাজা পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

পরিচারিকাও সুহাসিণীকে নিয়ে পথ খুঁজছিল। কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর রাজা দেখলেন তাঁর পেছনে পরিচারিকা ও সুহাসিণী নেই। ওদের অনেক বার খুঁজেও না পেয়ে রাজার মাথা খারাপ হওয়ার উপক্রম। তিনি সুড়ঙ্গের ভেতর ঘোরাঘুরি করতে লাগলেন।

চার

রাজা ভাবলেন সুড়ঙ্গ পথে নিশ্চয়ই অন্য কোথাও কোনো দরজা আছে। ভাবতে ভাবতে রাজা ওই পথে ঘোরাঘুরি করছিলেন। হঠাৎ তাঁর সামনে একটি দরজা পড়ল। দরজার কাছেই দাঁড়িয়েছিল সুহাসিণী। তার পেছনেই ছিল পরিচারিকা। ওই দরজার ভেতর দিয়ে এগিয়ে তারা পৌঁছে গেল সুহাসিণীর শয়নকক্ষে।

রাজা সুড়ঙ্গের পথ যত দেখেন ততই অবাক হন। সুহাসিণীর ঘরের সবদিকে কাচের কাজ করা রয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি ছিল আয়না। ওই আয়নাগুলোর মধ্যে একটিকে বড়ো বিচিত্র দেখাচ্ছিল। তার এক জায়গায় ছোট্ট একটা কল ছিল। ওই কল টেপার সঙ্গেসঙ্গেই গোটা আয়নাটা নীচের দিকে নামতে লাগল। নামতে নামতে সেটি যেখানে এসে থেমে গেল সেখান থেকে একটি দরজা দেখা গেল। সেই দরজা পেরিয়ে এগোতেই আর একটি কল রাজার নজরে পড়ল। সেই কল টেপার সঙ্গেসঙ্গেই আয়নাটা উপরের দিকে উঠে গেল। রাজার খুব কৌতূহল জাগল। তিনি আবার ওই কল টিপলেন। তৎক্ষণাৎ আয়নাটা মাটিতে নেমে গেল। আবার কল টিপতেই উপরের দিকে উঠে এল।

তারপর প্রশ্ন জাগল, তাহলে শয়নকক্ষে সুহাসিণী গেল কোন পথে। অন্যদিনের মতো সেদিনও সুহাসিণীকে পাশে নিয়ে পরিচারিকা ঘুমিয়েছিল। মাঝরাত্রে

সুহাসিণীর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। মেয়েটা বিছানা থেকে উঠে ঘরের মধ্যেই এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করতে লাগল। ওর ঘোরাঘুরির সময় ওর পা আয়নার ওই কলটির উপর পড়ে গিয়েছিল। তার ফলে আয়নাটা নীচে নেমে যায়। নীচে নামার পর যে দরজা চোখের সামনে পড়েছিল সেই দরজা দিয়েই এগোতে এগোতে সুহাসিণী সুড়ঙ্গপথে অনেক দূর চলে গেল। তারপর কোন পথে যে সেই অন্ধকারে সে রাজার

শয়নকক্ষে পৌঁছে গিয়েছিল তা সে জানে না। এগোতে এগোতে সে দেখতে পেল একটি ছবি। সেই ছবির একটি জায়গায় ফুটো ছিল। সেই ফুটো দিয়েই সে তার বাবাকে দেখতে পেল। বাবাকে দেখতে পেয়ে তার আর তর সইছিল না। সে যেকোনোভাবে বাবার কাছে যাওয়ার জন্য হাঁকপাঁক করতে লাগল। তারপর এটা-ওটা টিপতে লাগল, সরাতে লাগল, এইভাবে চেষ্টা করতে করতে তার হাত একটি কলের উপর পড়ে গেল। সঙ্গেসঙ্গে বিরাট বড়ো একটা ছবি সরে গেল। ছবি সরে যেতেই সুহাসিণী শয়নকক্ষে এক লাফে ঢুকে পড়ল।

পাতালভবনে পৌঁছানোর এই নতুন পথ আবিষ্কার করতে পেরে রাজার একদিকে যেমন আনন্দ হল অন্যদিকে তেমনি দুশ্চিন্তাও হল। এতদিন রাজা ভয়ে ভয়ে সকলের চোখ এড়িয়ে সাবধানতা অবলম্বন করে পাতালভবনে যেতেন। মেয়েদের সঙ্গে দেখা করতেন। আনন্দ পেতেন। কিন্তু এই নতুন পথ আবিষ্কারের পর রাজার আর কোনো চিন্তা রইল না। এখন আর উদ্যানের ওই পথ দিয়ে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন রইল না। নিজের শয়নকক্ষ থেকেই যেকোনো সময়ে তিনি পাতালভবনে মেয়েদের কাছে যেতে পারেন। কাজেই উদ্যানের পথ দিয়ে যাওয়ার যে বিপদ ছিল, লোকের চোখে পড়ে যাওয়ার, এখন আর তা নেই। যখন খুশি তখন তিনি সেখানে যেতে পারেন।

কিন্তু আর একটা দুশ্চিন্তা ও ভয় রাজার মনে ঢুকে গেল। কোনোক্রমে ভবিষ্যতে এই পথে সুহাসিণী বা অন্য কোনো মেয়ে এসে যায়, শয়নকক্ষ থেকে ওরা যদি বাইরে বেরিয়ে যায়, তাহলে তো হঠাৎ সমস্ত ফাঁস হয়ে যাবে। এতদিনের এত চেষ্টা সব বিফল হয়ে যাবে। তার ফলে একটি মেয়েকেও আর বাঁচানো যাবে

না। এখন কীভাবে যে এই নতুন বিপদ থেকে মেয়েদের বাঁচানো যায় সেই চিন্তা রাজার মগজে তোলপাড় করতে লাগল।

ভাবতে ভাবতে রাজার মনে এক নতুন পরিকল্পনা এল। এর আগে পাতালভবনে রাজা তিন মেয়ের আলাদা আলাদা ঘরে থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। এখন তিনি তার পরিবর্তন করলেন। যে ঘরে অতগুলো আয়না ছিল এবং ওই কল ছিল সেই ঘরে তিনি আর সুহাসিণীকে রাখলেন না। তিনি সেদিন পাতালভবনে গিয়ে তিন মেয়েকে দুটো ঘরে রেখে ওই আয়নার ঘর বন্ধ করে দিলেন।

এই নতুন ব্যবস্থা করে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। কিছুক্ষণ মেয়েদের সঙ্গে কাটিয়ে রাজা ওই আয়নার ঘর দিয়ে নিজের শয়নকক্ষে পৌঁছে গেলেন। এই নতুন পথ আবিষ্কার করতে পেরে রাজা আনন্দে ভগবানকে প্রণাম করে খুশি মনে দিন কাটাতে লাগলেন।

তারপর থেকে রাজা যখন ইচ্ছে তখন যেতেন মেয়েদের কাছে। বাবাকে দেখতে পেয়েই মেয়েরা তাকে জড়িয়ে ধরত এবং বাবার সঙ্গে আসতে চাইত। রাজা প্রত্যেক বার এটা-ওটা বলে, কোনো-না-কোনো অজুহাত দেখিয়ে বলতেন, 'আজকে নয় মা, আর একদিন নিয়ে যাব।'

এইভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে যেতে লাগল। রাজার তিন মেয়ে দিনে দিনে বেড়ে উঠতে লাগল। মেয়েরা এইভাবে নিরাপদে বেড়ে উঠছে দেখে রাজা খুব আনন্দ পেতে লাগল।

কিন্তু অন্যদিকে রানির মনের দুশ্চিন্তা দিনের পর দিন বেড়ে যেতে লাগল। তিনি ক্রমশ ভেঙে পড়তে লাগলেন। যাদের মেয়েদের খোঁজ করতে পাঠাতেন তারা ফিরে এসে রানির সামনে মুখ কালো করে মাথা নীচু করে দাঁড়াত।

তারপর রানি জ্যোতিষীকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করতেন, 'আমার মেয়েদের কী অবস্থা? ওরা বেঁচে আছে তো?'

'নিশ্চয় বেঁচে আছে মা। শুধু যে ওরা বেঁচে আছে তাই নয়, ওদের পেছনে যে এক-শো জন লোক ও পরিচারিকা গিয়েছিল তারাও বেঁচে আছে। কিছুদিন পরে ওরা সবাই ফিরে আসবে।' এই কথাগুলোই জ্যোতিষী প্রায়ই রানিকে বলে যেত। জ্যোতিষীর সেই কথাগুলো বিশ্বাস করে রানি কিছুটা সান্ত্বনা পেতেন। অন্তত কিছুদিন তাঁর মনে শান্তি থাকত।

এইভাবে আরও দু-বছর কেটে গেল। রাজা প্রত্যেক দিন গোপন সুড়ঙ্গপথে পাতালভবনে যেতেন। মেয়েদের সঙ্গে অনেকক্ষণ কাটিয়ে তিনি পরম তৃপ্তির সঙ্গে রাজমহলে ফিরে আসতেন। প্রত্যেক দিন তিন কন্যা রাজাকে ছাড়তে চাইত না। তাঁর সঙ্গে মা-র কাছে যেতে চাইত। কিন্তু রাজা তাদের নানা কথা বলে
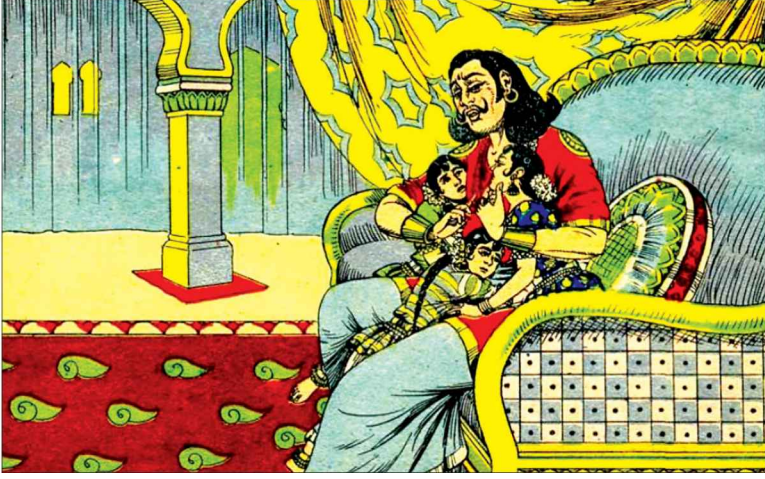
ভুলিয়ে চলে আসতেন। একদিন ওরা বলল, 'আমাদের এখানে কেন রেখেছ, বাবা? আমাদের মা-র কাছে নিয়ে যাও, আমরা মাকে দেখব।' বলে ওরা কাঁদতে লাগল। রাজার মন বিষণ্ণ হয়ে গেল। মনে মনে ভাবলেন, 'একবার অন্দরমহলে নিয়ে গিয়ে রানিকে দেখিয়ে আনলে কেমন হয়। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি নিজেকে বোঝাতে লাগলেন, 'কী দরকার? দু-বছর তো হয়ে গেল। আর মাত্র এক বছর।' তাই মেয়েরা যতই কান্নাকাটি করুক না কেন রাজা তাদের নিয়ে অন্দরমহলে আসেননি।

এইভাবে আরও কয়েক দিন, কয়েক মাস কেটে গেল। সাত বছর পূর্ণ হতে আর মাত্র চার দিন বাকি ছিল। এই চার দিন পরে তাদের জীবনে আর কোনো বিপদের, কোনো মৃত্যু ভয়ের কারণ থাকবে না। রাজা ভাবলেন, 'পাতালভবনে টানা তিন বছর তো কেটে এল। এতদিন যখন মেয়েদের কোনো বিপদ-আপদ হয়নি আর মাত্র এই চার দিনে কি হবে। জ্যোতিষীর মত অনুসারে সাত বছর পরে তো আমাদের মেয়েদের জীবনে আর ফাঁড়া নেই।'

কথায় বলে, রাখে হরি মারে কে আর মারে হরি রাখে কে। রাজা ভাবলেন নানা কথা। এইভাবে কোনোদিন ভাবেননি। রাজা আগে যেভাবে ভেবেছিলেন সেভাবে আর ভাবলেন না। রাজা যে উদ্দেশ্যে ওই পাতালভবনে মেয়েদের রাখলেন সেই উদ্দেশ্য মনে রেখেও তিনি যেন ভুলে গেলেন। তিনি নানা কথা এলোমেলো ভাবে ভাবতে লাগলেন। যথারীতি রাজা সেদিন ওই গোপন সুড়ঙ্গ পথেই মেয়েদের দেখতে এলেন। সেটাই ছিল শেষ দিন। ওই একটি দিন কেটে গেলে সাত বছর পূর্ণ হবে। কিন্তু সেদিন তিন মেয়েতে মিলে বাপের কোনো কথা শুনতে চাইল না। জিদ ধরল

তাদের সঙ্গে নিয়ে যেতেই হবে। তারা এত কাঁদতে লাগল যে কোনো বাপের পক্ষে মেয়েদের চোখে অত জল দেখে সহ্য করা সহজ নয়।

রাজা ভাবলেন, 'টানা তিন বছর কাটতে আর মাত্র একটি দিন বাকি। এই একটি দিনে কী আর এমন বিপদ হতে পারে। তা ছাড়া এদের নিয়ে গেলে এত লোক আমার মেয়েদের উপর নজর রাখবে যে অত হাজার হাজার নজর এড়িয়ে কোনো বিপদ ঘটতে পারে না।' ভাবতে ভাবতে রাজা মনে সাহস এনে ঠিক করলেন, চাকর ও পরিচারিকা সহ তিনি উঠে আসবেন। তাঁর শয়নকক্ষ থেকে যে একটি পথ আছে সেটা অন্য কেউ জানুক তা তিনি চাননি। তাই তিনি উদ্যানের পথ দিয়ে ওদের পাতালভবন থেকে তুলে আনলেন।

প্রায় তিন বছর পরে সেই পুরোনো উদ্যানে ফিরে এসে, সূর্যের আলো, প্রকৃতির বাতাস, ফল আর ফুলে ভরা বাগান দেখে মেয়েরা আনন্দে নাচতে লাগল। তারা লাফাতে লাগল, ছোটাছুটি করতে লাগল। আর ওই এক-শো জন ও তিন জন পরিচারিকা ওদের আগলে রাখছিল।

ঠিক এমন সময় মুহূর্তে সমস্ত আকাশ কালো করে মেঘ জমে গেল। হাজার হাজার কালো পাহাড়ের মেঘ যেন আকাশ থেকে মাটির বুকে নামতে লাগল। আর পরমুহূর্তে প্রচণ্ড তীব্রগতিতে ঝড় এল। ঘূর্ণি ঝড়ের তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে প্রত্যেকে চোখ বুজল মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই সবাই দেখতে পেল তিনটে বাজপাখি তিন মেয়েকে নিয়ে চলে গেল। সঙ্গেসঙ্গে রাজা মূর্ছা গেলেন। এক-শো জন চাকর ওই বাজপাখিদের পেছনে ছুটল।

রাজার যখন জ্ঞান ফিরল, তখন তিনি চারদিক তাকিয়ে বললেন, 'চাকরগুলো সব কোথায়?' রাজার কথা শুনে ওই এক-শো জন মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। তিন বছর আগে রাজা যেভাবে গল্প ফেঁদে রানিকে বুঝিয়েছিলেন সেই গল্প যে একদিন সত্য হতে পারে তা তিনি কোনোদিন ভাবেননি। তাঁর অনুতাপের সীমা ছিল না।

তিনি নানা কথা ভেবে নিজেকে বার বার মনে মনে দোষারোপ করতে লাগলেন। মাত্র একদিন তিনি ধৈর্য ধারণ করতে পারলেন না! তবে বিধির বিধানের ওপর কারও হাত নেই। তাই তিনি পাতালভবনে মেয়েদের আর একটি দিন রাখতে পারলেন না। কিন্তু এখন তো করার কিছুই নেই। চোর পালালে বুদ্ধি বাড়িয়েই বা কী লাভ?

অনেক ভেবে রাজা একদিন যে গল্প ফেঁদেছিলেন আজ তাই ঘটে গেল। রাজা চোখের সামনে পরিষ্কার দেখতে পেলেন। যে মেয়েদের বাঁচানোর জন্য, যে মেয়েদের অমর করে তোলার জন্য রাজা এতদিন সযত্নে পাতালভবনে রেখেছিলেন সেই মেয়েরা আজ তাঁর হাত থেকে হারিয়ে গেল। ওরা কোথায় গেল। বাজপাখিগুলো কি সত্যি বাজপাখি? নাকি বাজপাখির রূপ ধরে অন্য

কোনো কিছু এসে ছোঁ মেরে তাঁর মেয়েদের নিয়ে গেল! রাজার কাছে সব কিছুই স্বপ্নের মতো লাগছিল। কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় তিনি যা দেখলেন তা স্বপ্ন ভেবেই বা কি লাভ? কত বার রানির কাছে মিথ্যা কথা বলবেন।

রাজা ভাবলেন, 'আর এসব বিষয় রানির কাছে লুকিয়ে রেখে লাভ কি?' তারপর তিনি ওই এক-শো জন চাকর ও তিন জন পরিচারিকাকে নিয়ে অন্দরমহলে গিয়ে রানিকে সব বললেন।

রানি ও রাজা দু-জনেই তিন মেয়েকে হারানোর ব্যথায় দুঃখের গভীর সাগরে তলিয়ে গেলেন।

পাঁচ

রাজা যাও-বা উঠে দাঁড়ালেন রানির কিন্তু আর উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতা রইল না। তিনি দুঃখে ভেঙে পড়েছিলেন। রাজার মনে হল হারানো মেয়েদের আর কোনোদিন ফিরে পাবেন না। রানিও সেরে উঠবেন না বলেই তখন রাজার দৃঢ়বদ্ধ ধারণা হল।

'আর মাত্র একটি দিন বাকি ছিল, কী যে ভূত চাপল আমার মাথায়, কেন যে এ-রকম করলাম, আমার চোখের সামনে আমার মেয়েদের এভাবে নিয়ে গেল, আমি কিছুই করতে পারলাম না। বাজপাখিদের ধাওয়া করে যারা গেল তারাও আর ফিরল না! কী হবে মেয়েদের? কী হবে রানির? কী হবে ওদের?' এই ধরনের কথা রাজা মনে মনে অনেকক্ষণ ধরে বলতে লাগলেন।

ওদিকে রানির জ্ঞান ফেরেনি। বৈদ্য এল, ওষুধ দিল। কিন্তু রানির জ্ঞান ফিরল না। রানিকে ঘিরে যারা থাকত তারা বলাবলি করতে লাগল, 'রানি হয়তো আর বাঁচবেন না।'

একের-পর-এক বৈদ্য আসতে লাগল। ওষুধ দিতে লাগল।

রানি সেরে উঠছে না দেখে রাজার উদ্‌বেগ আরও বেড়ে যেতে লাগল। রাজা অস্থির হয়ে উঠলেন।

রানির জ্ঞান ফিরল। জ্ঞান ফেরার পর তিনি ছুটে এসে রাজাকে ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে চিৎকার করে বার বার জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, 'কোথায়— কোথায়, আমার মেয়েরা কোথায়? বল তুমি ওদের কোথায় লুকিয়ে রেখেছ? বল, বল, না হলে তোমায় ছাড়ব না।' রানি পাগলের মতো একনাগাড়ে অনেকক্ষণ বলে যেতে লাগলেন।

রাজা ভারী গলায় বললেন, 'রানি তুমি আমায় বিশ্বাস কর, আমি তোমায় মিথ্যে কথা বলিনি। তোমার কাছে মিথ্যে কথা বলে আমার কী লাভ? সেবারের মতো এবারে আমি মেয়েদের কোথাও লুকিয়ে রাখিনি। কেন রাখব? আমার কথা বিশ্বাস না হয় বাজপাখিগুলো মেয়েদের যে কীভাবে নিয়ে গেছে তা তো অনেকেই দেখেছে, তুমি ওদের জিজ্ঞাসা করতে পার। সেবারে আমি মিথ্যে কথা বলেছিলাম ঠিক, কিন্তু এবার বলছি না।'

কিন্তু রাজা যত বুঝিয়েই বলুন না কেন, রানি সে-কথা বিশ্বাস করতে পারেনি। হাত নেড়ে নেড়ে মাথা দোলাতে দোলাতে পাগলের মতো বলতে লাগলেন, 'কাকে জিজ্ঞেস করব? তুমি আর তোমার কর্মচারী, সবাই সমান। সবাই মিথ্যেবাদী। আমি কারও কথা বিশ্বাস করি না। আমার মেয়েদের খুঁজতে আমিই বেরোব। আমাকে বেরোতে দিন।' বলে রানি সোজা এগিয়ে যেতে লাগলেন।

রাজা হতভম্ব হয়ে গেলেন। রানি যে তাঁকে বিশ্বাস করবেন না, তা তিনি ভাবতে পারেননি কোনোদিন। একবার যখন রানিকে মিথ্যে কথা বলেছেন তখন রানির কথা সত্য না বলেও উপায় নেই। একের-পর-এক বৈদ্য আসতে লাগল কিন্তু রানিকে কিছুতেই ঘুম পাড়িয়ে রাখা যাচ্ছিল না।

বিশেষ বৈদ্য এসে অনেকক্ষণ পরীক্ষা করে একের-পর-এক ওষুধ দিল। সে ওষুধ পেটে যেতে-না-যেতেই রানির শরীর কেমন যেন অচঞ্চল হয়ে গেল। ক্রমশ রানিকে দেখে মনে হল যেন পাষাণ-প্রতিমা। রানির এই অবস্থা দেখে রাজা উদ্‌বিগ্ন হলেন।

তখন সেই বৈদ্য রাজাকে বলল, 'মহারাজ, মহারানির কোনো কষ্ট এখন আর নেই। এইভাবে থাকলে তাঁর কোনো কষ্ট হবে না। তাঁর শরীর বা মনের কোনো কষ্টই থাকবে না। তাঁকে এভাবেই রাখতে চাই। তিন কন্যাকে ফিরিয়ে আনার পর মহারানির সামনে ওদের দাঁড় করালে রানি আগের মতো প্রাণবন্ত হয়ে উঠবেন। যতক্ষণ না আপনি মেয়েদের এনে হাজির করছেন ততক্ষণ পর্যন্ত মহারানিকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব স্বয়ং আমি নিচ্ছি।'

'ঠিক আছে। ভরসা পেলাম। আমি আজকেই দেশ-দেশান্তরে ঘোষণা করিয়ে দেব, 'যে আমার মেয়েদের এনে দেবে তাকে আমার রাজ্য উপহার দেব, এই ঘোষণার পর আমি আশা করছি নিশ্চয় সুফল পাব।'

দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস কেটে যেতে লাগল। কিন্তু কোনো খবর এল না। মেয়েদের নিয়ে কেউ হাজির হল না। রানির জাগতিক জ্ঞান কিছুই ছিল না। তিনি বেঁচে আছেন এই পর্যন্ত। যে বৈদ্য তাঁকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিনি তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছেন এইমাত্র। কিন্তু রাজা, যিনি প্রতি মুহূর্তে বুঝতে পারছেন যে মেয়েরা ফিরছে না, মেয়েদের খবর কেন আনছে না। তিন তিনটি মেয়েকে এভাবে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল বাজ পাখিতে— প্রতি মুহূর্ত

রাজার চোখের সামনে সেই দৃশ্য ভাসছিল। ভাবতে ভাবতে রাজার মনেও তখন এক বিচিত্র ভাবের উদয় হচ্ছিল।

একদিন রাজা তিনতলায় পায়চারি করছিলেন। মনে হল দূর থেকে কারা যেন আসছে। অস্পষ্ট আলোতে ঠিক চেনা যাচ্ছিল না। তিন জনেরই উচ্চতা এক। তিন জনকেই একরকম দেখাচ্ছিল। হঠাৎ রাজার মনে হল ওরা তাঁরই তিন মেয়ে। তিনতলা থেকে নেমে তিনি সোজা ওদের দিকে ছুটতে লাগলেন। কাছাকাছি গিয়ে দেখলেন ওদের তিন জনেরই উচ্চতা এক, চালচলনও এক, তিন জনকেই প্রায় একরকম দেখতে, কিন্তু ওরা তাঁর মেয়ে নয়। তিনটি ছেলে। কিন্তু ওই তিনজনেরই চেহারা একরকম দেখে রাজার মনে ভীষণ কৌতূহল জাগল। তিনি মনে মনে বললেন, 'এরা হয়তো বদলে গেছে। আমার তিন মেয়েকে কেউ হয়তো জাদু করে বদলে ফেলেছে।' ভাবতে ভাবতে রাজা ওদের দিকে অপলক চোখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন।

রাজাকে এভাবে সামনে দাঁড়িয়ে ওদের দেখতে দেখে ওই ছেলেদের মধ্যে একজন এগিয়ে এল রাজার কাছে। রাজা ওই ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কারা? তোমরা কোন দেশ থেকে এসেছ? কোথায় যাচ্ছ? এখানে কেন এসেছ? তোমাদের সঙ্গে আর কে আছে?' রাজা যখন একের-পর-এক প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন তখন ছেলেরা ভাবছিল, এত প্রশ্ন ইনি করছেন কেন? ওরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করছিল। ওই তিন ছেলে এতগুলো প্রশ্নের একটি মাত্র জবাব দিল, 'আমরা এই দেশের রাজার সঙ্গে দেখা করতে এখানে এসেছি।'

রাজা দানশীল জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন? অন্য কেউ নয়, একেবারে রাজার সঙ্গে দেখা করতে চাও?'

'হ্যাঁ। আমরা রাজার ঘোষণা শুনে এসেছি। রাজার কন্যারা নাকি হারিয়ে গেছে? আমরা সেই ব্যাপারে রাজার সাথে দেখা করতে চাই?' ছেলেরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলল।

'ও, তাই নাকি? আচ্ছা, চল। আমি নিয়ে যাচ্ছি তোমাদের। আমি তোমাদের রাজার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেব।' বলে রাজা ওদের নিয়ে গেলেন নিজের প্রাসাদে। রাজা তাদের কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাস লক্ষ করে যেন তাদের উপর কিছুটা ভরসা করতে পারলেন।

প্রাসাদে এনে রাজা ওদের তিন জনেক তিনটি আসনে বসিয়ে নিজে মুকুট পরে সিংহাসনে বসলেন। ছেলেরা অবাক হয়ে নিজেদের মধ্যে কী যেন বলাবলি করছিল। এমন সময় রাজা দানশীল বললেন, 'শোনো, আমিই এদেশের রাজা। আমিই সেই হতভাগ্য পিতা, যে নিজের কন্যাকে হারিয়েছে।'

তিন ছেলে আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে রাজাকে নমস্কার করল। 'আমরা যে এতক্ষণ রাজার সঙ্গে কথা বলছিলাম তা বুঝতে পারিনি। ক্ষমা করবেন।'
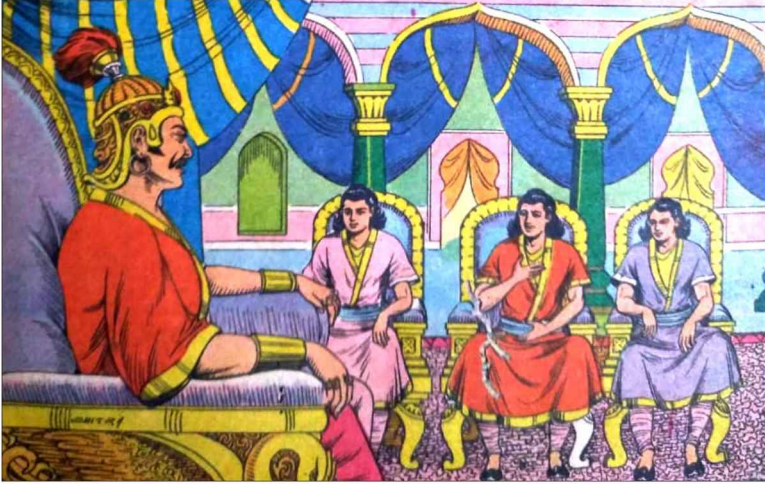
'না, না। তাতে কী হয়েছে। আমার শরীর আর মনের অবস্থা এমন হয়ে আছে যে মুকুট না পরলে আমাকে রাজা মনে হওয়ার কোনো কারণ নেই। যাক সে-কথা। এখন যে কাজে এসেছ, সেই কাজের কথা হোক।' রাজা সাগ্রহে বললেন।

তিন ছেলে রাজাকে আর একবার নমস্কার করে একজন রাজাকে বলল, 'মহারাজ, আমরা ভদ্রপুর থেকে এসেছি। ভদ্রপুরের এক গরিব পরিবারে জন্ম আমাদের। আমার নাম আলো, এর নাম অন্ধকার আর ওর নাম সন্ধ্যা।'

রাজা অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'কী বললে? তোমাদের নাম আলো, অন্ধকার আর সন্ধ্যা? অদ্ভুত নাম তো? এমন বিচিত্র নাম রাখার পিছনে নিশ্চয় কোনো কারণ আছে?'

রাজার প্রশ্নের জবাবে যে ছেলেটির নাম আলো সে বলল, 'মহারাজ আমরা একই দিনে একই মায়ের পেটে জন্মেছি। আমাদের জন্ম কয়েক ঘণ্টা অন্তর হয়েছে। এ জন্মেছে সন্ধ্যার সময় ও জন্মেছে অন্ধকার রাত্রে আর আমার জন্ম হয়েছে ভোরের আলো ফোটার সময়। আমাদের তিন জনকে একইরকম দেখতে হওয়ায় মা আমাদের গুলিয়ে ফেলছিলেন। তাই অনেক ভেবে মা আমাদের নাম এইভাবে সন্ধ্যা, অন্ধকার এবং আলো রাখলেন।'

'এ তো বড়ো বিচিত্র ব্যাপার! আমারও তিন কন্যা একই দিনে হয়েছে আর তোমরাও তিন ছেলে একই দিনে জন্মেছ। আমার তিন বিচিত্র কন্যাকে খোঁজার জন্য তোমরা তিন বিচিত্র ছেলে এগিয়ে এসেছ। এই ধরনের অভূতপূর্ব ঘটনার পিছনে নিশ্চয় স্বয়ং ভগবানের হাত আছে।'

রাজা যেন কিছুক্ষণের জন্যে বিস্ময়ের সাগরে ডুবে গেলেন।

তারপর রাজা ছেলেদের আরও কাছে বসিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, তোমরা তো গরিব ঘরের ছেলে বলছ। এই যে তোমরা বেরোলে, বাড়িতে জানিয়েছ?'

আলো বলল, 'জানাব না কেন? মাকে না জানিয়ে আমরা কোনো কাজ করি না। তবে বুড়ি মাকে একা রেখে আমাদের তিন জনের একসঙ্গে বেরিয়ে আসা অন্যায় হয়েছে বলতে পারেন। কিন্তু তা ছাড়া উপায় ছিল না। আমরা একে অন্যের সাহায্য ছাড়া চলতে পারি না। আমাদের জন্মের সময়ক্ষণই এর জন্য দায়ী। যে সন্ধের সময় জন্মেছে সে দিনের বেলায় এবং রাত্রি বেলায় দেখতে পায় না। অন্ধকার যে সে দিনের বেলা দেখতে পায় না একেবারেই, আর আমি সন্ধ্যায় অথবা রাত্রে কিছুই দেখতে পাই না। তাই আমাদের দূরে কোথাও যেতে হলে একা বেরোতে পারি না। দূরের পথে যেতে দিনের পর সন্ধ্যা, সন্ধ্যার পর রাত্রি হয়। আর আমরা যে উদ্দেশ্যে বেরিয়েছি, যে বিরাট কাজ করার মন নিয়ে বুকে ভরসা ও সাহস রেখে বেরিয়েছি সেই কাজ করতে হলে দিনে-রাত্রে-সন্ধ্যায় ঘুরে বেড়াতে হতে পারে। সারাদিনে আমি যতটা করব সেই কাজ সন্ধ্যার সময় শুরু করবে সন্ধ্যা। তার পর বাকি কাজে হাতে দেবে অন্ধকার। কোন কাজ কতক্ষণে শেষ হবে কেউ বলতে পারে না। শুধু একটি দিনের কাজ হলে আমি একাই বেরোতে পারতাম। শুধু একটি সন্ধ্যায় কাজ সম্পূর্ণ করা যাবে জানা গেলে সন্ধ্যা বেরোত। আর শুধু একটি রাত্রির কাজ হলে অন্ধকার একাই সাহস করে বেরোতে পারত। কিন্তু আপনার তিন মেয়েকে খোঁজার কাজ একটি দিনের, একটি সন্ধ্যার অথবা একটি রাত্রে নাও হতে পারে।'

আলোর কথা শুনে রাজা বললেন, 'তোমার কথা শুনে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি। তবে তোমাদের মাকে একা ভদ্রপুরে আর রাখব না। লোক পাঠিয়ে আনিয়ে নিচ্ছি। তোমাদের মা-র এখানেই থাকার সুন্দর ব্যবস্থা হবে।'

'তাহলে তো আমাদের আর কোনো দুশ্চিন্তাই থাকবে না।' তিন ছেলে একসঙ্গে বলল। সেইদিনই রাজা ওদের মাকে লোক পাঠিয়ে আনিয়ে নিলেন। তাঁর থাকার সুন্দর ব্যবস্থা করে দিলেন। রাজা ওদের মাকে বললেন, 'আপনি তিন সাহসী ছেলের মা। আপনার খাওয়া থাকা ইত্যাদি সমস্ত কিছুর দায়িত্ব আজ থেকে আমি নিচ্ছি।'

রাজার মুখে এই ধরনের প্রশংসার কথা শুনে আলো সন্ধ্যা ও অন্ধকারের মা খুব আনন্দিত হল।

ওদের মায়ের অনুমতি নিয়ে রাজা ছেলেদের নাম একটু পরিবর্তন করে রাখলেন সন্ধ্যাকুমার, নিশীথ ও উদয়। এই পরিবর্তন সানন্দে ওদের মা মেনে নিলেন।

পরের দিন সন্ধ্যাকুমার, নিশীথ ও উদয় রওনা হতে চাইল। রাজা ওদের পছন্দসই অস্ত্র ও ঘোড়া নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। উদয় রাজার কাছ থেকে

নিল ধবধবে ফর্সা একটা ঘোড়া নিশীথ নিল মিশমিশে কালো আর সন্ধ্যাকুমার নিল খয়েরি রঙের ঘোড়া। রাজা তিন ঘোড়ার সঙ্গে তিনটি কালো পতাকা লাগিয়ে দিলেন।

তারপর রাজা ওদের বললেন, 'আমার তিন মেয়ে সুহাসিণী, সুভাষিণী ও সুকেশিণীকে নিয়ে এখানে ফিরে এসেই এই পতাকাগুলো ছিঁড়ে ফেলবে।'

পরক্ষণেই তির বেগে তিনটি ঘোড়া ছুটে গেল।

ছয়

সাদা ঘোড়ায় চেপে উদয় সামনে যাচ্ছিল। দিনের বেলা হওয়ায় উদয়ের পক্ষে সামনে থাকা সহজ ছিল। কিন্তু সন্ধ্যাকুমার ও নিশীথের অবস্থা আলাদা। ওদের চোখ আছে কিন্তু দিনে দেখতে পায় না। উদয়ের ঘোড়ার শব্দের অনুসরণে ওদের ঘোড়া চলে। উদয়ের ঘোড়া চললেই ওদের ঘোড়া চলে। উদয়ের ঘোড়া থামলেই ওদের ঘোড়া থামে। এইভাবে ঘোড়ায় চড়ে অনেক দূর যাওয়ার পর সন্ধ্যা হল।

তখন উদয় বলল, 'সন্ধ্যাকুমার, আর তো আমি এগিয়ে যেতে পারব না। কারণ চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। এবার তোমাকে এগোতে হবে। আমি আর নিশীথ থাকব পেছনে।'

উদয়ের কথামতো সন্ধ্যাকুমার এগিয়ে গেল। তাকে অনুসরণ করল উদয় আর নিশীথের ঘোড়া।

যেতে যেতে সন্ধ্যের আকাশ ক্রমশ কালো হয়ে এল। অন্ধকার ডানা মেলে

পৃথিবীর বুকে নামল। ততক্ষণে ওরা গভীর বনে পৌঁছাল। অন্ধকারে উদয় বা সন্ধ্যাকুমারের পক্ষে ঘোড়া চালানো সম্ভব ছিল না। আর রাতও হয়েছিল বেশি। অত রাত্রে নিশীথকে সামনে রেখে ও ঘোড়ায় চড়ে পথ চলা ঠিক হবে না ভেবে ওরা বিশ্রাম করতে চাইল।

নিশীথ বলল, 'তোমরা নীচে রাত কাটালে আমার আর বিশ্রাম হবে না। তোমরা গাছের উপর উঠে পড়। আমি চারদিকে ঘুরে দেখি কোনো ঘরবাড়ি আছে কি না। সারারাতটা তো আর এখানে কাটানো যায় না। যাওয়ার আগে আমি ঘোড়াগুলোকে এই গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখছি।'

নিশীথ দুটো ঘোড়া গাছের সঙ্গে বেঁধে নিজে কালো ঘোড়া নিয়ে চলে গেল। নিশীথ অন্ধকারে পরিষ্কার দেখতে পায়। তাই সে খুব সহজেই গভীর বনের চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল কোনো ঘরবাড়ি আছে কি না।

অনেক দূরে নিশীথ একটি কুঁড়ে ঘর দেখতে পেল। ঘরের কাছে গিয়ে হাঁকডাক করে কারও সাড়া পেল না। ঘরের কাছে ঘোড়া থেকে নেমে দরজায় টোকা মারল। কারও সাড়াশব্দ পেল না। তখন কিছুক্ষণ ভেবে নিশীথ জানলা দিয়ে উঁকি মেরে ঘরের ভেতরটা দেখল। কিছুই নজরে পড়ল না। কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করল। কোনো শব্দ শুনতে পেল না। সাহসে বুক বেঁধে নিশীথ দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল। ঘরে যেদিকে তাকাল সেদিকেই তার নজরে পড়ল পাট। তাও কেমন ছড়ানো। গুছিয়ে রাখা ছিল না। একটি ঘরে শুধু পাট থাকাতে তার কেমন সন্দেহ হল। ভাবল, কিছুক্ষণ ঘরের আড়ালে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে নিশ্চয়ই ঘরের মালিক কিছুক্ষণের মধ্যে আসবে।

অনেকক্ষণ নিশীথ ঘরে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু কেউ এল না। তখন ঠিক করল ভাইদের নিয়ে ওই ঘরেই রাত কাটাবে। পোড়োবাড়ির মালিক হয়তো এখন আর কেউ নেই। ভাবতে ভাবতে সে ঘর থেকে বেরিয়ে কালো ঘোড়ায় উঠে বসল। যে পথে এসেছিল সেই পথ ধরে সে ওই গাছের কাছে ফিরে গেল। সেখানে নিশীথের অনুপস্থিতিতে একটা ঘটনা ঘটেছিল।

নিশীথের চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই উদয় এবং সন্ধ্যাকুমার গাছের উপর থেকে একটি শব্দ শুনতে পেল। ওরা ভাবল হয়তো গাছের নীচে কোনো জন্তুজানোয়ার ঘোরাঘুরি করছে। এই অন্ধকার রাত্রে, এই গভীর বনে একটি পোকা চলাফেরা করলেও অমন শব্দ হয়। সাত-পাঁচ ভেবে ওরা অধীর আগ্রহে নিশীথের প্রতীক্ষায় ছিল।

দেখতে দেখতে উদয়ের মনে হল পাটের দড়ির মতো কি যেন তার গায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। উদয় বলল, 'সন্ধ্যাকুমার, দেখ তো কি যেন আমার গায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে আমাকে যেন কেউ দড়ি দিয়ে পাক দিয়ে দিয়ে কষে বাঁধছে।'

উদয়ের কথা শেষ হতে-না-হতেই, 'তাই তো, আমারও কোমরে কী যেন জড়িয়ে যাচ্ছে। পাট না শন না দড়ি কিছুই বুঝতে পারছি না।' সন্ধ্যাকুমার বলল।

কিছুক্ষণ পরে ওরা দু-জনেই বুঝল ওদের দু-জনকেই বেঁধে কে যেন টানছে। হাত বাড়িয়ে উদয় ও সন্ধ্যাকুমার অন্ধের মতো হাতড়ে হাতড়ে দেখল। ধারে-কাছে কেউ আছে বলে তাদের মনে হল না।

এমন সময় ওরা শুনতে পেল, 'অত সহজ? অত সহজে তোমরা আমাকে ধরবে? আমাকে দেখতে পাবে? তোমাদের চেয়ে কত বড়ো বড়ো মক্কেল আমাকে ধরতে পারল না, আমাকে দেখতেও পেল না। আর তোমরা ভাবছ এক বার হাত বাড়িয়েই ধরে ফেলবে?'

উদয় ও সন্ধ্যাকুমার পরিষ্কার বুঝতে পারল, ভূত অথবা পিশাচ ওদের টানছে। যেকোনোভাবে নিশীথের আসা পর্যন্ত এই ভূতের সঙ্গে ওদের যুঝতে হবে। ওরা জোরে জোরে বলল, 'তোমার কপাল ভালো, এখন এখানে নিশীথ নেই। থাকলে তোমাকে আর আস্ত ফিরে যেতে হত না। নিশীথকে তুমি চেন না। নিশীথ আমাদের দাদা। ভালো চাও তো ওর আসার আগে সরে পড়। তা নাহলে তোমার আর রক্ষে থাকবে না। আজকেই তুমি সোজা যমালয়ে চলে যাবে। যাও, যাও, কেটে পড়। ওর আসার এখন সময় হয়ে গেছে।'

'তোমরা আর লোক পেলে না? আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছ? তোমার দাদার মতো শক্তিশালী লোক একা এলে তো কিছু করতে পারবে না, যাও এক-শো জন নিয়ে এসো। এক-শো হলেই যে জিতে যাবে তা নয়, আমার সামনে একটু দাঁড়াতে পারবে, এই যা। তবে তোমার দাদা আসা পর্যন্ত তো আমি আর এখানে থাকছি না, আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে।' বলে লোকটা নিজের দড়ির প্রান্ত দিয়ে ওদের বেঁধে সাঁ সাঁ করে পেছিয়ে গেল। পেছনের দিকে যেতে যেতে গাছের নীচে বাঁধা ঘোড়া দুটোর উপরে একটু ছাই ছড়িয়ে দিল। পরক্ষণেই ঘোড়াগুলো হাওয়া হয়ে গেল। ঘোড়াগুলো যে কোথায় গেল বোঝা গেল না।

সেইসময় নিশীথ সেখানে এল। গাছের উপরে তাকিয়ে দেখে উদয় আর সন্ধ্যাকুমার নেই। যেখানে ঘোড়াগুলোকে বেঁধে রেখেছিল, সেখানে ঘোড়া নেই। চারদিকে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেল না। তখন নিশীথ ভাবল হয়তো তার আসতে দেরি হওয়ায় ভাইরা তার খোঁজে কষ্ট করে বেরিয়েছে। অগত্যা নিশীথ নিজের কালো ঘোড়ায় চেপে কোন দিকে যাবে তা ভাবতে লাগল।

ঘন বনের বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরতে ঘুরতে নিশীথ ক্লান্ত হয়ে গেল। খুঁজে খুঁজে সে পেল না উদয় ও সন্ধ্যাকুমারের দেখা। এদিকে রাত শেষ হয়েছে। আর এক প্রহর পরেই হয়তো সকাল হবে। সকাল হয়ে গেলেই নিশীথের পক্ষে আর এক পা-ও এগোনো সম্ভব হবে না। নিশীথ মরিয়া হয়ে খুঁজতে লাগল। সারা বন সে আর একবার তন্নতন্ন করে খুঁজল। কিন্তু অত খুঁজেও কোনো লাভ হল না।

হঠাৎ নিশীথের মনে হল, 'আচ্ছা এও তো হতে পারে, আমাকে খুঁজতে বেরিয়ে উদয় ও সন্ধ্যাকুমার আমি যে কুঁড়ে ঘরের সন্ধান পেয়েছিলাম সেখানে গেছে!' নিশীথ তখন সেই ঘরের কাছে এল। ভাবল ভাইরা যদি এখানে এসে থাকে তাহলে ঘোড়াগুলো নিশ্চয়ই ঘরের বাইরে বাঁধা থাকবে। কিন্তু না। বাইরে আশেপাশে কোথাও ঘোড়া ছিল না। হতাশায় নিশীথ যেন ভেঙে পড়ল। কি করবে ভেবে পেল না। পরক্ষণেই কী ভেবে দরজা ঠেলে ঘরের ভেতরে ঢুকল। ঘরে ঢুকেই অবাক হয়ে গেল। তার ভাই উদয় ও সন্ধ্যাকুমার হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ওরা বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। নিশীথ দেখল ওদের কাছাকাছি ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ে রয়েছে। সে আরও অবাক হল উদয়ের একটি হাত নেই দেখে। আবার লক্ষ করল হাত কেটে ফেলার কোনো চিহ্নও নেই।

এসব দেখে নিশীথের মাথা ঘুরতে লাগল। কিছুক্ষণ ভেবে ওদের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ওদের গায়ে হাত বুলোল। ওদের ডেকে তুলল। ওর গলা শুনে উদয় ও সন্ধ্যাকুমার বলে উঠল, 'ভাই তুমি ওই পিশাচের খপ্পরে এখনও পড়নি তো? ওকে

এড়িয়ে এখানে এলে কী করে? তোমাকে যে আবার দেখতে পাব সে আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম।' বলে ওরা নিশীথকে জড়িয়ে ধরে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল।

'তোমরা কাঁদছ কেন? এখন কি কান্নার সময়? আগে শুনি কীভাবে তোমরা এলে এখানে। কে এনেছে? কেন এলে? তোমাদের কে বেঁধেছে? উদয়ের হাত কী হল? এখানে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত কেন?' প্রশ্নগুলো নিশীথ উদ্‌বিগ্ন হয়ে খুব দ্রুত করে যেতে লাগল।

উদয় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, 'এ সবই আমাদের দুর্ভাগ্য ভাই! তোমার যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই একটা লোক এসে আমাদের বেঁধে এখানে এনে ফেলে রেখেছে। লোকটাকে আমরা দেখতে পাইনি। কোথায় যে সে আমাদের নিয়ে এল তাও আমরা জানি না। কোন পথ দিয়ে যে আনল তাও বুঝতে পারিনি। আমি অনেকক্ষণ থেকে সকালের অপেক্ষায় আছি। এখন ভোর হয়েছে। একটু একটু দেখতে পাচ্ছি। যে লোকটা আমাদের বেঁধে এনেছে তাকে ছায়া ছায়া দেখেছি। ওকে দেখে একদিকে যেমন ভয় পেয়েছিলাম, আবার হাসিও পেয়েছিল। লোকটা বোধ হয় বামন। এক হাতের বেশি লম্বা হবে না। কিন্তু তার দাড়ি এক-শো হাতের চেয়ে বড়ো। সে দাড়ি দিয়ে আমাদের বেঁধে দিল। এতক্ষণ সে আমাদের পাশেই শুয়েছিল। তোমার আসার কিছুক্ষণ আগে বোধ হয় উঠে গেছে। ঘুমের ঘোরে ওকে বলতে শুনেছিলাম, 'মনে হচ্ছে তোমাদের দাদা আসছে। দাঁড়াও ওকেও বেঁধে এখানে আনছি। বলে ঝট করে উঠেছিল। ও বোধ হয় ভুলেই গিয়েছিল যে তার দাড়িতে আমাদের বেঁধে রেখেছে। তার দাড়ি ছিঁড়ে যাওয়াতেই রেগে গিয়ে সে বলল, 'ইস দাড়িটা ছিঁড়ে গেল! এই দাড়িই আমার প্রাণ। যা একবার ছিঁড়ে যায় তা আর জোড়া লাগে না।' বলে সে পকেট

থেকে কী যেন বের করে আমার কাঁধে লাগিয়ে দিল। চোখের পলকে আমার একটি হাত লোপাট হয়ে গেল। তারপর সে চলে গেল।' এসব কথা শুনে নিশীথ ভেবে পেল না সে কী করবে।

ততক্ষণে সকাল হল। উদয় বলল, 'আর দেরি করা উচিত নয়। নিশীথ তুমি তো এখন আর দেখতে পাবে না? তোমাকে সন্ধ্যাকুমারের পাশে বেঁধে রেখে দি। তুমি এমন ভাবে বসবে যেন তোমার একটি হাত সে দেখতে না পায়। তুমি কিন্তু এমন ভাবে পড়ে থেকো যাতে বেঁটে লোকটা ভাবতে পারে যে সে তোমাকেই বেঁধে এনেছে। এমন কিছু কর না বা বল না যাতে তার মনে একটুও সন্দেহ জাগে। তারপর যা করার আমি করব।'

উদয়ের বাঁধন নিশীথ খুলে দিল। উদয় নিশীথকে বেঁধে দিল। ঘরের বাইরে এক ঝোপে উদয় লুকিয়ে রইল।

উদয় এদিক-ওদিক লক্ষ রেখেছিল। উদ্দেশ্য ওই বেঁটে লোকটাকে ধরা।

ঠিক দুপুরে ওই বেঁটে লোকটি এল। সে উদয়ের পাশ দিয়ে বলতে বলতে গেল, 'আমার খপ্পর থেকে পালাবে কোথায়? আজ হোক কাল হোক ধরা পড়তেই হবে।

লোকটা ঘরে ঢুকে গেলে উদয় ঝোপ থেকে বেরিয়ে জানলা দিয়ে ঘরের ভিতরে উঁকি মেরে দেখল। দেখে উদয় চোখ কচলাতে লাগল। ওই বেঁটে লোকটা পকেট থেকে কী এক ওষুধ বের করে নিশীথ ও সন্ধ্যাকুমারের গায়ে বুলিয়ে দিল। মুহূর্তে ওরা কর্পূরের মতো উবে গেল। তারপর সে গলা থেকে একটি মালা বের করল। মালাটি একটি হুকে ঝুলিয়ে রাখল। পরমুহূর্তেই সে একটি সাধারণ মানুষ হয়ে গেল। তার সেই লম্বা দাড়ি বা বেঁটে চেহারা আর রইল না।

এসব উদয়ের চোখের সামনে ঘটে গেল। তারপর সে নাক ডেকে ঘুমোতে লাগল। ঘরে ঢুকে উদয় হুক থেকে ওই মালাটি তুলে নিয়ে নিজের গলায় পরে নিল। তৎক্ষণাৎ সেও বেঁটে হয়ে গেল। তারও এক-শো হাত দাড়ি হয়ে গেল। নিজের এ-রকম চেহারা দেখে সে নিজেই হেসে ফেলল। বিরাট রহস্য বুঝে নেওয়ার মতো

আপন মনে মাথা নাড়ল। উদয় জামার পকেট হাতড়ে দেখল। একটা পকেটে সাদা ভস্ম ছিল। সেই ভস্ম দিয়েই বামনটা তাদের ঘোড়া এবং নিশীথ ও সন্ধ্যাকুমারকে হাওয়া করে ফেলেছে। অন্য পকেট হাতড়ে দেখল সেখানে একটি ছোট্ট কৌটাতে লাল অঞ্জন ছিল। এই অঞ্জন দিয়েই বামনটা তার হাত লোপাট করে দিয়েছিল। তৃতীয় পকেটে ছিল সবুজ রঙের অঞ্জন, একটি ঝাড়ন। আর একটুখানি কালো ভস্ম। এতগুলো জিনিস পেয়ে উদয় ভেবে পেল না কোনটা কোন কাজে ব্যবহৃত হয়।

উদয় মালা গলায় দিয়ে বেঁটে লোক হয়ে গেল। লাল ও সবুজ অঞ্জন দিয়ে কিছু করতে তার ভয় করল। তাই সে মনে মনে চিন্তা করতে লাগল।

সাত

সন্ধ্যা আর নিশীথ দিনের বেলায় দেখতে পায় না। তা ছাড়া বেঁটে লোকটা কীসের যেন ভস্ম ছড়িয়ে ওদের মায়াজালে ফেলে নিয়ে গেল। ওই মায়ার ফলে উদয় এক হাত লম্বা মানুষ হয়ে গেল। আর দাড়িওয়ালা মানুষটা সাধারণ মানুষের আকৃতি পেল। ওরা বুঝতে পারল না আর কী কী ধরনের বিপদে ওদের পড়তে হবে। তা ছাড়া সন্ধ্যা ও নিশীথের ভাই সম্পর্কে দুর্ভাবনাও ছিল।

উদয় খুব খুশি হল। কারণ সেও একহাত মানুষে রূপান্তরিত হতে পেরেছে। আনন্দে সে নিজের ভাইদের কথা ভুলে গেল। তখন সে নিজের কাছে রাখা জিনিস সম্পর্কে ভীষণ ভাবল। এই জিনিসগুলো যে কীভাবে ব্যবহার করতে হবে তা সে ভেবে পেল না। একথা-সেকথা ভাবতে ভাবতে তার নিজের ভাইদের কথা মনে পড়ে গেল।

অদূরেই দাড়িওয়ালা লোকটা শুয়েছিল। উদয়ের যখন নিজের ভাইদের কথা মনে পড়ল তখন সে তাদের উদ্ধারের কথাও ভাবতে লাগল। ঠিক সেইসময় দাড়িওয়ালা লোকটার ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙতেই দেখতে পেল তারই রূপ ধরে তার কাছেই উদয় দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে তখন সব কিছু বুঝতে পারল। বুঝতে পেরেও বেঁটে লোকটা চটে গেল না। মনে রাগ চেপে রেখেই এক-পা এক-পা আসতে আসতে বলল, 'দেখে মনে হচ্ছে আপনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী। আমার রহস্য ধরতে পারার মতো একজন যোগ্য লোকের সন্ধান পেয়ে আমি খুব খুশি হয়েছি। আপনার সাক্ষাৎ পেয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। তবে এতে আপনার কোনো লাভ হবে না। তার চেয়ে আপনারা এখানে কেন এলেন তা আমাকে জানালে আরও বেশি উপকৃত হবেন। কারণ আমি যেকোনো সমস্যা মুহূর্তে সমাধান করতে পারি। কোনোরকম দ্বিধা না করে আমাকে জানান। তারপর আরও অনেক রকমের ভালো ভালো কথা বলে বেঁটে লোকটা উদয়ের কাছ থেকে মালা প্রভৃতি নেবার চেষ্টা করল।
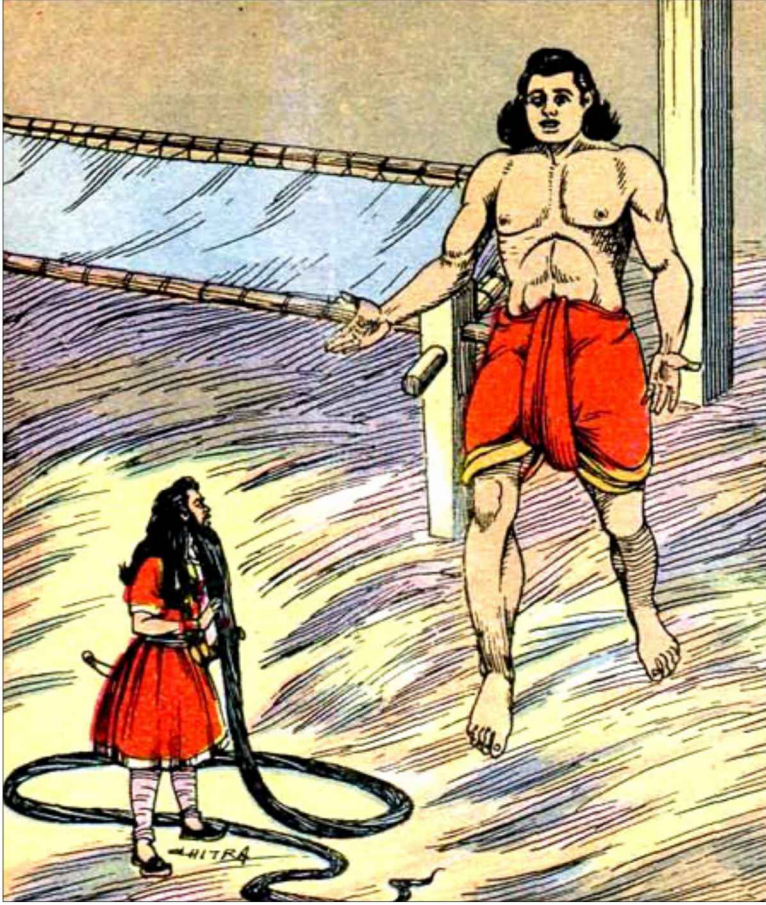
উদয় এত সহজে ভোলার পাত্র নয়। সে গম্ভীরভাবে বেঁটে লোকটাকে বলল, ‘আগে বল কোথায় আমার ভাইদের তুমি লুকিয়ে রেখেছ?’

‘কোনো কিছু আমি লুকোইনি। কোনো কিছু লুকোনার ইচ্ছা আমার নেই।’ বেঁটে লোকটা বলল।

‘অত আমাকে আপনি আপনি বলে সম্বোধন করতে হবে না। যা বলতে চাও তাড়াতাড়ি বল।’ উদয় বলল।

‘বলছিলাম, তোমার জামার বাঁ-পকেটে যে ভস্ম আছে তা একটু ছড়িয়ে দাও ওখানে।’ বেঁটে লোকটা বলল।

উদয় ওই জায়গায় ভস্ম ছড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে নিশীথ ও সন্ধ্যা হাজির হয়ে গেল।

উদয় ওই বেঁটে জাদুকরকে বলল, 'তোমার কথামতো আমি একটা কাজ করেছি। এবার বল আমার হারানো হাত আমি কীভাবে ফিরে পাব।'

'হাত পাওয়ার ওষুধ তো তোমার কাছেই আছে। তুমি ইচ্ছে করলেই পেতে পার। তোমার ডান পকেটে যে সবুজ অঞ্জন রয়েছে তা কাটা হাতের জায়গায় লাগিয়ে নিলে হাত গজিয়ে যাবে।' বেঁটে জাদুকর বলল।

উদয় তাই করল। মুহূর্তে তার হারানো হাত সে ফিরে পেল।

তারপর উদয়ের মনে কৌতূহল জাগল অন্য জিনিসগুলোর সম্পর্কে। তার কাছে যে সাদা ভস্ম আছে তা দিয়ে সে কী করবে? যে লাল অঞ্জন রয়েছে সেটা কোন কাজে লাগবে। সেসব জিনিসগুলো দাড়িওয়ালা লোকটাকে দেখাতে দেখাতে উদয় বলল, 'এসব কোন কোন কাজে লাগবে জানাও।'

দাড়িওয়ালা লোকটা হাসতে হাসতে বলল, 'ওইটুকু ব্যাপার বুঝতে পারলে না। তোমার ভাইদের যে গায়েব করে ফেলেছি তা এই সাদা ভস্ম দিয়েই আর তোমার হাত লোপাট করে ফেলেছি ওই লাল অঞ্জন দিয়ে। সব তো জানিয়ে দিলাম। আর তো তোমাকে জানানোর কিছু বাকি রইল না। না আর একটা জিনিস বকি আছে ওই ঝাড়ন। ওই ঝাড়ন পেতে তুমি যে খাবার খেতে চাইবে সেই খাবারই তুমি ওই ঝাড়নের উপর পাবে। ওই ঝাড়নের আর একটা গুণ আছে। তোমার যদি কোনো অসুখ করে তা ওই ঝাড়নের সাহায্যে সেরেও যাবে।'

'তাহলে আমরা যে সবসময় দেখতে পাই না এ ঝাড়নের সাহায্যে কি আমাদের চোখের জ্যোতি ফিরে পাব?' উদয় জিজ্ঞেস করল।

'সবসময় দেখতে পাও না মানে? তাহলে কিছু কিছু সময় দেখতে পাও?' বেঁটে জাদুকর অবাক হয়ে উদয়কে জিজ্ঞেস করল।

তখন উদয় নিজের নিশীথের ও সন্ধ্যার দৃষ্টিশক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত জানাল।

সব কথা শুনে দাড়িওয়ালা জাদুকর বলল, 'এ তো সাধারণ ব্যাপার। সহজেই সারানো যাবে। তোমরা তোমাদের চোখের জ্যোতি ফিরে পাবে। কীভাবে পাবে তা আমি বলে দেব। তবে তার আগে আমাকে আমার গলার মালা ফিরিয়ে দিতে হবে। ওই মালা হাতে না পেলে আমি আর কোনো কথা বলব না।'

কিন্তু উদয় জানে দাড়িওয়ালা বেঁটে লোকটা একবার বাগে পেলে আর তাদের ছাড়বে না। তখন সে তাকে সবিনয়ে বলল, 'দেখ তুমি বয়সে আমাদের দাদুর বয়সি। আমরা দৃষ্টিহীন বালক। আমরা যদি তোমার দয়ায় একটু দেখতে পাই তাতে তো তোমার কোনো ক্ষতি নেই। তোমার কাছে আর আমাদের কোনো চহিদা নেই। আর কিছু চাইব না। শুধু এইটুকু উপকার আমাদের কর। দৃষ্টি ফিরে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এখান থেকে দশ ক্রোশ পশ্চিমে যে গুহা আছে তাতে আমরা তোমার মালা রেখে যাব। তুমি সহজেই ওই গুহা থেকে মালা নিয়ে যেতে পারবে।'
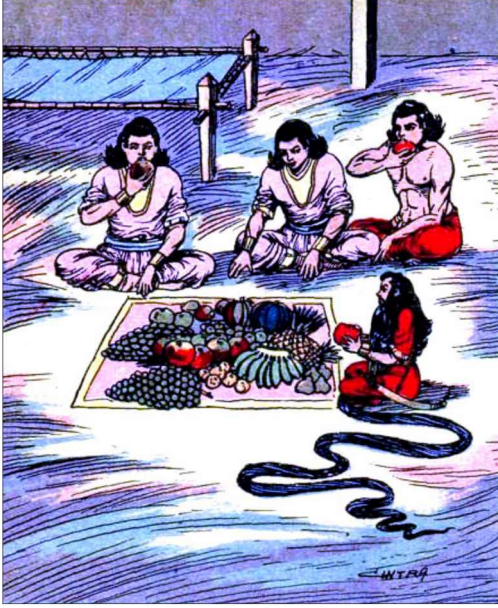
বেঁটে দাড়িওয়ালা লোকটার সব কিছু আছে ওই মালায়। তাই নিরুপায় হয়ে সে ওই প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল।

তারপর নিশীথ ও সন্ধ্যা বলল, 'দাদা উদয়, এর ঝামেলায় পড়ে আমরা এতক্ষণ কিছু খেতে পাইনি। এবার ওই ঝাড়নের ক্ষমতা কতখানি তা পরীক্ষা করে দেখা যাক।'

এতক্ষণ উদয়ের মনে খাওয়ার চিন্তা ছিল না। সে এখন ঝাড়ন পেতে কতকগুলো খাবারের কথা স্মরণ করল। মুহূর্তে ওই খাবার ঝাড়নের উপরে দেখা দিল। মনে মনে সে ফলও চেয়েছিল। ভাইরা সেখান থেকে যত ফল তোলে তত থাকে সেখানে। ঝাড়নের উপরে অসংখ্য ফল শেষ হতে চায়নি। তখন কয়েকটি ফল ওই বেঁটে লোকটাকেও দিল।

পেট ভরে খাওয়ার পর উদয় ঝাড়নটাকে ঝেড়ে ভাঁজ করে পকেটে রেখে ওকে বলল, 'এবার কী করতে হবে বল? কী করলে আমরা চটপট দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাব জানাও? দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের পথ ধরে চলে যাব। যাওয়ার আগে তোমার মালা ওই গুহায় রেখে যাব।'

'তোমার কাছে যে লাল অঞ্জন আছে তা এই ফেঁসোতে লাগিয়ে ছোট্ট নুড়ি বানাও। তারপর তাতে আগুন লাগিয়ে দাও। খুব ধোঁয়া বেরোবে। ওই ধোঁয়া যাতে তোমাদের চোখে ঢোকে সেভাবে তিন জনে কাছাকাছি বসে তোয়ালে দিয়ে মাথা ঢেকে এমনভাবে বস যাতে ধোঁয়া তোমাদের চোখে ভালোভাবে লাগে। কিছুক্ষণ ওই ধোঁয়ার দিকে চেয়ে বসে থাকলেই তোমরা দৃষ্টিশক্তি পাবে।' বেঁটে জাদুকর বলল।

উদয় বেঁটে লোকটার কথামতো নুড়ি বানাল বটে কিন্তু আগুন কোথায়? তাদের কাছে তো আগুন নেই।

উদয় যখন আগুন সম্পর্কে ভাবছিল তখন বেঁটে লোকটা কোত্থেকে দুটো চকমকি পাথর নিয়ে এল। ওই পাথরের ঘর্ষণে আগুন পাওয়া গেল। নুড়িতে

আগুন লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে ধোঁয়ায় ঘরটা ভরে গেল। তখন উদয়, সন্ধ্যা ও নিশীথ তিন জনে ঘন হয়ে বসে মাথা ঝাড়ন দিয়ে ঢেকে নিল। কিছুক্ষণ পরে ঝাড়ন সরিয়ে দিল। ওদের চোখ দিয়ে সমানে জল ঝরতে লাগল। অনেকক্ষণ জল ঝরার পর ওরা অবাক হয়ে লক্ষ করল চোখের দৃষ্টি পাওয়া তো দূরের কথা ওদের চোখের

গোলকটাই হারিয়ে গেল। উদয় রেগে গিয়ে চিৎকার করে বলল, 'কী করলে? বদমাইস।'
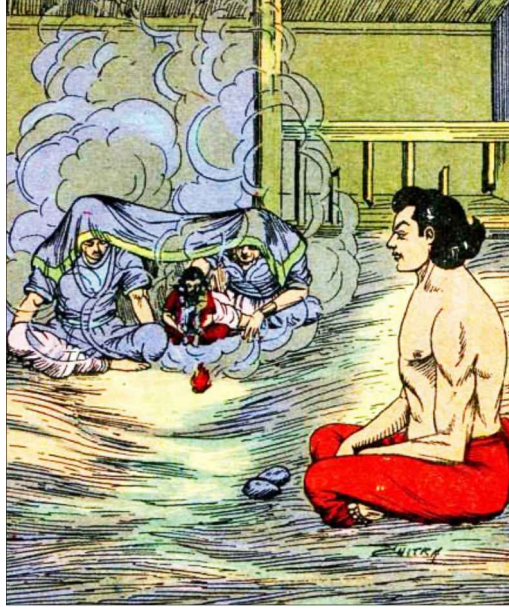
বেঁটে লোকটা শান্ত স্বরে বলল, 'অত ঘাবড়াচ্ছ কেন? তোমাদের খারাপ করার ইচ্ছে আমার নেই। তা যদি থাকত তাহলে আমি তোমাদের ওসব শেখাতাম কেন? শোনো, চিৎকার করে কোনো লাভ নেই। এবার তোমরা ওই সবুজ অঞ্জন চোখের পাতায় লাগাও।'

অগত্যা উদয় তাই করল। চোখের পাতায় প্রত্যেক ভাই সবুজ অঞ্জন লাগাল। মুহূর্তে ওরা চোখের গোলক ফিরে পেল। যে নিশীথ রাত্রে দেখতে পেত আর দিনে দেখতে পেত না সে এখন পরিষ্কার দেখতে পেল। যে সন্ধ্যাকুমার সন্ধ্যার সময় ছাড়া অন্য সময় দেখতে পেত না সেও পরিষ্কার দেখতে পেল। সবাই যখন দেখতে পেল তখন প্রত্যেকের মনে খুব আনন্দ হল। তারপর ওরা যে-যার পথে রওনা হল। যেখানে ওদের ঘোড়া বাঁধা ছিল সেখানে প্রথমে গেল। যেখানে ঘোড়া বাঁধা ছিল সেখানে কালো ভস্ম একটু ছড়াতেই ঘোড়াগুলো হাজির হয়ে গেল। তারপর ওরা গুহায় লুকানো কালো ঘোড়ার সন্ধানে গেল। উদয়, নিশীথ ও সন্ধ্যাকুমার তিনটি ঘোড়ায় চড়ে ফিরে এল ওই বেঁটে লোকটার কাছে। তখন বেঁটে লোকটা বলল, 'এবার তোমরা নিজেদের পথ ধর। তবে হ্যাঁ, যাওয়ার আগে আমার মালা গুহায় ছেড়ে যেতে ভুলে যেও না।' ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই নিশীথ বলল, 'সব জানলাম কিন্তু তোমার পরিচয় তো জানতে পারলাম

না। আমরা তো যাচ্ছিলাম, আমাদের মতো সাধারণ লোকের উপর জাদুর প্রয়োগ করার কী দরকার ছিল?'

এই কথার জবাবে দাড়িওয়ালা লোকটা বলল, 'সে-কথা আমি জানাতে পারি না। তার পেছনে একটা রহস্য আছে। সে রহস্য উদ্ঘাটন করলে আমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। তাই আমাকে তোমরা ক্ষমা কর।'

তিন ভাই ওর কথা শুনে ওর প্রতি দরদি হয়ে আর কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল না। তারপর ওরা যে-যার ঘোড়ায় চড়ে রওনা দিল। উদয় বেঁটে জাদুকরকে বলল, 'একটা অনুরোধ তোমায় রাখতে হবে। তোমার মালা তোমাকে দিয়ে দেব। কিন্তু এই অঞ্জন ভস্ম আর ঝাড়ন তোমাকে দেব না। মালা পেয়ে তুমি কিন্তু এগুলো চাইতে পারবে না।'

বেঁটে লোকটা রাজি হয়ে গেল। তারপর সাদা ঘোড়ায় উদয়, কালো ঘোড়ায় নিশীথ ও খয়েরি ঘোড়ায় চড়ে সন্ধ্যা রওনা হয়ে গেল।

যে গুহার কথা ওরা বেঁটে লোকটাকে বলেছিল সেই গুহার কাছে পৌঁছাল। কথামতো নিজের গলা থেকে মালা বের করে ওই গুহায় রেখে দিল। গলা থেকে মালা নামানোর সঙ্গে সঙ্গে উদয় নিজের রূপ ফিরে পেল। তারপর ওরা সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে তিন ভাই সেখান থেকে চলে গেল।

যেতে যেতে ওরা এক গভীর বনে ঢুকল। রাত হয়ে গেল। কোথায় থাকবে কিছুই ভেবে পেল না। কী যে করবে তাও ওদের মাথায় ঢুকল না। এমন সময় তিনটে সিংহ ওদের দিকে গর্জন করতে করতে এগিয়ে আসছিল। জলজ্যান্ত সিংহকে আসতে দেখে ওদের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। উদয় ভয় পেলেও ভেঙে না পড়ে ভাবতে লাগল কীভাবে কী করা যায়। হঠাৎ তার মাথায় এক বুদ্ধি এল। পকেট থেকে সাদা ভস্ম বের করে নিশীথ ও সন্ধ্যাকুমার এবং তাদের ঘোড়াগুলোর উপর ছড়িয়ে দিল। মুহূর্তে ওরা গায়েব হয়ে গেল। তারপর নিজের ও নিজের ঘোড়ার উপর ছড়িয়ে দিল।

পেট ভরে খাওয়ার আশায় সিংহগুলো গর্জন করতে করতে আসছিল। ওদের সেই আশায় ছাই পড়ে গেল। সিংহগুলো হঠাৎ এভাবে তিনটি মানুষ ও তিনটি ঘোড়াকে হাওয়া হয়ে যেতে দেখে অবাক হয়ে গেল।

সিংহগুলো চলে গেলেও উদয় ভাবল, মানুষের রূপ ধরে এই গভীর অরণ্যে রাত কাটানো নিরাপদ হবে না। তাই ওরা ওইভাবেই সারারাত সেখানে কাটাল।

সকালে উদয় অন্য ভস্ম নিজের ঘোড়ার ওপর ও নিজের উপর ছড়িয়ে আপন রূপ পেল। ঘোড়া নিজের রূপ ধারণ করে দাঁড়িয়ে রইল। এইভাবে নিশীথ ও সন্ধ্যাকুমার মানুষের রূপ পেল। ওদের ঘোড়াও নিজেদের আকৃতি নিয়ে ওদের সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

এখন ওরা প্রত্যেকে দিনে-রাতে ভালো দেখতে পায়। তাই তীব্র বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে ওরা সেখান থেকে চলে গেল।
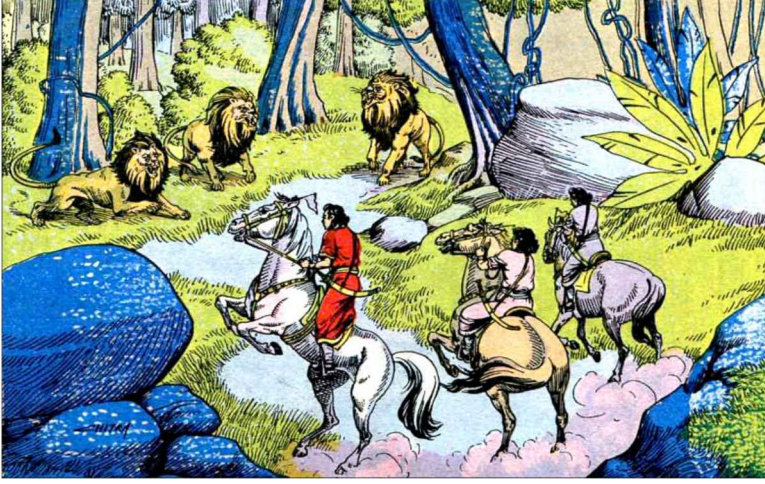
অনেক দূর যাওয়ার পর ওরা তিন জনে সামনে তাকিয়ে বিরাট নতুন এক ভবন দেখতে পেল।

'কে আগে ওই ভবনে ঢোকে দেখা যাক।' বলতে বলতে তিন ভাই ওই ভবনের দিকে ছুটে গেল। সবার আগে উদয়ের ঘোড়া ছিল। তার কিছু পেছনে সন্ধ্যাকুমার ও নিশীথের পাশাপাশি ঘোড়া ছিল। কিন্তু ভবনের ঢোকার পূর্বমুহূর্তে উদয় ও তার ঘোড়াকে আর দেখা গেল না। চোখের পলকে কোত্থেকে যে কী ঘটে গেল ওরা বুঝতেই পারল না।

আট

উদয়কে না দেখতে পেয়ে সন্ধ্যাকুমার ও নিশীথ নিজেদের ঘোড়া থামাল। কিছুক্ষণ পরে এক-পা এক-পা করে এগোতে লাগল। কিছুদূর যাওয়ার পর বিরাট বাড়ির সামনে একটি খাদ দেখতে পেল। ওরা ভাবল উদয় হয়তো ওই খাদেই পড়ে গেছে। খাদের কাছে গিয়ে তার গভীরতা দেখে বুঝল উদয় ঘোড়া সহ এই খাদেই পড়ে গেছে। ওরা অনেকক্ষণ তাকিয়ে খাদের গভীরতা অনুমান করার চেষ্টা করল।

অনেকক্ষণ সন্ধ্যাকুমার ও নিশীথ ভাবল কী করবে, কিন্তু কূলকিনারা পেল না। শেষে ঠিক করল ওই বিরাট বাড়িতে ঢুকে খাদের গভীরতা ইত্যাদি সম্পর্কে জেনে নেবে।

ওই বাড়িতে ঢোকার আগে খাদের চারদিকে ঘোড়ায় চড়ে আস্তে আস্তে ঘুরল। ঘুরে-ফিরে ওরা একই জায়গায় এল এবং নতুন এক বিষয় আবিষ্কার করল। ওই খাদ

শুধু বাড়ির সামনে নেই। গোটা বাড়িটাকেই ঘিরে রেখেছে। এক বার দু-বার নয় অনেক বার ঘুরেও ভেবে পেল না কীভাবে ওই ভবনে যাওয়া যায়। কেউ যাতে ওই বাড়িতে ঢুকতে না পারে তারজন্যই যে ওই খাদ তৈরি করা হয়েছে তা বুঝতে ওদের আর দেরি হল না। ওরা বুঝল ওই খাদ তৈরি করা হয়েছে শুধু বাড়িকে রক্ষা করার জন্য নয়, আরও গভীর কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে। তবু যেকোনোভাবে ওই বাড়িতে ঢুকতেই হবে— প্রতিজ্ঞা ওদের মনে দানা বাঁধছিল।

কিছুক্ষণ ভেবে সন্ধ্যাকুমার নিশীথকে বলল, 'দাদা যেকোনোভাবে এই খাদ আমাদের পেরোতেই হবে। এক কাজ করি অনেক দূর থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে এক লাফে খাদটা পেরিয়ে যাই। পেরোতে পারলে ভাগ্যবান, আর না পেরোতে পারলে আমাদের ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। খাদে পড়ে গেলে শাপে বর হতে পারে। আমরা হয়তো উদয়কে খুঁজে পেতে পারি।'

নিশীথ সন্ধ্যাকুমারের কথায় উৎসাহ পেয়ে রাজি হয়ে গেল। ওরা ঘোড়ায় চড়ে খাদ থেকে অনেক দূরে চলে গেল। সেখান থেকে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এগিয়ে এসে এক লাফে খাদটা পেরিয়ে গেল।

সৌভাগ্যবশত নিশীথ ও সন্ধ্যাকুমার খাদ পেরিয়ে মনের আনন্দে বলতে লাগল, 'এবার আমাদের কপাল খুলে গেছে মনে হচ্ছে। এরপর হয়তো আমাদের আর কোনো বিপদে পড়ার আশঙ্কা নেই। এবার একে একে আমরা সব পেয়ে যাব।' বলতে বলতে খুশি মেজাজে দুই ভাই ওই বিরাট বাড়িতে ঢুকল। ঢুকল বটে কিন্তু সেই বাড়িতে কোনো মানুষের সন্ধান পেল না। অদ্ভুত এক বাড়ি অনেকগুলো দরজা আছে কিন্তু একটি দরজারও কপাট নেই। এক-একটি দরজা পেরিয়ে তারা এগোতে লাগল। নতুন নতুন ঘরে ঢোকে কিন্তু প্রত্যেকটি ঘরই প্রায় একইরকম দেখতে। প্রত্যেকটাতেই পাথরের প্রতিমা। মানুষের আকৃতিতে ওই প্রতিমাগুলো যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ওরা অবাক হয়ে দেখছিল।

একটার পর একটা ঘর পেরিয়ে অবশেষে একটি দ্বারে এসে পৌঁছাল। ওরা যেটাকে দ্বার ভেবেছিল আসলে সেটা দ্বার নয়। একটা রাক্ষস ওই রূপ ধরে আকাশ ছাড়িয়ে যেন দাঁড়িয়ে ঘুমোচ্ছিল। ওর দুই পায়ের ফাঁকে যে জায়গাটা ছিল সেটাকেই দ্বার মনে হচ্ছিল। ওই রাক্ষসের দু-দিকে দুটো সিংহ মূর্তি ছিল। ওই সিংহ এবং রাক্ষসের লম্বা লম্বা পা দেখে ভয় পেয়ে সন্ধ্যাকুমার ও নিশীথ আর্তনাদ করে উঠল।

ওদের চিৎকার ও আর্তনাদ শুনে রাক্ষসের ঘুম ভেঙে গেল। সে সন্ধ্যাকুমার ও নিশীথকে দেখে খুব খুশি হয়ে বিকট কর্কশ গলায় বলল, 'বা বা বেশ ভালোই হয়েছে। আরও দুটো মূর্তি বাড়ল। চমৎকার মূর্তি হবে।' এই কথা শুনে সন্ধ্যাকুমার ও নিশীথ বুঝল ওরা যে মূর্তিগুলো দেখে আসছিল বিভিন্ন ঘরে ওগুলো এক-একটি জ্যান্ত মানুষের। কিছুক্ষণ পরে ওদেরও মূর্তি হতে হবে।

খাদ পেরোনোর আগে সন্ধ্যাকুমার নিশীথ ভেবেছিল খাদ পেরোলেই ওরা সব পাবে। কিন্তু এখন ওদের মনে হচ্ছে পাওয়া তো দূরের কথা নিজেদের জীবন হারাতে হবে। ভাবছে, কী যে করতে হবে কিছুই ভেবে পাচ্ছে না। পদে পদে এইভাবে বাধা পেলে বুদ্ধির ধার যেন কমে যায়। আবার বিপদ থেকে মুক্তি পেতে হলে বুদ্ধিবল ছাড়া অন্য কোনো শক্তির উপর নির্ভর করেও চলে না। যেকোনো প্রাণীর চেয়ে বুদ্ধি বেশি বলেই মানুষ সবার উপরে। ওরা মনে মনে বলল, 'মরতে তো একদিন হবেই, তাই বলে মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে জীবন কাটানোর কোনো মানে হয় না? বুদ্ধিতে রাক্ষসকে কি হারানো যায় না।'

মনে মনে নানা কথা ভেবে নিশীথ রাক্ষসের সামনে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে বলল, 'কী হে, আমাদের দেখে কী ভাবছ? মনে রেখ আমাদের কেউ এখানে আনেনি। আমরা নিজেরাই এখানে এসেছি। দাড়িওয়ালা লোকটা আমাদের যখন পাঠিয়েছে তখন অত ভয় কীসের! তোমার কাছে একটা খবর নিয়ে এসেছি। এত দূর খবরটা যখন এনেছি...'

কথাটা শেষ হওয়ার আগেই রাক্ষস হাঁকপাক করে বলল, 'সে কি কথা! এখনও সে বেঁচে আছে? ফিরে আসতে অনেক দেরি হয়ে গেল ওর। তাই ভাবলাম হয়তো কোনো বিপদে পড়ে মারা গেছে। যাই হোক কী খবর পাঠিয়েছে তাড়াতাড়ি বল।'

নিশীথ তখন রাক্ষসকে বলল, 'সে প্রাণে মারা যায়নি। তবে তার জীবনের রহস্য নাকি কেউ জেনে গেছে। তার কাছে যে ভস্ম অঞ্জন ঝাড়ন প্রভৃতি ছিল কে নাকি সব চুরি করে নিয়েছে। ওগুলো না থাকাতে সে নাকি এক পাও এগোতে পারছে না। এই খবরটা তোমাকে জানিয়ে আরও কিছু ভস্ম অঞ্জন পাঠাতে বলেছে।

যতক্ষণ না এগুলো ওর কাছে পৌঁছাচ্ছে ততক্ষণ তার পক্ষে নাকি কোনো কাজ করা সম্ভব নয়।'

রাক্ষস নিশীথকে বলল, 'তাহলে তো বেচারা খুব কষ্টে পড়েছে। সেইজন্যই হয়তো সে ফিরে আসতে পারেনি। ভগ্যিস তার গলার মালা চুরি হয়ে যায়নি। ওটা চুরি হয়ে গেলে তাকে কোনো ক্রমেই বাঁচানো যেত না। ঠিক আছে আমি একটু ঘুরে আসছি। তোমরা কিন্তু এই পথ দিয়ে একটি পোকাও যাতে ঢুকতে না পারে তারজন্য সতর্ক থাকবে। যতক্ষণ না আমি ফিরছি ততক্ষণ তোমাদের এখানেই থাকতে হবে।' এই কথা বলে রাক্ষস চলে গেল।

রাক্ষসের চলে যাওয়ার সঙ্গেসঙ্গে মহানন্দে নিশীথ ও সন্ধ্যাকুমার লাফাতে লাগল। অত বড়ো ভয়ংকর রাক্ষসকে যে ঠকাতে পারবে তা ভাবতেই পারেনি।

নিশীথ বলল, 'আর এক মুহূর্তও আমাদের অলসভাবে কাটানো উচিত নয়। রাক্ষসটা ফিরে আসার আগেই এই বিরাট বাড়ির রহস্য বুঝে নিতে হবে।'

দুই ভাই বাড়ির ভেতরে ঢুকে একটার পর একটা দরজা পেরোতে লাগল। অনেকগুলো দরজা পেরিয়ে যাবার পর ওরা একটি পুকুর দেখতে পেল। ওই পুকুরে কয়েকটি হাঁস সাঁতার কাটছিল।

এতটা পথ হাঁটার ফলে দুই ভাইয়েরই খিদে পেয়েছিল, তৃষ্ণাও পেয়েছিল। পুকুরের স্বচ্ছ জল দেখে তাদের তৃষ্ণা যেন আরও বেড়ে গেল। সন্ধ্যাকুমার পুকুরে নেবে এক আঁজলা জল মুখে দিতে না দিতেই পাথরের মূর্তি হয়ে গেল।

চোখের সামনে ভাই সন্ধ্যাকুমারকে এভাবে পাথরের মূর্তি হয়ে যেতে দেখে নিশীথ নিজেও যেন পাথর বনে গেল। এই অবস্থায় কী যে করবে কিছুই ভেবে পেল না। মনে মনে বলল, 'ভাগ্যিস আমিও জল খেতে নেবে যাইনি! দু-জন এক

সঙ্গে পাথর হয়ে গেলে আর বেঁচে ওঠার কোনো পথ খোলা থাকত না। উদয়কে উদ্ধার করার আগেই সন্ধ্যাকুমারের যে এই অবস্থা হয়ে যাবে তা ভাবতেই পারেনি। এখন আমাকে খুব সাবধানে চলতে হবে।'

চারদিক তাকাতে তাকাতে নিশীথ আরও এগিয়ে গেল। নানা ধরনের ফুল আর ফলে ভরা উদ্যান দেখতে পেল। সব চেয়ে অবাক হল একটি আম গাছ দেখে। গোটা গাছে আম ভরে ছিল। এত আম ছিল যে আমের পাতা দেখা যাচ্ছিল না। সেই আম গাছটি দেখে নিশীথের বড়ো লোভ হল।

জল খেয়ে সন্ধ্যাকুমারের যে কী অবস্থা হয়েছে তা নিশীথ ভোলেনি। কিন্তু খিদের জ্বালা বড়ো জ্বালা। কিছুক্ষণের জন্য যেন তার মতিভ্রম ঘটেছিল। ফলে আম মুখে দিতে না দিতেই নিশীথ বাঁদর হয়ে গেল। বাঁদর হয়েই সে ভাবল, 'হায়, কেন আমি আম খেলাম! এই বাড়িতে আরও যে কী হবে কে জানে।'

তারপর আর একটিও আম সে খেল না। ওই বাঁদরের রূপ ধরেই সন্ধ্যাকুমারের পাথরের মূর্তির কাছে এসে তার চারদিকে ঘুরতে লাগল। অনেকক্ষণ ঘোরর পর লক্ষ করল পুকুরের জলে বুদ্‌বুদ উঠছে। কিছুক্ষণ পরেই পুকুরের একটি হাঁস নিশীথের দিকে আসছিল। নিশীথ ওই হাঁসের দিকে লক্ষ রেখেছিল।

হাঁসটি পুকুরের ধারে এসে এক লাফে তীরে উঠল। ওঠার সাথে সাথেই হাঁসটি মানুষ হয়ে গেল। আর ওই মানুষটির কাঁধে নিশীথ এক লাফে উঠল। কারণ ওই লোকটি ছিল উদয়।

উদয় তীরে এসে সন্ধ্যাকুমারের পাথরের মূর্তি দেখে অবাক হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে বাঁদর রূপধারী নিশীথ উদয়ের পা ধরে টানতে লাগল। প্রথমে ওটাকে সাধারণ বাঁদর ভেবে সে তার হাত থেকে রেহাই পাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু বার বার বাঁদরটি তার গায়ে পড়ায় তার সন্দেহ হল। সে ভাবল, 'হয়তো নিশীথ এই রাক্ষসের বাড়িতে বাঁদর হয়ে গেছে।

সব বুঝেও উদয় বুঝতে পারল না কী করবে। সন্ধ্যাকুমার কেন যে এভাবে পাথর হয়ে গেল, তাকে যে আবার কীভাবে তার আসল রূপে পরিবর্তিত করা যায়, তা উদয় ভেবে পেল না।

বাঁদর রূপধারী সত্যিই তার ভাই নিশীথ কি না কে জানে! আর তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে কী করা উচিত!

অনেকক্ষণ ভেবে হঠাৎ কী যেন ফিরে পাওয়ার মতো পকেটে হাত ঢুকিয়ে অঞ্জন ও ভস্ম বের করল। সন্ধ্যাকুমারের পাথরের মূর্তির উপর কালো ভস্ম ছড়াল। কিছুই হল না। সবুজ অঞ্জন গায়ে মাখিয়ে দেখল। তাতেও কোনো পরিবর্তন দেখা দিল না। লাল অঞ্জন মাখিয়ে দেখল। পাথরের মূর্তি একই ভাবে রইল। কিছুতেই কিছু যখন হল না তখন বিরক্ত হয়ে ভস্ম ও অঞ্জন ওই বাঁদরের গায়ে ফেলতে লাগল।

শেষে উদয় হাল ছেড়ে দিল। বুঝল ভস্ম ও অঞ্জনে কিছু হওয়ার নয়।

পুকুরের ধারে বসে উদয় ভাবতে লাগল। তখন একটি হাঁস তার কাছে এসে ঘুর ঘুর করতে লাগল। পায়ের কাছে এভাবে একটি হাঁসকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে উদয় হঠাৎ ওই হাঁসটিকে ধরে জল থেকে তুলল।

তুলতেই হাঁসটি সুন্দরী মেয়ের রূপ পেল। উদয় অবাক হয়ে গেল। অপরূপা সুন্দরী মেয়ে তার সামনে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। উদয় বলল, 'কে তুমি? এভাবে হাঁস হয়ে পুকুরে পড়ে আছ কেন?'

আরও প্রশ্ন হয়তো করত, কিন্তু ইতিমধ্যে শোনা গেল রাক্ষসের চিৎকার। 'আপনি কোথায়?'

ওই সুন্দরী মেয়ে বুঝল যে রাক্ষস এসেছে। সে উদয়কে বলল, 'সব কথা পরে বলব। আগে পুকুরে নেমে এসো।' বলে মেয়েটি পাথরের মূর্তি ও বাঁদরকে জলে ঠেলে দিল। সঙ্গেসঙ্গে প্রত্যেকেই হাঁস হয়ে গেল।

নয়

রাক্ষস গর্জে উঠল, 'কোথায় তোমরা?' ভয়ংকর সেই গর্জন। ভীষণ রেগে গিয়েছিল রাক্ষস। রাক্ষস বুঝতে পারল সন্ধ্যাকুমার ও নিশীথ তাকে মিথ্যা কথা বলে ঠকিয়েছে। সে আরও ভালোভাবে বুঝল দাড়িওয়ালা বেঁটেটার কাছ থেকে।

দাড়িওয়ালা, রাক্ষসকে তার কাছে আসতে দেখে অবাক হয়ে গেল। বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বেঁটেটা বলল, 'সর্বনাশ করেছ, তুমি ওই মিথ্যাবাদী বদমাইশদের কথা বিশ্বাস করেছ? তুমি জানো, আমার কাছে যত রকমের আশ্চর্য ভস্ম ছিল তা নিয়ে ওরা পালিয়েছে। আর তুমি কি না ওদের হাতেই বাড়িটা দেখাশোনার ভার দিয়ে চলে এলে? ওরা কত বড়ো পাজি দেখেছ? না হলে শুধু যে আমাকেই ঠকিয়েছে তা নয় তোমাকেও ঠকিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। এতক্ষণে ওরা হয়তো অনেক কিছু করে ফেলে ঘাপটি মেরে বসে আছে। এখনও তুমি যদি তাড়াতাড়ি যাও ওদের ধরতে পারবে। আর তা যদি না হয় ওরা গোটা বাড়ি ঘুরে ঘুরে সব রহস্য জেনে যাবে। ওরা যা ধূর্ত তাতে এক এক করে বাড়ির সমস্ত রহস্য জানতে দেরি লাগবে না। তাই বলছি, আর কাল বিলম্ব না করে এক্ষুনি চলে যাও।' দাড়িওয়ালা বেঁটে রাক্ষসকে বলল। ওর পরামর্শমতো রাক্ষস দ্রুত ফিরে এসে দেখে সন্ধ্যাকুমার ও নিশীথকে সে যেখানে দাঁড়াতে বলেছিল সেখানে তারা নেই। দূর থেকেই ওদের দেখতে না পেয়ে রাক্ষস গর্জে উঠল, 'কোথায় তোমরা?' হাঁক পাড়তে পাড়তে গোটা ভবন ঘুরতে লাগল রাক্ষস। প্রথমেই সে গেল ওই পুকুরের কাছে। কিন্তু ওদের দেখতে পেল না।

নিজের বাড়িতে বাইরের লোক লুকিয়েছে অথচ সে বার করতে পারছে না এটা তার কাছে বিরক্তিকর ও রাগ বৃদ্ধির কারণ হয়ে গিয়েছিল। ভবনের একটি পিঁপড়েও যাতে তার চোখ এড়িয়ে চলতে না পারে তারজন্য সে গোটা বাড়ি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। সারাদিন খুঁজেও কিছুই না পেয়ে রাগে গজ গজ করতে লাগল সন্ধ্যার সময়।

রাক্ষস যখন তন্নতন্ন করে খুঁজছিল তখন উদয় নিজের দুই ভাইকে নিয়ে পুকুরেই হাঁস হয়ে ভাসছিল। রাক্ষস যখন খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে ফিরে গেল তখন উদয় পুকুর থেকে উঠে এসে নিজের রূপ ধারণ করল। তার সঙ্গে সঙ্গে ওই কন্যাও উঠে এসে উদয়কে বলল, 'আপনারা যে কে তা জানি না, তবে আপনাদের কপাল যে মন্দ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই গোটা ভবনে এবং এর চার ক্রোশের মধ্যে একটি ছোট্ট পোকা নড়লেও টের পেয়ে যাওয়ার মতো একজন দাড়িওয়ালা লোক আছে। তার চোখ এড়িয়ে এই তল্লাটে কোনো কাজ হতে পারে না। আমি ভেবে পাচ্ছি না ওই বেঁটে দাড়িওয়ালার চোখ এড়িয়ে আপনারা কীভাবে এখানে এলেন। কারণ ওই দাড়িওয়ালা একবার টের পেলে আপনাদের নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যেত। এই ভবনটি এক দুষ্ট রাক্ষসের। ওই রাক্ষসটি এখানে যে কখন আসে আর কখন যে যায় তা কেউ জানে না। কেউ বলতেও পারে না। ওর আসার আগে আমি জানিয়ে দিচ্ছি আপনার ভাইরা কীভাবে নিজের রূপ ফিরে পেতে পারে। যেকোনোভাবে এখান থেকে পালিয়ে বাঁচুন।'

সব কথা শুনে উদয় বলল, 'আমরা এই ভবনে পথ ভুলে আসিনি। জীবন পণ করে এখানে এসেছি। উদ্দেশ্য এই ভবনের সমস্ত রহস্য জানা। এই রহস্য উদ্ঘাটন করতে যদি আমাদের প্রাণ দিতে হয় আমরা তাতেও প্রস্তুত। তাই আমাদের জন্য, আমাদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য তোমাকে উদ্‌বিগ্ন হতে হবে না। এই রাক্ষস সম্পর্কে তুমি যা জানো সব যদি আমাদের বল, তাহলে আমাদের বিশেষ উপকার হয়। ভালো কথা, আমি কিন্তু তেমার পরিচয় এখনও জানতে পারলাম না।'

এই কথার জবাবে ওই মেয়ে বলল, 'আমার কোনো আপত্তি নেই, তবে পরিচয়

জেনেই-বা কী হবে! তবু জিজ্ঞাসা যখন করছেন তখন বলছি।' বলে ওই মেয়ে পুকুরে নেবে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে একই আদলের আরও দু-টি কন্যাকে নিয়ে সে পুকুর থেকে উঠে এল। ওরা এতক্ষণ হাঁসের রূপ ধরে পুকুরে সাঁতার কাটছিল।

ওই তিন জনকে একইরকম দেখতে দেখে, উদয় বলল, 'দেখে মনে হচ্ছে তোমরা যমজ। আমি কি ঠিক বলছি?'

'নিশ্চয়।' তিন কন্যা বলে উঠল।

তাদের জবাব শুনে অত্যন্ত উৎসাহ বোধ করে উদয় বলল, 'পেয়ে গেছি। এতদিন আমরা যাদের খুঁজছি তাদের পেয়ে গেছি। তোমরা কি জানো আমরা তিন ভাই তোমাদের খুঁজছি? তোমরা দানশীল মহারাজের কন্যা, তাই না?'

এই প্রশ্ন শুনে তিন কন্যা হতবাক হয়ে গেল! 'হ্যাঁ, আমরা মহারাজ দানশীলের কন্যা। কিন্তু আপনি কী করে জানলেন?' মেয়েরা প্রশ্ন করল।

'জানলাম মানে? আমরা তোমাদের সব খবর জানি। মহারাজ দানশীলের আশীর্বাদ নিয়ে আমরা তোমাদের খুঁজতে বেরিয়েছি। তোমাদের নাম কী বলত? জানি, তবু মিলিয়ে নি।' উদয় জিজ্ঞেস করল।

'সুহাসিণী, মিলে গেছে? আরও দুটো নাম বলতে হবে?' একটি মেয়ে বলল।

'বাকি দুটো নাম আমিও বলতে পারি। এত সহজে এত তাড়াতাড়ি যে তোমাদের খোঁজ পাওয়া যাবে তা ভাবতে পারিনি। এত ভালো খবর আমি জানলাম, কিন্তু কত বড়ো দুঃখের কথা যে আমি এই খবর আমার ভাইদের জানাতে পারছি না। ওরা আসল রূপে থাকলে যে কত খুশি হত কী বলব।' উদয় বলল।

'উদয়ের অবস্থা লক্ষ করে সুহাসিণী বলল, 'অত ভাববার কী আছে। আমি এক্ষুনি আসছি।' বলে সুহাসিণী পুকুরে নেবে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে বানররূপী নিশীথ ও শিলামূর্তিতে রূপান্তরিত সন্ধ্যাকুমারকে নিয়ে তীরে এল। তারপর ওরা গেল একটি আম গাছের কাছে। আশেপাশে কয়েকটি ব্যাঙের ছাতা গজিয়ে ছিল। কয়েকটি ব্যাঙের ছাতা তুলে নিতে বলল। উদয় তাই করল। তারপর আবার কিছুদূর গেল। সেখানে একটি রাক্ষসের মূর্তি ছিল। ওই রাক্ষসের মুখ থেকে অনবরত জল প্রবাহিত

হচ্ছিল। সেখান থেকে কিছু জল নিতে বলল। উদয় তাই নিল একটি পাতায় করে। জল আর ব্যাঙের ছাতা নিয়ে ওরা সেই পুকুরের কাছে এল।

সুহাসিণী ওই ব্যাঙের ছাতা বাঁদরকে খেতে দিতে বলল।

খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঁদর নিশীথের রূপ ধারণ করল।

তারপর সুহাসিণী পাতায় করে আনা জলকে ওই পাথরের মূর্তির উপর ঢালতে বলল। উদয় ঢেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যাকুমার নিজের রূপ ধারণ করল।

উদয়, সন্ধ্যাকুমার ও নিশীথ পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল। নিশীথ ও সন্ধ্যাকুমার একই আদলের তিন মেয়েকে দেখে অবাক হয়ে গেল। উদয় বলল, 'এই যে সন্ধ্যা নিশীথ, আমরা যে তিন কন্যাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম, এই সেই তিন রাজকুমারী। এখন এদের নিয়ে কীভাবে নিরাপদে বেরিয়ে যাওয়া যায় সেই পথ খুঁজতে হবে।'

সুহাসিণী হাসতে হাসতে বলল, 'যত সহজে বলছেন, সেই পথ খুঁজে বের করা তত কঠিন। প্রাণ থাকতে সে পথ খুঁজে পাবেন কিনা সন্দেহ...।' তার কথা শেষ হওয়ার আগেই কোত্থেকে হঠাৎ হাওয়া বইতে লাগল।

হাওয়া শুরু হতেই সুহাসিণী বলল, 'ওই যে ও আসছে। ওর আসার আগে এই ধরনের হাওয়া শুরু হয়। ওর আসার আগে আমরা পুকুরে নেবে যাই। আপনারা পুকুরে নেবে গেলে কিন্তু ও সব টের পেয়ে যাবে। কোথায় কী আছে সব ওর নখদর্পণে। আমাদের সঙ্গে আপনারাও হাঁস হয়ে গেলে ও ঠিক টের পেয়ে যাবে। আপনারা যে কীভাবে বাঁচবেন তা আপনারাই ভেবে দেখুন। আমরা যাই।' বলতে বলতে তিন কন্যা পুকুরের দিকে চলে গেল।

তৎক্ষণাৎ উদয় তার কাছের সাদা ভস্ম বের করে তার ভাইদের এবং নিজের উপর ঢেলে দিল। মুহূর্তে ওরা গায়েব হয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাতাস থেমে গেল। পরক্ষণেই বিরাট এক বাজ পাখি ওই পুকুরের ধারে এসে দাঁড়াল। পুকুরের ধারে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে রূপ বদলে গেল। এক ভয়ংকর রাক্ষসের রূপ পেল সে।

ওই রাক্ষস পুকুরের ধারে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে পুকুরের সমস্ত হাঁস পুকুরের ধারে এসে পাখনা নাড়তে লাগল। রাক্ষস ওদের দিকে একবার তাকিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে কী যেন দেখে নিয়ে আবার বাজ পাখি হয়ে উড়ে গেল।

এসব হতে হতে সন্ধে হয়ে গেল। উদয় ভস্মের সাহায্যে নিজের এবং ভাইদের আপন রূপ ধারণ করাতে পারল।

তিন দিন কেটে গেল। কী খেলে কী হয়ে যায় এই ভয়ে ওরা নিজেদের কাছে যে ঝাড়ন ছিল সেটার সাহায্যে পছন্দমতো খাবার চেয়ে খেয়ে নিল। কিছুক্ষণ ওরা ওই তিন কন্যার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু ওরা না আসায় ভাবল, নিশ্চয় কোনো অসুবিধা আছে। তখন ওরা নিজেরাও ভস্মের সাহায্যে অদৃশ্য রূপ ধারণ করে রয়ে গেল।

সকাল হল। জল থেকে বেরিয়ে তিন কন্যা আপন রূপ ধারণ করল। তা লক্ষ করে উদয়, নিশীথ ও সন্ধ্যাকুমার ভস্মের সাহায্যে নিজেদের রূপ ধারণ করল। উদয় সুহাসিণীকে জিজ্ঞেস করল, 'এই রাক্ষস আবার কোথায় গেল? এ আবার কখন আসবে?'

'কোথায় যাবে তা কেউ বলতে পারে না। বলা চলে শিকার করতে বেরিয়েছে। যতক্ষণ না ক্লান্ত হচ্ছে ততক্ষণ শিকার খুঁজবে। যা তা শিকার তো নয়, যমজদের শিকার।' বলল সুহাসিণী।

'যমজদের শিকার মানে? এ তো নতুন শুনছি।' উদয় আবার প্রশ্ন করল।

'সে এক রহস্যজনক ব্যাপার। এই রাক্ষস এক দেবীর ভক্ত। সেই দেবীর কাছে এ শপথ করেছে, পঞ্চাশটি ছেলে-মেয়ে বলি দেবে বলে। এই যে এই বিরাট বাড়ি সবই নাকি ওই দেবীর কল্যাণে পেয়েছে। পুরো পঞ্চাশটি ছেলে-মেয়ে যেদিন পেয়ে যাবে সেদিনই ঘটা করে পঞ্চশ জনকে বলি দেবে। আমাদের তিন বোনকে নিয়ে সাতচল্লিশ জন হয়েছে। পঞ্চাশ জনকে বলি দিলেই রাক্ষসটা অমর হওয়ার আশীর্বাদ পাবে। তারপর আর কেউ তাকে মারতে পারবে না। যতদিন না আর তিনটে পাচ্ছে ততদিন তার খোঁজার শেষ নেই।' সুহাসিণী বলল।

চোখ ছানাবড়া করে তিন ভাই শুনল সুহাসিণীর কথা। উদয় বলল, 'তাহলে তো আমরা খুব ভাগ্যবান। ধরা পড়িনি। আমাদের তিন জনকে পেয়ে গেল আর রাক্ষসটাকে বেরোতে হত না। আজকেই আমাদের সবাইকে বলি দিয়ে রাক্ষসটা বর পেয়ে যেত।'

‘তার মানে? আপনারাও কি যমজ ভাই?’ আশ্চর্য হয়ে সাগ্রহে তিন কন্যা জিজ্ঞেস করল।

‘হ্যাঁ, আমরা তিন যমজ ভাই। আমরা তিন ভাই বেরিয়েছি তোমাদের তিন জনকে উদ্ধার করতে।’ উদয় বলল।

‘তাহলে তো আপনাদের সাবধানে থাকা উচিত!’ সুহাসিণী বলল।

‘সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এখন তো রাক্ষসদের ব্যাপার সব জানা গেল। এখন নিশ্চয়ই খুব সাবধান হতে হবে। দেখে-শুনে মনে হচ্ছে এখানে সব কিছুতেই মায়ার জাল পাতা আছে। এখান থেকে বেরোনোর পথে কী ধরনের বাধা পড়বে তা যদি সঠিক জানা যেত তাহলে তার একটা ব্যবস্থার কথা ভাবা যেত। কিন্তু কিছুই জানা যাচ্ছে না।’ বলল উদয়।
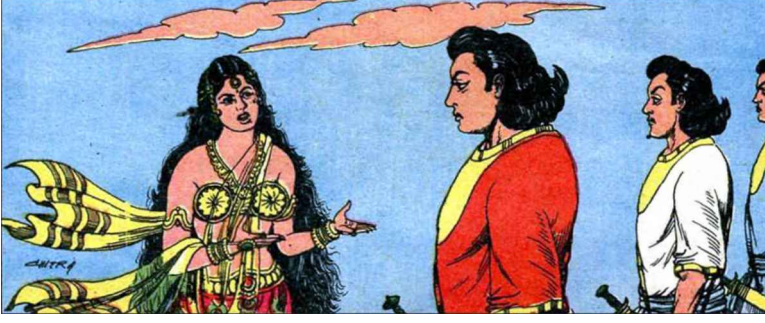
‘ওই রাক্ষসের চোখে না পড়ে যদি আপনারা এই ভবনের ভিতরে ঢুকতে পারেন, প্রত্যেকটি দরজা জানালা ভালো ভাবে পরীক্ষা করতে পারেন তাহলে নিশ্চয়ই পথ পেয়ে যাবেন। কিন্তু মুশকিল হল ভবনে পা দিতে না দিতেই রাক্ষস জেনে যায়। তখন আর রক্ষে থাকবে না।’ সুহাসিণী বলল।

এ-কথায় উদয় বলল, ‘ সে আর এমনকী কঠিন কাজ আমাদের পক্ষে। আমাদের কাছে যে ভস্ম আছে তা দিয়ে আমরা রাক্ষসের কাছেই অদৃশ্য হয়ে থাকতে পারি। রাক্ষস আমাদের কিছুই করতে পারবে না। সে ভয় এখন আমাদের নেই।’

অবাক হয়ে সুহাসিণী বলল, ‘ভাগ্যিস এক্ষুনি ভস্মের কথা বললেন। তা না হলে তো বিরাট বিপদ ঘটে যেত। একটা কথা জেনে রাখুন ওই ভবনটি হল মারাত্মক একটি ভবন। ওই ভবনে কোনো ভস্ম বা মন্ত্রের প্রভাব পড়ে না। তাই খুব সাবধান।’

এতক্ষণ উদয়, নিশীথ ও সন্ধ্যাকুমারের মনে যে আশা ছিল, ভস্মের সাহায্যে সব কাজ সেরে ফেলার, তা আর ভবনে হওয়ার নয়। ওদের অবস্থা দেখে সুহাসিণী বলল, ‘মনে হচ্ছে তিন ভাই-ই হতাশ হয়েছেন? ভস্মের শক্তি কাজ করবে না। তাই বলে কি বুদ্ধিবলে কিছুই হবে না?’

‘অত ভাববার সময়ই-বা কোথায়?’ উদয় বলল।

‘সময় না থাকলেও ভেবে একটা পথ বের করতেই হবে।’ সুহাসিণী বলল।

দশ

নিজেদের কাছে যে ভস্ম ছিল তা দিয়ে ভূ-গৃহে কোনো কাজ করা যাবে না, তা দিয়ে সেখানে কোনো কাজ হয় না শুনে তিন ভাই দুর্ভাবনায় পড়ল। অন্য ভাবে কী করা যায় ভাবতে লাগল তিন ভাই। ভাবতে ভাবতে তাদের মনে নতুন এক প্রশ্ন জাগল, ‘এই রাক্ষসটা কোন কোন দেশ থেকে যমজ ছেলে-মেয়েদের ধরে ধরে আনছে। এতদিন কেন আমাদের তিন ভাইকে ধরে আনেনি?’

পরের দিন ওরা তিন ভাই রাজকুমারীদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করল। নিজেদের মনে যে প্রশ্ন জেগেছিল উদয় সেগুলো নিয়ে রাজকুমারীদের সঙ্গে আলোচনা করল।

শুনে আশ্চর্য হয়ে সুভাষিণী বলল, 'তাইতো, আপনাদের সম্পর্কে এই প্রশ্ন আমাদের মনে জাগেইনি! তবে এখন আমাদের মনে হচ্ছে আপনাদের ধরে আনতে না যাওয়ার মূল কারণ...'

'থামলে কেন বল না। তোমার কথা জানার পর বুঝতে পারব কীভাবে ওই রাক্ষসটার হাত থেকে বাঁচতে পেরেছি। কীভাবে চললে ভবিষ্যতেও বাঁচতে পারব।' নিশীথ বলল।

সুভাষিণী বলল, 'তেমন কিছু নয়। শরীরে কোনো খুঁত থাকলে রাক্ষসের বলির কাজে লাগে না। রাক্ষসটা যমজদের তুলে আনার আগে ভালো করে দেখে নেয় কোনো খুঁত আছে কি না। আপনাদের দেখে আপনাদের শরীরে কোনো খুঁত আছে কি না বুঝতে পারিনি। তাই এই কথা বলতে দ্বিধা বোধ করছি। তাই ও-কথা বলতে...'

কথা শেষ হতে-না-হতেই যমজ তিন ভাই একসঙ্গে বলে উঠল, 'তোমাদের সন্দেহ সঠিক।'

তারপর উদয় নিজেদের অন্ধ হয়ে জন্মানোর কথা জানাল। কীভাবে যে দাড়িওয়ালার অঞ্জন লাগানোর ফলে ওরা দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল তাও জানাল। উদয়, নিশীথ ও সন্ধ্যাকুমারের জীবনের অনেক কথা কিছুক্ষণ শোনার পর জানতে পারল যমজ রাজকুমারীরা।

ওরা আলাপ করছিল। পরস্পরকে জানছিল। হঠাৎ সেই মারাত্মক বাতাস বইতে শুরু করল। তৎক্ষণাৎ রাজকুমারীরা পুকুরে লুকাল। কিন্তু বেচারা যমজ ভাইরা এবার আর তাড়াতাড়ি নিজেদের গায়ে ঠিক সময়ে ভস্ম ছড়িয়ে নিতে পারল না। উদয়ের কাছে ভস্ম ছিল। ভস্ম বের করে নিজেদের গায়ে ছড়ানোর আগেই হঠাৎ হাজির হয়ে গেল রাক্ষস। এক সঙ্গে তিন ভাইকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে গেল রাক্ষসটা।

তিন ভাই মনে মনে ভীষণ ভয় পেল। বুঝল যেকোনো মুহূর্তে তাদের বলি দেবে রাক্ষসটা। তবু, বাইরে তারা কোনো ভয় প্রকাশ করল না। সাহসী ছেলের মতো ছিল তাদের কথাবার্তা এবং আচরণ।

রাক্ষস ওদের জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কারা? আবার এই রহস্যময় অঞ্চলে কেমন করে এলে? সত্যি কথা বল, তা না হলে তোমাদের অবস্থা ভীষণ খারাপ হয়ে যাবে। তোমাদের মতো যমজ এখানে অনেক আছে। তারা জানে তাদের অবস্থা কী হয়েছে। বল, তাড়াতাড়ি সত্যি কথা।'

'আপনার কথা আমরা বুঝতে পারছি। এখানে আসা যে অত্যন্ত কঠিন, এটা যে রহস্যময় জায়গা, এখানে যাদের আনা হয়েছে তাদের অবস্থা যে মারাত্মক— এ সবই তো এখানে আসার পর জেনেছি। আর এও তো ঠিক, অত প্রাণের ভয় যাদের থাকে তারা কি আর এখানে আসতে পারে? সত্যি কথা বলতে কী প্রাণের ভয় আমাদের নেই। তাই যা বলব সত্য কথাই বলব। আগে আমাদের কথা শুনুন, তারপর আমাদের নিয়ে আপনার যা ইচ্ছা তাই করবেন।' উদয় বলল।

'হুঁ। এতটুকু ছোকরার কথার তো তোড় আছে। মুখে যেন খই ফুটছে। আমার ভাইকে তোমরাই ঠকিয়েছ না। যাক, এখানে চোরের মতো কেন এলে বল?' রাক্ষস গর্জে উঠল।

'তুমি ভুল করছ। আমরা এখানে চোরের মতো আসিনি। ওভাবে আসার প্রয়োজনও আমাদের নেই। আমাদের এখানে আসার কারণ হল...' উদয়ের কথা শেষ হতে-না-হতেই, 'আমাকে ঠকানো।' দূর থেকে শোনা গেল।

যমজ ভাইরা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, প্রথমে ওরা যাকে ঠকিয়েছিল সেই দাড়িওয়ালা কী যেন দূর থেকে বলতে বলতে আসছে।

ওই বেঁটে লোকটার আসার সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষসটা বলল, 'এদের যা করার আমি করব। তুমি নতুন শিকারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়।'

ছোটো ভাইয়ের উপদেশ শুনে দাড়িওয়ালা রাক্ষসটা ভাবল, 'এই ছেলেদের ব্যাপারে আমার ছোটো ভাই হয়তো সব খোঁজখবর ভালো ভাবে নিয়েছে। ও যখন বলছে, তখন এদের শাস্তি দেওয়ার ভার ওর উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত।' ভাবতে ভাবতে দাড়িওয়ালা বাজ পাখির রূপ ধরে চোখের পলকে উড়ে গেল।

তারপর রাক্ষস ওই যমজ ছেলেদের নিজের ভবনে নিয়ে গেল। সেখানে
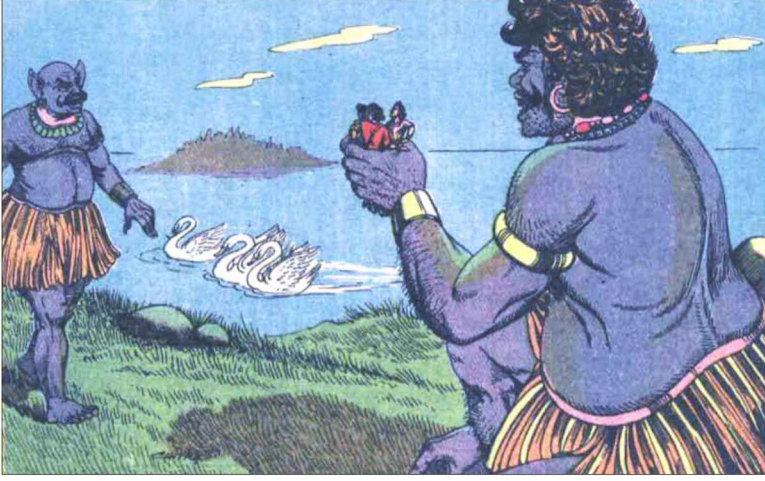
ওদের তিন জনকে বসিয়ে বলল, 'দেখ, তোমরা একের-পর-এক জনকে ঠকিয়ে যাচ্ছ। কিন্তু তোমরা হয়তো জানো না দিনের পর দিন ঠকিয়ে বেড়ানো যায় না। একদিন না একদিন ধরা পড়তেই হয়। শেষে সেই আমার হাতেই ধরা পড়লে। এখন ভালো কথা বলছি যেসব অঞ্জন ভস্ম ঝাড়ন আমার দাদার কাছ থেকে নিয়েছ সেগুলো সামনে রেখে দাও। তার পরের কথা পরে বলছি। আর যদি না দাও তাহলে...'

যমজ ছেলেরা খুব অসহায় বোধ করল। নিরুপায় হয়ে অঞ্জন, ভস্ম, ঝাড়ন প্রভৃতি তার সামনে রেখে দিল। তারপর রাক্ষস বলল, 'শোনো ছেলেরা, অনেক কাল থেকে আমি এখানে পাহারা দিচ্ছি। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ আমাকে ঠকিয়ে ভেতরে ঢুকতে পারেনি। যারা এসেছে তারা আমার হাতে ধরা পড়েছে। তৎক্ষণাৎ তাদের পাথর করে দিয়েছি। ওই দেখ, দেখছ তো কীভাবে জ্যান্ত একটা প্রাণী মরে পড়ে আছে। আমাকে ঠকিয়েছ টের পাওয়ার পর থেকে আমি জল গ্রহণ করিনি। এখন আমার পেটে যা খিদে আছে তাতে তোমাদের একসঙ্গে পেটে পুরে নিতে পারি। কিন্তু এক্ষুনি আমি তা করতে যাচ্ছি না।' বলে রাক্ষস ঝাড়ন পেতে দিয়ে নিজের মনোমতো খাবার কামনা করল। পেট পুরে খেয়ে নিল। তারপর ওই ঝাড়নের উপর থেকে তুলে কিছু ফল সন্ধ্যাকুমার, নিশীথ ও উদয়ের হাতে দিল। ওরা সেই ফল খেল। ওদের তিন জনকেই একটি দড়ি দিয়ে বেঁধে বলল, 'তোমরা এখানেই থাক। আমি পুকুর থেকে জল খেয়ে আসছি।

সে কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনটি পাতার ঠোঙায় করে জল এনে ওই যমজ ছেলেদের খেতে দিল।
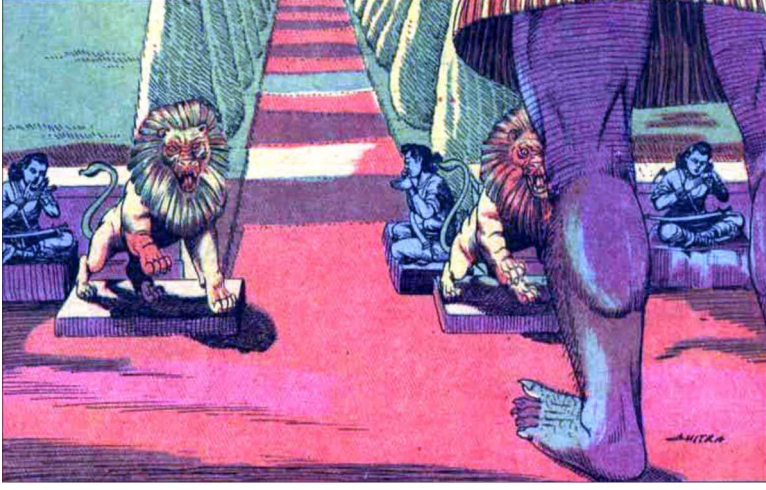
ওই ছেলেরা ভাবল রাক্ষস ওদের প্রতি একটু দয়ালু হয়েছে। ওদের যে তৃষ্ণা পাচ্ছিল, তা সে টের পেয়েছে। এ-কথা ভেবে ওরা তিন ভাই ঢক ঢক করে পাতার ঠোঙার জল খেয়ে নিল। তৎক্ষণাৎ ওরা তিনটি পাথরের মূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

ওদের পাথর হওয়া দেখতে দেখতে রাক্ষস হা-হা-হা করে হেসে উঠে ওই ভবনে, যেখানে সে দাঁড়িয়ে পাহারা দেয়, সেখানে ওই তিনটি মূর্তিকে রেখে দিল।

এদিকে উদয়, নিশীথ ও সন্ধ্যাকুমার এভাবে পাথরের মূর্তি হল আর ওদিকে মহারাজ দানশীল এবং রানি পদ্মমুখী দুঃখে ভেঙে পড়েছিলেন।

যমজ তিনটি মেয়ের খোঁজে যেদিন যমজ তিনটি ছেলে বেরুল সেইদিনই রাজা একটি কাজ করলেন। সেই দিনই তাঁর অট্টালিকার উপরে একটি ছোট্ট ঘর তৈরি করিয়ে নিলেন। সেই ঘরে বসে অনেক দূর থেকে কে আসছে কীভাবে আসছে সব কিছু লক্ষ করা যেত। শুধু একদিকে নয়, সবদিকেই দেখা যেত। সেদিন থেকে রাজার একমাত্র যেন কাজ ছিল ওই ঘরে বসে তার মেয়েরা ফিরে আসছে কি না দেখা। একই ভাবে দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল রাজার। কিন্তু মেয়েদের বা যমজ ছেলেদের কোনো পাত্তা ছিল না।

একদিন দু-দিন নয়, টানা পাঁচটি বছর কেটে গেল। যত দিন যেতে লাগল ততই রাজার শরীর ভেঙে পড়তে লাগল। মেয়েদের ফিরে পাওয়ার আশাও কমে যেতে লাগল। একমাত্র জ্যোতিষী ভরসা দিয়ে যাচ্ছিল। জ্যোতিষী প্রত্যেক দিন রাজাকে বলত, 'আপনার প্রত্যেকটি মেয়ে বেঁচে আছে। ওদের ফিরে আসার সম্ভাবনা আছে। আপনার আশা ভঙ্গের কোনোর কারণ নেই। শরীর মন ভেঙে গেলেও একমাত্র মেয়েদের দেখার আশাতেই যেন বেঁচে ছিলেন তিনি।

একদিন সকালে রাজা যথারীতি ওই ঘরে বসে দেখছেন। যত দূর দৃষ্টি যায় তিনি দেখছিলেন। হঠাৎ দূর থেকে নজরে পড়ল দু-টি ঘোড়া তীব্র বেগে রাজভবনের দিকে আসছে। ঘোড়া দুটির রং দেখে রাজা দুঃখে আর্তনাদ করে উঠলেন। ওদের দু-জনকে ওইভাবে আসতে দেখে তিনি নিজের বুকে ছোরা বসাতে গেলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে ওই দৃশ্য প্রহরীর নজরে পড়ায় রাজার আর আত্মহত্যা করা হল না। তবে রাজা মূর্চ্ছা গেলেন।

কিন্তু তা কিছুক্ষণের জন্য। দুটো ঘোড়া রাজভবনের কাছে পৌঁছে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজাও জ্ঞান ফিরে পেলেন। যে ঘোড়াগুলো যমজ ছেলেদের তিনি দিয়েছিলেন এগুলো যে সেই ঘোড়া তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। তবে ওই ঘোড়ায় চড়ে যারা এল তারা ওই ছেলে দু-টি নয়, তারই সেনা।

রাজা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে ওই সেনা দু-টিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার মেয়েরা কোথায়? ওই যমজ ছেলেগুলোই বা কোথায়? এ ঘোড়াগুলো তোমরা কবে কোথায় পেয়েছ?'

এই কথার জবাবে রাজাকে সেনারা বলল, 'মহারাজ, আমাদের ক্ষমা করুন। রাজকুমারীদের অথবা ওই যমজ ছেলেদের কোনো খোঁজ আমরা পাইনি। আমরা রাজকুমারীদের ঘুরে ঘুরে খোঁজার সময় এই ঘোড়াগুলোকে পেয়েছি। ঘোড়াগুলো দেখেই আমরা ভেবেছিলাম কাছাকাছি কোথাও ওই যমজ ছেলেদের খোঁজ পাব। আশেপাশে কত খুঁজেছি কিন্তু পাইনি। ভেবেছিলাম ঘোড়াগুলো ছেড়ে অন্য কোনো ভাবে যমজ ছেলেরা হয়তো রাজপ্রাসাদে ফিরে এসেছে। জানি না মহারাজ, আমরা ভুল করেছি কি ঠিক করেছি।'

সব কথা শুনে রাজা আপন মনে বললেন, 'আমার ভাগ্যে আরও যে কত দুঃখ আছে কে জানে।'

একের-পর-এক জ্যোতিষী মন্ত্রী রাজাকে সান্ত্বনা দিলেন। তারপর সমস্ত সেনাদের উদ্দেশ্য করেই তিনি যেন বললেন, 'পাঁচ বছরের মধ্যে তোমরা আমার মেয়েদের খোঁজ করতে পারলে না। পাঁচ বছরের মধ্যে আমার মেয়ে তিনটিকে খোঁজ করার জন্য যে ছেলে তিনটি বেরিয়েছে, তাদেরও খবর আনতে পারলে না। তোমরা যাও আবার খোঁজ। তোমাদের ফেরা পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকব কি না জানি না। তবু তোমরা যাও।' এই খবর পেয়ে রানির মাথা যেন আরও খারাপ হয়ে গেল।

এগারো

রাক্ষস যে যমজ ছেলেদের ধরে ফেলেছে, ওদের জল খাইয়ে পাথর করে ফেলেছে তা রাজকুমারীরা বুঝতে পেরেছে। ওরা তখন হাঁস হয়ে পুকুরে ভেসে বেড়াচ্ছিল। রাক্ষসের নজরে যা পড়েনি তাদের নজরে সেটা পড়েছে। উদয় যখন কৌটো থেকে সাদা ভস্ম গায়ে দিতে যাচ্ছিল ঠিক তখনই রাক্ষস এল। এটাই ওরা লক্ষ করল। রাক্ষসের আওয়াজ পেয়ে উদয় তাড়াতাড়ি রাখতে গিয়ে সেটা নীচে পড়ে গেল। কৌটোটা কুড়িয়ে নেবার আগেই রাক্ষস এসে গেল। কৌটো কুড়োনো আর হল না।

রাক্ষসদের চলে যাওয়ার পর রাজকুমারীরা পুকুর থেকে বেরিয়ে এল। উদ্দেশ্য ওই কৌটো খোঁজা। কিন্তু সেটা খুঁজে পাওয়া গেল না।

রাজকুমারীরা অবাক হয়ে বলাবলি করল, 'একি! এ তো অদ্ভুত ব্যাপার। ওই কৌটো তো আমরা তিন জনেই দেখেছিলাম। এখানেই তো পড়ল। গেল কোথায়? একি হাওয়া হয়ে গেল? কোথায় আর যাবে? এখানেই ধারে-কাছে কোথাও পড়ে

থাকবে! এসো আমরা ভালো করে খুঁজি। কারণ আমরা এতদিন ধরে এখানে আছি। আমাদের অজানা কোনো জায়গা নেই। আমরা খুঁজে বের করতে না পরেলে ওই যমজ ভাইরা কোনোক্রমেই পাবে না। শেষে ওই ভস্ম রাক্ষসের হাতে পড়বে। আর একবার তার হাতে পড়লে জীবনে আর আমরা পাব না। যমজ ভাইরাও পাবে না।'

ওরা তিন জনে খুঁজতে লাগল। সেখান থেকে অনেক দূরে কৌটোটা পড়েছিল। কৌটো পেয়ে আর এক বিপদ হল তাদের। রাখবে কোথায়? অনেক ভেবে ওরা পুকুরের ধারে মাটি খুঁড়ে রেখে ছিল। তারপর মাটি ঢাকা দিল।

এর পরের কাজ কী করে যমজ ভাইদের উদ্ধার করবে। অনেক ভেবে সুকেশিণী বলল, 'আমি একটা উপায় খুঁজে বের করেছি। বলব?'

সে-কথা শুনে সুহাসিণী ও সুভাষিণী বলল, 'বল, তাড়াতাড়ি বল।'

তখন সুকেশিণী বলল, 'যেকোনোভাবে রাক্ষসকে সরাতে হবে। একভাবে এটা করা যায়। আমরা রাক্ষসের কাছে গিয়ে আমাদের নাচ দেখানোর কথা বলতে পারি। আমরা নাচব বললে, রাক্ষস রাজি হয়ে যাবে। আমরা যখন নাচব, রাক্ষসও নাচবে আমার সঙ্গে। সে আনন্দে বিভোর হয়ে যাবে। ঠিক সেইসময় এক ফাঁকে মন্ত্রপড়া জল ওই পাথরের মূর্তিগুলোর উপর ছড়িয়ে দিতে পারি। অবশ্য জল ছড়ানো রাক্ষসের সামনে হবে না। দু-জনকে রাক্ষসের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বেরিয়ে আসতে হবে। একজন সেখানে থেকে যাবে। সুযোগ মতো জল ছিটিয়ে দেবে। তারপর কী হবে সেটা যমজ ভাইরা ঠিক করবে।'

এই কথা শুনে সুহাসিণী বলল, 'ও যে রাক্ষস তা কি তুমি ভুলে গেছ? ওর চোখে ধুলো দিয়ে এই ভবনে কোনো কাজ করা যায় বলে আমার মনে হয় না। পাথর মূর্তিগুলোর উপর জল ছিটাতে পারলেও তার পরের অবস্থা সামাল দেওয়া যাবে না। ফল হবে এই যে আমাদের অবস্থাও ওই ছেলেদের মতো হবে। আমাদেরও পাথরের মূর্তি হয়ে ভবনের এক কোণে পড়ে থাকতে হবে।'

সুকেশিণী বলল, 'পরে কী হবে সেটা পরের কথা। সাহস করে একটা কাজ না করলে কাজ এগোয় না। কখন কবে কোন বিপদে পড়ব বলে বসে থাকলে কোনো কাজ হয় না। কোনোদিন এখান থেকে ছাড়া পাব না। আমাদের আর আগের সেদিন নেই। এখন এই যমজ ভাইরা আছে। তারা এখান থেকে শুধু যে উদ্ধার হতে চায় তাই নয়। আমাদেরও উদ্ধার করতে চায়। তাই আমাদের মনোবল বাড়াতে হবে। আমরা কোনোক্রমেই ওই রাক্ষসের কাছে নতি স্বীকার করব না। বাধাবিপত্তি, দুঃখকষ্ট যা-ই হোক না কেন আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। এখান থেকে বেরোতে হবে। এই রাক্ষসকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে। আমরা যদি ভালো ভাবে শিক্ষা দিতে পারি তাহলে ভবিষ্যতে আর কাউকে, কোনো যমজ সন্তানদের এই রাক্ষসগুলো আনতে পারবে না।' শেষে সুহাসিণী ও সুভাষিণী তার কথায় রাজি হল। পরের দিন পুকুরের সমস্ত হাঁস তীরে উঠল। ওদের মধ্যে ছেলে ছিল, মেয়েও ছিল।

সুহাসিণীর কথায় ছেলেরা সব আবার পুকুরে চলে গেল। তীরে যারা ছিল সব মেয়ে। মেয়েরা গান গাইতে গাইতে উদ্যানে ফুল তুলে ভবনে ঢুকল। রাক্ষস ভবনের দিকে এল। ওদের গান কানে যেতেই রাক্ষস গর্জে উঠে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা সব গান গাইতে গাইতে যাচ্ছ কোথায়? জানো না আমি গান ভালোবাসি না? জানো না এখানে গান গাওয়া নিষেধ?' বলে মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল রাক্ষসটা।

ওকে ওভাবে বলতে দেখে সুকেশিণী বলল, 'সত্যি গান ভালোবাস না?'

'সে-কথা থাক। তোমরা এই ভবনের ভেতরে এলে কেন? সেটা আগে বল।' রাক্ষস বলল।

'কেন এলাম? এলাম, নতুন যমজ ছেলেদের দেখতে। ওদের যে কী হবে কে জানে।' সুকেশিণী বলল।

তার কথায় রাক্ষস হো-হো করে হেসে উঠে বলল, ‘কী হবে? এর আগে যারা এসেছে তাদের অবস্থা যা হবে, এদেরও সেই অবস্থাই হবে।’ বলে নিজেই ভবনের ভেতরে ঢুকে নতুন যমজ ছেলেদের পাথরের মূর্তি ওদের দেখাল। ওগুলো দেখতে দেখতে সুকেশিণী বলল, ‘তোমার কাণ্ডকারখানা দেখে আমি বেশ মজা পাচ্ছি। তবে একটা প্রশ্ন, সেটা হল এভাবে কত দিন আর এখানে পাথর হয়ে পড়ে থাকা যায়! এই একঘেয়ে জীবন কার ভালো লাগে? তাই বলছিলাম, বলির কাজটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেললেই তো হয়, আর দেরি করছ কেন?’ সুকেশিণী এমনভাবে বলল যেন সে ভয় পাচ্ছে না।

রাক্ষস বলল, ‘তোমরা ভাবছ আমার এসব ভালো লাগছে। তাই না? কিন্তু এ ছাড়া আমার করারও তো কিছু নেই। তোমাদের বলি দেওয়ার আগে আমি এক পাও নড়তে পারি না। আমার দাদাই আমাকে শেষ করে ফেলবে।’

তৎক্ষণাৎ সুকেশিণী বলল, ‘কিন্তু আর কত দিন, আর কত কাল এভাবে কাটাবে? মাঝে মাঝে আমাদের সঙ্গে নাচ-গান তো করতে পার? নাকি তাও বারণ? জীবনে একটু আনন্দ না থাকলে তোমাদের হয়তো চলতে পারে, আমাদের চলে না।’

ওর কথা শেষ হতে-না-হতেই রাক্ষস বলল, ‘আমারও চলে না। খুব খারাপ লাগে এভাবে থাকতে।’

কিছুক্ষণ কী যেন ভেবে রাক্ষস বলল, ‘আমি যে একটা হাতির মতো চেহারা নিয়ে এখানে পাহারা দিচ্ছি তাতেই ছোঁড়াগুলো ঢুকে গেল। আমি না থাকলে এই ভবনে আরও কত কিছু ঢুকে যাবে তার ঠিক নেই।’

ওসব তোমার ভুল ধারণা। এই পাণ্ডব বর্জিত দেশে কে আসবে? আর আসলেই বা, এখান থেকে পালাবে কোথায়? ওসব আজেবাজে কথা ছেড়ে এসো আমরা আনন্দ করি। আমাদের মধ্যে কেউ-না-কেউ পালা করে পাহারা দেবে।’ সুকেশিণী বলল।

‘তাহলে এখন কে পাহারা দেবে?’ রাক্ষস বলল।

সুকেশিণী সুহাসিণীর দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আবার কে, আমার দিদি পাহারা দেবে।’ তারপর ওরা রাক্ষসকে নিয়ে পুকুরের ধারে চলে গেল। সুহাসিণী সেখানেই রয়ে গেল।

পুকুরের ধারে রাক্ষসকে বসিয়ে ওরা গান গাইতে গাইতে নাচতে লাগল। রাক্ষস আনন্দ পেয়ে বলল, ‘রোজ এইভাবে নাচ-গান হলে ভালোই হয়।’

তারপর থেকে প্রত্যেক দিন রাক্ষসের পরিবর্তে কেউ-না-কেউ পাহারা দিত। রাক্ষস প্রত্যেক দিন ওদের নাচ দেখে গান শুনে আনন্দ পেত। চারদিন পরে এমন হয়ে গেল যে রাক্ষস নিজেই যমজ রাজকুমারীদের ডেকে নাচ দেখাতে এবং গান শোনাতে বলত।

যে রাক্ষস গান ভালোবাসে না বলেছিল সেই রাক্ষস গান শুনে আনন্দ পেতে
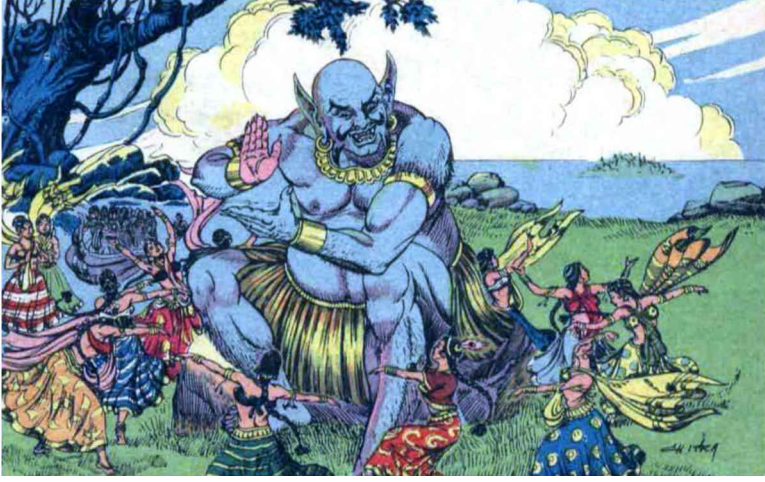
লাগল। মেয়েদের নাচ দেখে বিভোর হয়ে অনেক সময় নিজেই নাচত। এই ধরনের নাচ-গানের ফলে রাক্ষসের একঘেয়ে জীবন বদলে গেল। গান না শুনলে তার ভালো লাগত না। নাচ না দেখে সে থাকতে পারত না। যমজ তিন কন্যার কল্যাণে রাক্ষস শুনতে পারল গান আর দেখতে পারল নাচ।

এইভাবে চলল কিছুদিন। সুকেশিণী, সুহাসিণী ও সুভাষিণী ভাবতে লাগল কীভাবে সেখান থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। সেদিন পাহারায় যাওয়ার আগে সুকেশিণী ওই পুকুরের জলে নিজের আঁচল ভালো করে ভিজিয়ে নিল। উদ্দেশ্য সেই জলের ছিটা দিয়ে পাথরের মূর্তিতে প্রাণ সঞ্চার করা। সুকেশিণী পাহারায় যাওয়ার আগে রাক্ষসকে বলল, 'আজকের নাচ কেমন হয় কী কী গান হয় আমাকে কিন্তু সব বলতে হবে। খুব মন দিয়ে গানগুলো শুনবে। ভালো করে নাচ দেখবে।'

'ঠিক আছে। তুমি কিন্তু এখানে সাবধানে পাহারা দিও।' তারপর রাক্ষস চলে গেল পুকুরের পাড়ে। তাকে দূর থেকে দেখেই যমজ রাজকুমারীরা আরও ভালো করে নাচতে লাগল।

ভবন ছেড়ে রাক্ষসের চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই সুকেশিণী আঁচল নিঙড়ে যমজ ছেলেদের মূর্তির উপর ফোঁটা ফোঁটা জল দিল। পাথরের মূর্তিগুলো প্রাণ পেল। যমজ ছেলেরা একসঙ্গে বলে উঠল, 'একি রাক্ষসের চোখে ধুলো দিয়ে এখানে এলে কী করে?'

যমজ ভাই তিন জন অবাক হয়ে একে অন্যের মুখ দেখতে লাগল।

তখন সুকেশিণী সব কথা জানাল। পরে পরামর্শ দিল, 'এক কাজ করি, আজকে

তো ভস্ম আনতে পারিনি, আর ভস্ম না থাকলে চটপট কিছুই করা যায় না। আজকে আপনাদের এই জল ছিটিয়ে দিচ্ছি। পাথরের মূর্তি হয়ে আরও একদিন থাকুন। কালকে যেকোনোভাবে ভস্ম আনব। ভস্ম হাতে থাকলে মনে জোর থাকে। সব কিছু করা যায়। অতএব আরও একটি দিন কষ্ট করে পাথর হয়ে থাকতে হচ্ছে। উপায় নেই।' বলে সুকেশিণী আঁচল নিঙড়ে ওদের ওপর জলের ফোঁটা দিল। ওরা যাথারীতি পাথরের মূর্তি হয়ে গেল।

রাক্ষস সেখানে এসে সুকেশিণীকে বলল, 'যাই বল তুমি না থাকলে ঠিক জমে না। তুমি থাকলে নাচ-গান একেবারে দারুণ জমে উঠে। তুমি কোথায় ছিলে? চলে গেলে কেন? এখানে থাকতে তোমার ভালো লাগে না? এবার থেকে তুমি যাবে না।'

'তাই নাকি? ঠিক আছে, কালকে আমি যাব। এখানে আমার দিদি পাহারা দেবে।' বলে সুকেশিণী পুকুরে চলে গেল। সেখানে তিন রাজকুমারী নিজেদের মধ্যে আলোচনা করল। ভস্মের কৌটো ভালো করে খুঁজল কিন্তু কোথাও পেল না। কী যে করবে কিছুই ভাবতে পারছিল না। তীরে এসে তরি ডোবার উপক্রম হল। সব দিক যাবে। সব বুঝি পণ্ড হবে।

পরের দিন নাচ শুরু হওয়ার আগে সুকেশিণী সুভাষিণীকে বলল, 'আজকে পাহারা দিতে তুমি যাও। তুমি আঁচল ভিজিয়ে মন্ত্রপড়া জল নিয়ে চলে যাও। আমরা যে ভস্মের কৌটো খুঁজে পাইনি তা জানাও ওদের। ওরা ভেবে-চিন্তে যা আমাদের করতে বলবে আমরা তাই করব।'

সুভাষিণী আঁচল ভিজিয়ে ভবনে গিয়ে রাক্ষসকে যেতে বলল। রাক্ষস চলে

গেল নাচ দেখতে। সুভাষিণী আঁচল নিঙড়ে দিল। জল ঠিক ভাবে মূর্তিগুলোর উপর পড়ল না। ফলে ওগুলো প্রাণ পেল না। সজীব হয়ে উঠল না। তখন সুভাষিণী মন্ত্র জলে ভেজানো আঁচলটা পাথরের মূর্তিগুলোর উপর ভালোভাবে নিঙড়ালো। মূর্তিগুলো প্রাণ পেল।

সুভাষিণী ওদের সব কিছু জানাল। তার কথা শুনে উদয় বলল, 'আমার মনে হচ্ছে যে কাজের জন্য আমরা এখানে এসেছি সেই কাজ আমরা ঠিক মতো করতে পারছি না। বার বার কোথায় যেন আমাদের ভুল হচ্ছে। যার জন্য আমরা কিছুতেই এগোতে পারছি না। ভুল না হলে ঠিকই আমরা এগোতে পারতাম। আরও একটু সাহসী হওয়া উচিত। রাক্ষসের এখানে আসার আগেই আমাদের এখান থেকে সরে পড়তে হবে। আর পাথর হয়ে এই ভবনে বসে থাকা চলে না। কার্যসিদ্ধির জন্য নতুন নতুন পথ আবিষ্কার করতে হবে। তা ছাড়া এগোনো যাবে না। নিশ্চলতা হতাশা যেন আমাদের মধ্যে স্থান না পায়। সফলতার জন্য অহংকার করা উচিত হয়নি। অহংকারী হলে পথ পাব না এগিয়ে যাবার।'

উদয়ের কথা শুনে সুভাষিণী বলল, 'তাহলে আপনাদের তিনটি মূর্তি যেখানে ছিল সেখানে অন্য তিনটি মূর্তি রেখে দিতে হবে। তা না হলে রাক্ষস এই ভবনে পা রেখেই বুঝতে পেরে যাবে। তখন আমাদের সকলেরই বিপদ ঘটবে। রাক্ষসটা দেখতে অনেক বড়ো কিন্তু ওর মাথায় কিছু নেই। ও মূর্তিগুলোকে অত মিলিয়ে দেখবে না। মূর্তির পরিবর্তে যেকোনো একটা মূর্তি থাকলেই চলবে। কার মূর্তি কী ধরনের মূর্তি অত কিছু সে জানতে পারবে না। রাক্ষসটা এই ভবনের মধ্যে পাহারা দিতে আসার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা অন্য পথে আমাদের কাছে চলে আসবেন। সেখানে সবাই মিলে ভেবে অবশ্যই একটা কিছু করা যাবে।'

সুভাষিণীর কথা ওই তিন যমজ ভাইদের ভালো লাগল। ওরা অন্য জায়গার তিনটি পাথরের মূর্তি এনে সেখানে রেখে দিয়ে ভবনের বাইরে চলে গেল। ঝোপঝাড় দেখে তিন ভাই লুকাল।

যথাসময়ে রাক্ষস এল। সুভাষিণী ছুটি পেল। সুভাষিণী সোজা চলে গেল যমজ ভাইদের কাছে। ওরা সুভাষিণীর সঙ্গে পুকুরের পাড়ে গেল।

বারো

রাক্ষসকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে স্বরূপ পেয়েও যমজ ভাইরা শান্তি পেল না। কারণ মন্ত্র ভস্ম অনেকখানি শেষ হয়ে গিয়েছিল। যখন-তখন রূপ বদলাতে হলে দু-এক দিনের মধ্যেই ভস্ম শেষ হয়ে যাবে। আবার পুকুরে হাঁস হয়ে থাকও নিরাপদ নয়। পুকুরের হাঁস গোনাগুনতি হাঁস। সংখ্যা বাড়লে রাক্ষসের নজরে পড়বে। কমে গেলেও নজর এড়াবে না। ওরা ভাবতে লাগল কী করবে। কোথায় গা-ঢাকা দিয়ে থাকবে। এভাবে ভাবতে ভাবতে তিন ভাই ক্লান্ত হয়ে পড়ল। এক-একটা মুহূর্ত এক-একটা যুগের মতো তাদের কাছে মনে হচ্ছিল।

একদিন সুভাষিণী যমজ ভাইদের বলল, ‘আর আপনাদের এখানে থাকা উচিত নয়। রাক্ষসের চোখে ধুলো দিয়ে আমরা যা করেছি তা যেকোনো মুহূর্তে তার চোখে পড়ে যেতে পারে। এবার ধরা পড়লে আর রক্ষে থাকবে না। তাই বলছি যেকোনোভাবে আপনারা এখান থেকে পালন। আমাদের বাঁচাতে গিয়ে এভাবে নিজেদের সর্বনেশে বিপদ ডেকে আনবেন না।’

উদয় বলল, ‘তা হতে পারে না। আমরা এখানে পালাতে আসিনি। তোমাদের উদ্ধার করে নিয়ে যেতে এসেছি। তাই যতক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ তোমাদের নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব। এটাই আমাদের প্রতিজ্ঞা।

‘তা যদি করতে হয় তাহলে একটি মাত্র পথ খোলা আছে। কাল যখন রাক্ষস নাচ দেখতে আসবে তখন সবাইকে নিয়ে নাচানাচি করার চেষ্টা করব। পুকুরে যত হাঁস আছে প্রত্যেকটি স্বরূপ ধরবে। প্রত্যেকেই নাচবে। অতগুলো রাজকুমারদের মধ্যে আপনারাও মিশে যাবেন। নাচ যখন জমে উঠবে, রাক্ষসও যখন নাচে ডুবে যাবে, তখন সুযোগ বুঝে আপনারা রাক্ষসের মুণ্ডু কেটে ফেলবেন।’ বলল সুভাষিণী।

যমজ ভাইরা সুভাষিণীর এই প্রস্তাবে রাজি হল। পরের দিন যাথারীতি রাক্ষস এল। সুভাষিণী রাক্ষসকে বলল, ‘এতগুলো মেয়েদের মধ্যে তুমি একা ব্যাটা ছেলে থাক এটা ভালো দেখায় না। এতে আনন্দও হয় না। পুকুরে তো আরও অনেক রাজকুমার আছে, সবাই এখানে নাচলে আরও অনেক মজা পাবে আরও অনেক ভালো লাগবে।’

‘এর জন্য তুমি আমার অনুমতি চাইছ কেন? যা করলে আমাদের এই নাচ-গান আরও ভালো হয় তাই কর।’ রাক্ষস সানন্দে বলল।
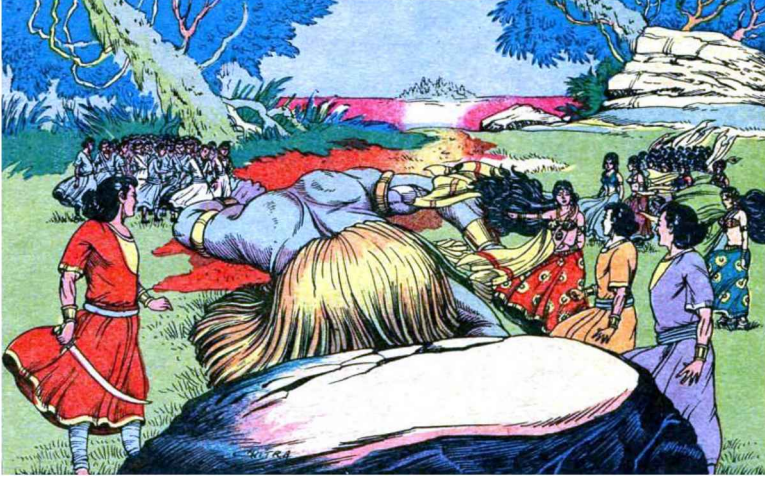
কিছুক্ষণের মধ্যে পুকুরের সমস্ত হাঁস তীরে উঠে এসে নিজের নিজের রূপ ধরল। নাচ-গান হইচই এর মধ্যে রাক্ষস কে কোথায় আছে লক্ষ করতে ভুলে গেল।

এদিকে যমজ রাজকুমারীরা দারুণ নাচতে লাগল। সব কিছু যখন জমে উঠেছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে উদয় হঠাৎ তরবারি দিয়ে রাক্ষসের মুণ্ডু কেটে ফেলল। কাটা মুণ্ডু মাটিতে পড়ে গেল। মুণ্ডুটা গড়াতে গড়াতে পুকুরের জলে পড়ল। দেখতে দেখতে পুকুরের সমস্ত জল লাল হয়ে গেল।

আর ঠিক সেইসময় আর এক বিচিত্র ঘটনা ঘটে গেল। ওই ভবনটি কোথায় যেন কর্পূরের মতো উবে গেল। কিন্তু আশ্চর্য পাথরের মূর্তিগুলো সেখানে একই ভাবে ছিল।

তখন সুহাসিণী বলল, 'দেখছেন কী? আর দেরি নয়, মন্ত্র জল পাথরের মূর্তিগুলির উপর ছিটাতে থাকুন। ওরা আপন রূপ পাবে।'

ওরা তাই করল। মূর্তিগুলো সব রাজকুমার হয়ে গেল। তারপর ওরা এই যমজ রাজকুমার ও যমজ রাজকুমারীদের খুব প্রশংসা করল।

পাথর হয়ে যখন ছিল তখন কারো কোনো চিন্তাভাবনা ছিল না। স্বরূপ ধরে সবাই ভাবতে লাগল, কীভাবে নিজের দেশে ফিরে যাবে। কিন্তু তার আগে সেখানে যে আরও রাক্ষস আছে, তাদের এড়াবে কী করে? এই দুশ্চিন্তাও তাদের মাথায় ঘুরছিল। প্রথমে একা একা ভাবল। পরে সবাই মিলে আলোচনা করল। কিন্তু কেউ কূলকিনারা পেল না।

শেষে উদয় বলল, 'সকলের এখানে থাকা উচিত নয়। একে একে চেষ্টা করে পালানোই ভালো। আমাদের তিন ভাইয়ের দায়িত্ব রয়েছে এই তিন যমজ রাজকুমারীদের নিয়ে যাওয়া।'

ওদের মধ্যে একজন বয়স্ক লোক বলল, 'পালানোর কথা ভাবা যায়, পালাতে বলা যায়, কিন্তু পালানো যায় না। ওই দাড়িওয়ালার চোখে ধুলো দেওয়া অত সহজ নয়। তাই বলছি আমাদের একটি কাজই করতে হবে। আবার পাথরের মূর্তি হয়ে অপেক্ষা করা।'

ওদের এই কথায় যমজ ভাইরা রাজি না হয়ে পারল না। আবার ওদের সবাইকে পাথরের মূর্তি করে দিল।

উদয়, নিশীথ ও সন্ধ্যাকুমার ভাবতে বসল কী করবে। এমন সময় দ্বিতীয় রাক্ষস এল। এবারে সে একা আসেনি। একটা রাজকুমারীকে সঙ্গে নিয়ে এল। রাক্ষসের আসার আওয়াজ পেয়ে জমজ ভাইরা তাড়াতাড়ি একসঙ্গে পুকুরে ঢুকে মুহূর্তে হাঁস হয়ে গেল।

নতুন একটা হাঁস পুকুরে বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাঁসগুলোকে সে গুনতে লাগল। এতদিন সে ভাবছিল সব মিলিয়ে সাতচল্লিশটা আছে। আরও তিনটে হলে তার উদ্দেশ্য সফল হবে। সে হিসেবে ধরলে নতুন রাজকুমারীকে নিয়ে আটচল্লিশ হয়। কিন্তু গুণে দেখে রাক্ষস অবাক হয়ে গেল। বার বার গুনেও দেখল তিনটি বেশি আছে। মোট একান্নটা আছে। আনন্দে রাক্ষসটা লাফাতে লাগল। কিন্তু পরমুহূর্তে কী একটা ভেবে সমস্ত হাঁসকে তীরে ডেকে বলল, 'তোমাদের মধ্যে নতুন তিন জন কে কে আছ? তাড়াতাড়ি আমাকে এসে বল।'

যমজ ভাইরা রাক্ষসের দিকে এগিয়ে এসে বুক টান করে বলল, 'আমরা। এই সব নিরপরাধ রাজকুমার ও রাজকুমারীদের এভাবে বন্দি করে রেখেছ কেন? এখনও সময় আছে, এক্ষুনি এদের ছেড়ে দাও। তা না হলে তোমার ভাইয়ের যে অবস্থা হয়েছে তোমার অবস্থাও তাই হবে।'

'কী? কী হয়েছে আমার ভাইয়ের? উদ্‌বিগ্ন হয়ে রাক্ষস প্রশ্ন করল।

'কী আর হবে? মাটিতে মিশে গেছে। আর তার সঙ্গে তোমাদের জাদুর ভবনটিও গেছে।' কথা শেষ হওয়ার আগেই রাক্ষস ছুটে গেল। দেখল যেখানে তার ভাই পাহারা দেয় সেখানে সে নেই। পাগলের মতো এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে লাগল। কিন্তু পাথরে মূর্তি ছাড়া আর কিছুই সে দেখতে পেল না। সে ভীষণ রেগে গিয়ে গর্জন করতে করতে ফিরে এল।

ততক্ষণে যমজ ভাইরা উদ্যানে ঢুকে আম খেয়ে বানর হয়ে গেল। রাক্ষসের নাগালের বাইরে উঁচু এক আম গাছের ডালে উঠে বসে রইল।

খুঁজে খুঁজে হায়রান হয়ে রাক্ষস বলল, 'ঠিক আছে, আমিও দেখব তোমরা আমাকে ঠকিয়ে কতদিন ঘুরে বেড়াতে পার।' বলে সে আবার বাজ পাখির রূপ ধরে উড়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে বানরের রূপ ধরে যমজ ভাইয়েরা যেখানে ছিল সেখানে হাজির হল ওই বেঁটে দাড়িওয়ালা।

ওদের দিকে তাকিয়ে দাড়িওয়ালা বলল, 'কেমন জব্দ হয়েছ? তোমাদের কপাল ভালো যে এখনও প্রাণে বেঁচে আছ।' দাড়িওয়ালা এসব কথা বলার সময় হঠাৎ একটি বানর লাফিয়ে এসে তার মাথায় বসল। আর একটি তার দাড়ি ধরে টানতে লাগল। তৃতীয়টি তার পা ধরে টানতে লাগল। বেঁটে লোকটা ছাড়াবার জন্য অনেক চেষ্টা করল কিন্তু কিছুতেই ছাড়াতে পারছিল না।
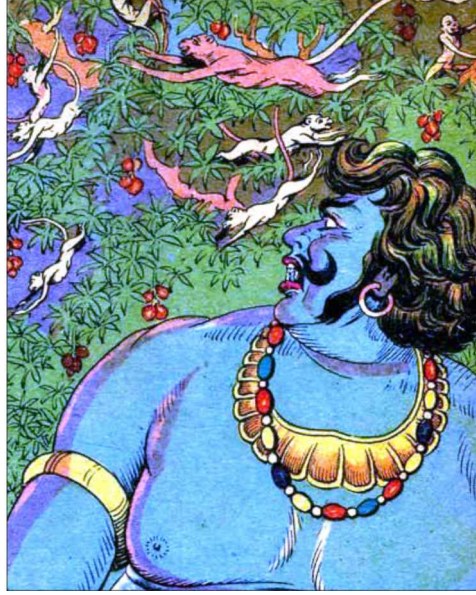
যমজ ভাইয়েরা অল্পক্ষণের মধ্যেই ওই বেঁটে দাড়িওয়ালাকে কাবু করে ফেলল। ওরা তাকে কায়দা করে গাছে তুলে নিল। তারপর তার লম্বা দাড়ি দিয়ে গাছের একটি ডালের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে ফেলল। পরে ঝট করে গাছ থেকে নেবে ব্যাঙের ছাতা গোছের কয়েকটি গাছ তুলে নিজেদের রূপ ধরল। তাড়াতাড়ি এসব করে ফেলল।

বাঁধা অবস্থায় দাড়িওয়ালা বলল, 'তোমরা দেখছি এখানকার সব রহস্য জেনে গেছ। শুধু জানা নয়, প্রয়োগও করছ। আমি ওসব জানতাম না। তাই সরল মনে তোমাদের কাছে চলে এসেছি। এখন আমাকে দয়া করে আর দেরি না করে খুলে ফেল।'

'ওহে, আর আমরা তোমার কথা শুনছি না। তুমি জেনে রাখ, এখন থেকে তুমি আর ওই রাক্ষসদের চাকর নও। আমাদের চাকর। আমাদের কথামতো চলতে হবে। তোমার ওই গলার মালাটা আমাদের দিয়ে দাও। আর প্রাণে যদি বাঁচতে চাও তো রাক্ষসের সব রহস্য আমাদের জানিয়ে দাও। জানালে তোমাকে মুক্তি দেব।' উদয় বলল।

দাড়িওয়ালা বলল, 'এ তো সর্বনেশে শর্ত। আমি তোদের চাকর হয়ে থাকতে রাজি আছি। গলার মালাটাও দিতে পারি। কিন্তু কোনোক্রমেই রাক্ষসের রহস্য জানাতে পারি না। কারণটা তোমাদের আগেই বলেছি। ওসব রহস্য জানানোর
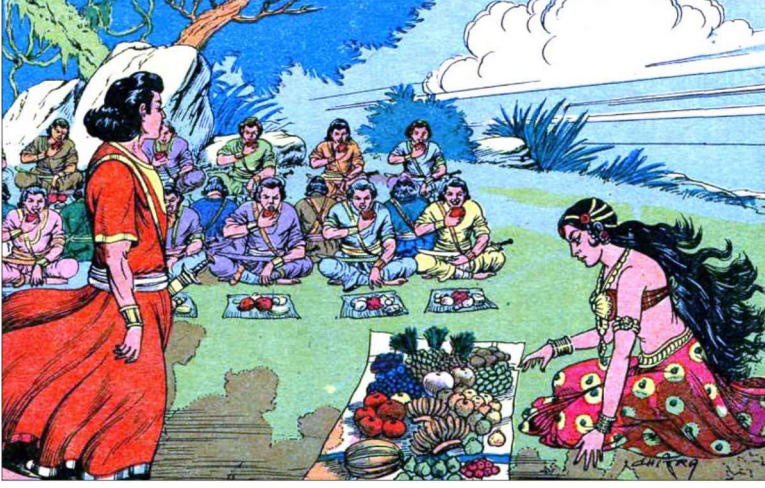
সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। তোমাদের চাকর হয়ে থাকব এ তো আনন্দের কথা। রাক্ষসের চাকর হয়ে আছি, মানুষের চাকর হতে আপত্তি কীসের? তবে তোমরা যখন এতটা জেনেছ তখন বাকিটাও নিজেদের চেষ্টাতেই জেনে যাবে বলে আমার বিশ্বাস।' বলে বেঁটে লোকটা গলার মালা খুলে দিয়ে দিল।

ওই মালাটা নিয়ে উদয় গলায় পরে নিল। সঙ্গেসঙ্গে দাড়িওয়ালা সাধারণ মানুষের রূপ পেল। আর উদয় অবিকল দাড়িওয়ালার মতো হয়ে গেল। এই নতুন রূপ ধারণ করার সঙ্গে সঙ্গে অঞ্জন, ভস্ম ও ঝাড়ন পেয়ে গেল।

আর এক মুহূর্ত ব্যয় না করে উদয় চলে গেল পুকুরঘাটে। সমস্ত হাঁসকে ডাকল। তীরে আসতেই ওরা নিজেদের রূপ পেল। পাথরের মূর্তিগুলোকেও রূপান্তরিত করল। তারপর সবাই মিলে ভালো ভালো খাবার খেল। ঝাড়ন পেতে উদয় যে খাবার চাইল সে খাবারই পেল। যার যে খাবার খেতে ইচ্ছে করল উদয় তাকে সে খাবার খাওয়াল।

সকলের খাওয়া শেষ হলে উদয় দাড়িওয়ালাকে হেঁকে বলল, 'ওহে, শোনো, তুমি এখন আমার চাকর। সেটা মনে আছে তো? আর চাকরের কর্তব্য মনিবের কথা মতো কাজ করা। তুমি এদের প্রত্যেককে যার যার বাড়িতে পৌঁছে দাও।'

বেঁটে লোকটা অবাক হয়ে বলল, 'সেটা কী করে সম্ভব? এখান থেকে এদের নিয়ে যাওয়া কি সহজ কথা? রাক্ষসের চোখে পড়লে আর রক্ষে থাকবে না। তার চেয়ে আরও কিছুকাল যে যেভাবে আছে থাক। এতদিন যখন আছে আরও কিছুদিন পাথরের মূর্তি বা হাঁস হয়ে থাকতে আপত্তি কি?'

বেঁটে লোকটার কথা যমজ ভাইরা ভেবে দেখবে ঠিক করল।

কিছুক্ষণের মধ্যে আবার কিছু পাথরের মূর্তি দেখা দিল আর বাকিরা হাঁস হয়ে পুকুরে ভাসতে লাগল।

অর্থাৎ আগে যে যেখানে ছিল সে সেখানে ফিরে গেল।

এই ঘটনার পরে রাক্ষস চলে এল। রাক্ষস আসছে দেখে উদয় বেঁটে লোকটা ও নিজের দুই ভাইয়ের উপর ভস্ম ছড়িয়ে দিল।

একা উদয় বেঁটে দাড়িওয়ালার রূপ ধারণ করে দাঁড়িয়ে রইল।

রাক্ষস এদিক-ওদিক তাকিয়ে ছদ্মবেশী উদয়কেই দাড়িওয়ালা ভেবে বলল, 'এই বানরগুলো কোথায়?'

'যাবে কোথায়? দিয়েছি ঘাড় মটকে। তিন জনকেই শেষ করে ফেলেছি।' বলল ছদ্মবেশী উদয়।

'ওদের মেরে ফেলে রাখলে কোথায়? ব্যাটারা খুব জ্বালিয়েছে। মেরে ফেলেছ বেশ করেছ। খুব ভালো কাজ করেছ। চল তো কোথায় ফেলে রেখেছ দেখি।' বলল রাক্ষস।

'চল দেখাচ্ছি।' বলে উদয় রাক্ষসকে এক বিরাট কুয়োর কাছে নিয়ে গেল। কুয়োর ভেতরে উঁকি মেরে রাক্ষসকে দেখতে বলল।

ছদ্মবেশী দাড়িওয়ালার কথা সত্য মনে করে রাক্ষস হাঁকপাক করে কুঁয়োতে উঁকি মেরে দেখল। উদয় পরিকল্পনা মতো আগে থেকেই কুয়োর এক কোণে গোপনে একটা তরবারি লুকিয়ে রেখেছিল। কুয়োতে উঁকি মারার সময় ঝট করে তরবারি তুলে রাক্ষসের ঘাড়ে সজোরে কোপ বসিয়ে দিল উদয়। রাক্ষসের কাটা মুণ্ডু কুয়োতে পড়ে গেল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় দেখা গেল পরমুহূর্তেই রাক্ষসের ঘাড়ে আর একটা মুণ্ডু জুড়ে গেছে। আক্রোশে ফেটে পড়ল রাক্ষস। রক্তচক্ষু করে দাড়িওয়ালার ছদ্মবেশী উদয়ের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে রাক্ষস বলল, 'আমার নুন খেয়ে আমাকেই মেরে ফেলার তাল করছিস? যা মর।' বলে উদয়কে তুলে কুয়োতে ফেলে দিল।

তেরো

রাক্ষসটা উদয়কে কুয়োতে ফেলে দিয়ে নিজের পথে চলে গেল। দাড়িওয়ালার রূপ ধরে উদয়কে এক সপ্তাহ ওই কুয়োতেই কাটাতে হয়েছিল। এই এক সপ্তাহের মধ্যে ওই কুয়ো থেকে বেরিয়ে আসার কোনো পথ খুঁজে পেল না। ফলে সন্ধ্যাকুমার ও নিশীথকে দাড়িওয়ালার সঙ্গে যেখানে ছিল সেখানেই থাকতে হল। কারণ, অন্য রূপ ধারণের ভস্ম ইত্যাদি নিয়ে উদয় যে পড়েছিল কুয়োতে।

এই টানা সাত দিন রাজকুমারীরাও হাত গুটিয়ে বসে থাকেনি। সবসময় যে যমজ ভাইদের সঙ্গে দেখা হত তাদের দেখা না পাওয়ায় ওদের মনে নানা প্রশ্ন জাগল। ওরা বুঝল, যমজ ভাইরা নিশ্চয় বিপদে পড়েছে। কী ধরনের বিপদে পড়তে পারে? কোথায় থাকতে পারে? এসব নিয়ে রাজকুমারীরা অনেক বার চিন্তা করল।

তন্নতন্ন করে ওরা আনাচেকানাচে খুঁজল। কুয়োর ভেতরেও ওরা খুঁজেছিল। কিন্তু পাবে কেন? ওরা তো জানত না যে উদয় দাড়িওয়ালার রূপ ধরে কুয়োতে আছে?

কিন্তু ওদিকে উদয়ও সজাগ। রাজকুমারীদের আওয়াজ পেয়ে উদয় চিৎকার করে ডাকল।

কিন্তু উদয়ের সে চিৎকার গভীর কুয়োর বাইরে আর ভেসে এল না।

এত চিৎকার করে ডেকেও যখন কোনো ফল হল না তখন উদয়ের মনে দুশ্চিন্তা হল। একথা-সেকথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার মনে এল একটি কথা। উদয়কে কুয়োতে ফেলে দিয়ে রাক্ষসটা একটি ছোরাও কুয়োতে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল। উদয় সে ছোরা খুঁজে খুব জোরে বাইরের দিকে ফেলে দিল।

উদয়ের ধারণা কুয়োর ভেতর থেকে ওইভাবে ছোরা বেরিয়ে আসতে দেখে রাজকুমারীরা থমকে দাঁড়াবে। কারণ বোঝার চেষ্টা করবে। উদয় যা ভেবেছিল তা হল না। কুয়োর ভেতর থেকে ছোরা ফোয়ারার মতো বাইরে বেরিয়ে এল এবং মাটিতে গেঁথে গেল। কিন্তু সেটা রাজকুমারীদের নজরে পড়ল না।

বেশ কিছুদিন যমজ ভাইদের যমজ রাজকুমারীরা লক্ষ করেছে। যমজ ভাইরা যেমন সাহসী তেমনি তারা ছিল তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন। বুদ্ধি এবং সাহস দেখে রাজকুমারীরা তাদের প্রতি সশ্রদ্ধ হল। তাদের ভক্তি করত। তাদের প্রতি স্নেহও পোষণ করত। হয়তো তাদের ভালোও বাসত।

যে জমজ ভাইরা তাদের রাক্ষসদের কবল থেকে উদ্ধার করার জন্য এগিয়ে এসেছে তাদের প্রতি যমজ রাজকুমারীরাদের টান তো বাড়বেই।

এই টানের জন্যই উদয়কে দেখতে না পেয়ে রাজকুমারীরা উদ্‌বিগ্ন হয়ে

উঠেছিল। ওরা দিনরাত খোঁজাখুঁজি করতে লাগল। এক-একবার ওদের মনে হয়েছিল আর বুঝি ওদের ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে না!

আর মাত্র কয়েকটি যমজ সন্তান পেলেই রাক্ষসটা সবাইকে বলি দেবে। তখন অথবা তার আগে কে তাদের উদ্ধার করবে!

শেষপর্যন্ত হয়তো তাদের এখানেই মারা যেতে হবে।

তাদের বাঁচানোর জন্য আর কেউ কোনোদিন এগিয়ে আসবে না।
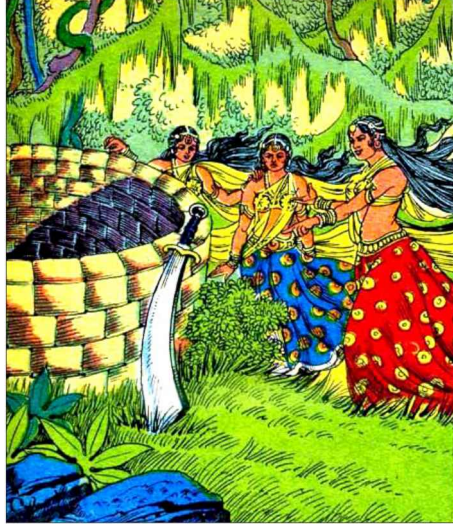
রাজকুমারীরা অবশ্য বারে বারে ওই যমজ ভাইদের খুঁজতে লাগল। আর এক সপ্তাহ পরে ওরা ঘুরে ঘুরে ওই কুয়োর কাছে এল। ওদের নজরে পড়ল ছোরা। এসব জায়গা তো ঘুরেছি। কিন্তু এই ছোরা তো দেখিনি? এখানে এটা এল কোত্থেকে? আচ্ছা এও তো হতে পারে রাক্ষস উদয়কে মেরে ফেলেছে? মেরে কুয়োতে ফেলে দিয়েছে? দেখা যাক কুয়োতে কী আছে।'

ওদিকে উদয় টানা এক সপ্তাহ ধরে ঝাড়ন পেতে বেশি বেশি করে ফল চাইতে লাগল। অসংখ্য ফলে কুয়োটা অর্ধেকের বেশি ভরে গেল। তাই উদয়ও অনেকখানি উঁচুতে এসে গিয়েছিল।

কুয়োতে উঁকি মেরে ফলের উপর দাড়িওয়ালা লোকটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রাজকুমারীরা অবাক হয়ে গেল। দেখতে দেখতে ওরা উদয়ের গলা শুনল। ওদিকে ফল আরও ভরে যাওয়ায় উদয় প্রায় উপরের দিকে এসে গেল। শেষে রাজকুমারীদের হাত ধরে উদয় উঠে পড়ল।

কুয়ো থেকে বেরিয়ে এসে উদয় তার রাক্ষসকে মেরে ফেলার ঘটনা, রাক্ষসের মুণ্ডু উঠে লেগে যাওয়ার ঘটনা এবং শেষে রাক্ষসটা তাকে ফেলে দেওয়ার ঘটনা বিস্তারিত জানাল।

রাজকুমারীরা উদয়কে বলল, 'যাই হোক, ঝাড়ন ব্যবহারের কথা কুয়োর ভেতরে যে মাথায় খেলেছে এটাই সৌভাগ্যের। তা না হলে এই কুয়ো থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব হত কি না কে জানে!'

তারপর সবাই মিলে ওই দাড়িওয়ালা লোকটা, সন্ধ্যাকুমার ও নিশীথ যেখানে
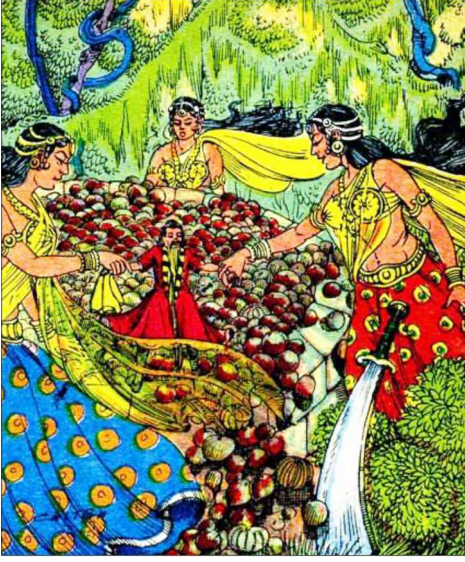
ছিল সেখানে এল। উদয়ের কাছে যে ভস্ম ছিল সেই ভস্ম ছড়ানোর ফলে দাড়িওয়ালা, নিশীথ এবং সন্ধ্যাকুমার নিজের আসল রূপ ধারণ করল।

যা ঘটল তা উদয়ের মুখে শুনে দাড়িওয়ালা বলল, 'তাহলে রাক্ষসের ধারণা সে আমাকেই কুয়োতে ঠেলে দিয়েছে? এতে একদিক থেকে ভালোই হল। আমিও এরপর আমার ইচ্ছেমতো চলতে পারব।'

তখন উদয় বলল, 'তাহলে তো একটা গোলমাল হয়েছে! রাক্ষস কুয়োতে উঁকি মেরে দেখবে সেখানে কেউ নেই। উপরন্তু কুয়োটা ভরে রয়েছে ফলে। এসব দেখে তার মনে সন্দেহ জাগবে না?'

'রাক্ষসটা আসা পর্যন্ত কুয়োটা ওখানে থাকলে তো?' বলল দাড়িওয়ালা।

তারপর ওরা কুয়োর কাছে গিয়ে তার উপর ভস্ম ছড়িয়ে দিল। চোখের পলকে কুয়োটা হাওয়া হয়ে গেল। তার জায়গায় দেখা গেল একটি মাঠ।

তখন উদয় দাড়িওয়ালাকে বলল, 'তোমাকে কিন্তু একটা কাজ করতে হবে। রাজকুমারীদের খুঁজতে বেরিয়ে আমাদের সাত বছর হয়ে গেছে। ওদিকে রাজা ও রানি আমাদের দেখতে না পেয়ে নিশ্চয় খুব উদ্‌বিগ্ন হয়ে আছেন। তাই তুমি অবিলম্বে শ্রাবস্তি নগরে গিয়ে রাজাকে খবর দিয়ে এসো যে আমরা ভালো আছি। আমাদের ফিরে যেতে আর দেরি নেই।'

উদয়ের কথা মতো দাড়িওয়ালা শ্রাবস্তি নগরের দিকে সেই মুহূর্তে রওনা হয়ে গেল।

তার চলে যাওয়ার আগে উদয় ভাবতে লাগল কীভাবে সে এই ভবনের দিকে এল। আর কোথায় তার ঘোড়াকে রেখে এল। কিছুক্ষণ ভেবে দাড়িওয়ালাকে বলল, 'এমনি পায়ে হেঁটে গেলে তো তোমাকে প্রহরীরা রাজপ্রাসাদে ঢুকতে দেবে না। তুমি আমার সাদা ঘোড়াটা যে কোথায় বাঁধা আছে জানো? সেই ঘোড়াকে যদি নিয়ে যাও তাহলে সোজা রাজার কাছে গিয়ে খবরটা জানাতে পারবে।'

উদয়ের কথামতো তার সাদা ঘোড়ায় চড়ে দাড়িওয়ালা রওনা হল। রাজার

যে দু-জন অনুচর সন্ধ্যাকুমার ও নিশীথের ঘোড়া নিয়ে ফিরেছিল তাদের চোখে পড়ে গেল ওই সাদা ঘোড়া। ওরা সোজা বেঁটে লোকটার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কে আপনি? এই সাদা ঘোড়া কোত্থেকে পেলেন? আর এই পথে কোথায় যাচ্ছেন? আমাদের প্রশ্নের সঠিক জবাব না দিয়ে এক পা-ও এগোতে পারবেন না।'

জবাবে দাড়িওয়ালা লোকটা বলল, 'আমি দানশীল মহারাজের কাছে যাচ্ছি। তাঁকে একটি শুভ সংবাদ দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য। ভালো কথা, আপনারা দু-জনে যে দুটো ঘোড়ায় চড়ে আছেন এ দুটো আমি কোথায় যেন দেখেছি।'

'তা দেখে থাকবেন। এখন আমরা জানতে চাই, আপনি দানশীল মহারাজকে কোন সংবাদ দিতে চান?' অনুচর দু-জন জিজ্ঞেস করল।

'আমার সংবাদ হল, রাজকুমারী তিন জন ভালো আছে। আর ওদের খুঁজতে যে যমজ তিন ভাই গিয়েছিল তারাও ভালো আছে।' দাড়িওয়ালা বলল।

'তার আগে আমরা দেখতে চাই কোথায় আছে। আমাদের সে জায়গায় পৌঁছে দিয়ে তারপর আপনি রাজার কাছে যেতে পারবেন।' অনুচররা বলল।

শুনে দাড়িওয়ালা বলল, 'তাহলে তো খুব ভালো হয়। আপনারা ততক্ষণ ওদের পাহারা দেবেন।'

দাড়িওয়ালা ওদের নিয়ে যমজ ভাইদের কাছে রেখে ফিরে গেল।
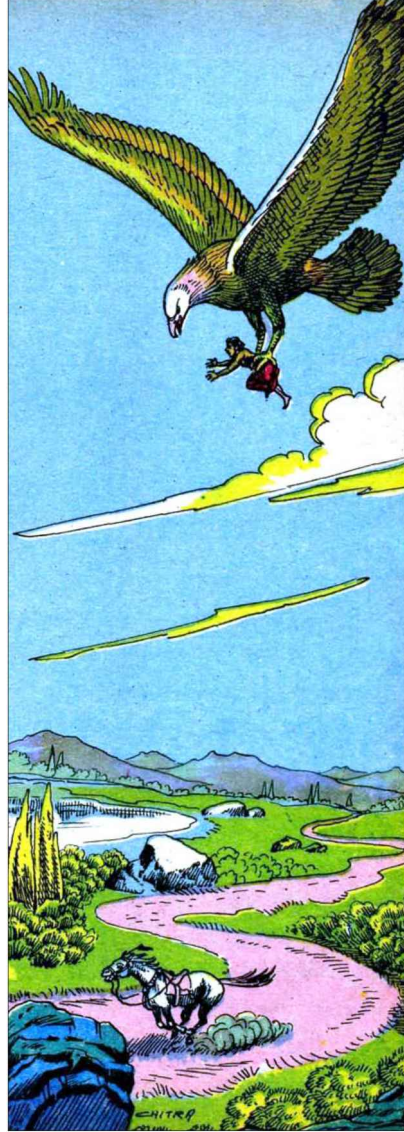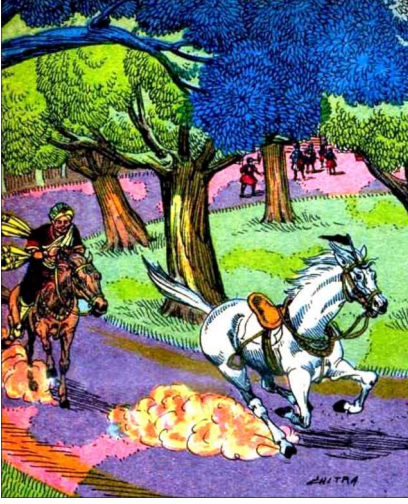
ফেরাপথে হঠাৎ সেই অশুভ ঝড় উঠল। দাড়িওয়ালা বুঝতে পারল এই ঝড় প্রকৃতির ঝড় নয়। রাক্ষস আসছে। তাই সে নিজের ঘোড়া ঝড়ের বেগে ছোটাল। কিন্তু রাক্ষসটা দাড়িওয়ালাকে ছাড়ার পাত্র নয়।

সে ঘোড়ার উপর থেকে দাড়িওয়ালাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল।

ঘোড়া কিন্তু ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে সাত দিন পরে শ্রাবস্তি নগরে পৌঁছাল। সাদা ঘোড়াকে রাজপ্রাসাদের দিকে আসতে দেখে রাজা দানশীল ঘোড়াটিকে অন্দরমহলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ঘোড়া যেতে চাইল না। তার গোঁ দেখে রাজা বুঝলেন ঘোড়ার এই যেতে না চাওয়ার পেছনে কোনো কারণ আছে।

রাজা অনুচরদের বললেন, 'নিশ্চয় উদয় বিপদে পড়েছে। তা না হলে তার ঘোড়া এভাবে এখানে আসতে পারে না। ঘোড়ার ইচ্ছে সে যে পথে এসেছে সেই পথে ফিরে যাওয়া। তাই তোমরা সবাই একে অনুসরণ করে ঘোড়াটি কোথায় যায়, কী করে লক্ষ করবে।' রাজার কথা শেষ হতে-না-হতেই ঘোড়া এগিয়ে গেল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সেটা হঠাৎ ফিরে এল রাজার কাছে। সে যেন যেতে চায় না। ঘোড়ার এই আচরণ দেখে রাজা অনুচরদের বললেন, 'মনে হচ্ছে এত লোকের যাওয়ার প্রয়োজন নেই। অন্তত ঘোড়া সেটা চাইছে না। তাই আমার ইচ্ছে এই ঘোড়াকে অনুসরণ করে শুধু মন্ত্রী যাক।'

রাজার নির্দেশে অনুচররা ফিরে গেল। মন্ত্রী গেলেন ঘোড়ার সঙ্গে।

* * *

ওদিকে যমজ ভাইরা মহা দুশ্চিন্তায় পড়ল। রাজকুমারীরাও নিশ্চিন্ত হতে পারল না। কারণ দাড়িওয়ালা ফেরেনি। এতদিনে ফেরার কথা। কত রকমের হিসেব করল কিন্তু কিছুতেই কিছু মেলে না।

দাড়িওয়ালা ভেবেছিল সে রাক্ষসের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে। তাই নিশ্চিন্তে তার নতুন প্রভু উদয়ের কথামতো চলে গেল। গেলে কী হবে রাক্ষসের কবলে তাকে পড়তেই হল। দাড়িওয়ালা গেল ডালে ডালে রাক্ষস গেল পাতায় পাতায়। ঘোড়া ছুটিয়ে গেল দাড়িওয়ালা, রাক্ষস ধরল বাজ পাখির রূপ।

অবশেষে যমজ ভাইদের মধ্যে সেই উদয়কেই রওনা হতে হল। সমস্ত কাজে সেই উদয়কেই রওনা হতে হয়। ওদের মধ্যে উদয়ের উপস্থিত বুদ্ধি তীক্ষ্ণ। যেকোনো বিপদ থেকে নিজেকে মুক্ত করার বুদ্ধি এবং ক্ষমতা তার ছিল। তাই সে-ই রওনা হয়ে গেল। রাজকুমারী এবং অন্যদের অপেক্ষার পালা শুরু হল। কেউ জানে না শেষ পর্যন্ত কী হবে।

শেষে উদয় বলল, 'আমার মনে হচ্ছে দাড়িওয়ালা বিপদে পড়েছে। আমি ঝট করে শ্রাবস্তি নগরে ঘুরে আসি। ভস্মটা তোমাদের কাছেই থাক। প্রয়োজন হলে ব্যবহার করবে।'এই কথা বলে কিছুটা সাদা ভস্ম ও কিছুটা কালো ভস্ম ওদের কাছে রেখে উদয় শ্রাবস্তি নগরে রওনা হল।

যাওয়ার সময় মাঝে একটা অন্য দেশ পড়ল। উদয় লক্ষ করল, এক অন্ধ লাঠি নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এক গর্তে পড়ে গেল। তা দেখে উদয় সেই অন্ধকে গর্ত থেকে তুলে ফেলল। তারপর তার চোখে অঞ্জন লাগাল। অন্ধ তার চোখ ফিরে পেল। অন্ধের অনুরোধে উদয়কে তার বাড়িতে যেতে হল। পরে জানতে পারল, বৃদ্ধ অন্ধটি সেই দেশের রাজার অনুচরের বাবা। দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসায় খুব খুশি হয়ে বৃদ্ধ উদয়কে রাজার কাছে নিয়ে গেল।

অন্ধ দেখতে পেল। তার চোখে আলো ছিল না। সে যখন দেখতে পেল তখন মহানন্দে উদয়কে তার দেশে থেকে যেতে বলল।

রাজা উদয়কে বললেন, 'তোমার মতো বৈদ্যকে আমি জীবনে দেখিনি। তোমাকে অনুরোধ করছি তুমি আমার দেশে থেকে যাও।'

জবাবে উদয় বলল, 'মহারাজ, আপনার আমন্ত্রণ আমার কাছে গৌরবের। তবে এখন আমি বিশেষ একটি কাজে বেরিয়েছি। কাজ হয়ে গেলে আপনার কাছে আসব।'

উদয়ের কথা শুনে রাজা খুব খুশি হলেন। তারপর উদয় এক সপ্তাহ পরে শ্রাবস্তি নগরে পৌঁছাল।

উদয়কে দূর থেকে দেখেই রাজা এগিয়ে এলেন। উদয় রাজাকে সব খবর

বলল। পরে রাজাকে ভরসা দিয়ে উদয় বলল, 'আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন, আর কিছুদিনের মধ্যেই আপনার তিন মেয়েকে নিয়ে আমরা তিন ভাই ফিরছি।'

উদয়ের কথা শুনে রাজা নিশ্চিন্ত হলেন। রানিও খুশি হলেন।

পরের দিন রাজার কাছে বিদায় নিয়ে উদয় সেই ভবনের দিকে রওনা হয়ে গেল।

শ্রাবস্তি নগর থেকে বেরিয়ে উদয় এক সপ্তাহের মধ্যে ওই জাদুর ভবনে পৌঁছে গেল। সেখানে পৌঁছে সে যা দেখল, তাতে সে ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। এ ধরনের ভয়ংকর দৃশ্য যে সে দেখবে তা সে ভাবতে পারেনি।

উদ্যানের গাছের ডালে গলায় ফাঁসি দেওয়ার পাঁচটি দড়ি ঝুলছে। সন্ধ্যাকুমার, নিশীথ, দাড়িওয়ালা এবং শ্রাবস্তি থেকে আসা দু-জন অনুচরদের হাত-পা শক্ত করে বাঁধা আছে। আর ওদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে স্বয়ং রাক্ষস। রাক্ষসটা এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেন শিকারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে বাঘ।

চোদ্দো

উদয় সেই ভয়ংকর দৃশ্য দেখে ভয়ে কাঁপতে লাগল। তার মাথায় কোনো বুদ্ধি খেলল না। অন্য কোনো রূপ ধরে তাদের বাঁধন খুলে যে নাবাবে তারও উপায় ছিল না। কারণ শ্রাবস্তি থেকে ফেরার পথে অনেকখানি সাদা ভস্ম নষ্ট হয়ে গেছে। যেভাবে পাঁচ জনকে ঝোলানোর ব্যবস্থা হয়েছে তা দেখে ওরা বেশিক্ষণ বাঁচবে বলে মনে হচ্ছিল না। হয় মনে মনে মরে গেছে না হয় কিছুক্ষণের মধ্যে মরে যাবে। এ দৃশ্য দেখেও উদয়কে আড়ালে দাঁড়াতে হল। এক এক মুহূর্ত মনে হচ্ছে এক-একটা যুগ।

পরক্ষণেই ওদের গলায় দড়ি পরিয়ে রাক্ষস ওদের মেরে ফেলার শেষ ব্যবস্থা করে ফেলল। সব ঠিকঠাক। একটি দড়ি ধরে টানার সঙ্গেসঙ্গে পাঁচ জনেই মরে যাবে। এমন সময় একটি গর্জন শোনা গেল, 'দাঁড়াও।'

উদয় অবাক হয়ে ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকাতে লাগল। একবার মনে হল চিৎকারটা তার মুখ দিয়েই বেরিয়ে এসেছে? না তা কেন হবে! তার ঠোঁট তো শুকিয়ে গেছে। তার শরীর তো কাঠ হয়ে গেছে। তবে কি সেই দাড়িওয়ালা পৌঁছে গেছে! আবার শোনা গেল সেই দাড়িওয়ালার কণ্ঠস্বর, 'এদের বাঁচানোর জন্য এতদিন একটি গোপন ব্যাপার তোমার কাছে লুকিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারলাম না। সত্য ঘটনা তোমাকে জানাতেই হচ্ছে। এতকাল তোমাকে আর আমাকে যে তিন জন বোকা বানিয়ে এসেছে সেই তিনটি ছেলে কিন্তু যমজ।'

যজম শব্দটি কানে যেতেই রাক্ষস দাড়িওয়ালার দিকে তাকিয়ে বলল, 'অসম্ভব। যমজ হলে আমি ঠিক টের পেতাম। আমার চোখে কোনো যমজ সন্তান ফাঁকি দিয়ে বাঁচতে পারে না।'

তারপর দাড়িওয়ালা বলল, 'তোমার নজরে পড়েছিল ঠিকই তবে বিশেষ কারণে তোমার নজর এড়িয়ে গেছে। তুমি দেখেও দেখনি। কারণ এদের খুঁত ছিল। এরা চব্বিশ ঘণ্টা তাকাতে পারত না। দেখতে পেত না। দিনে একজন, সন্ধ্যায় একজন এবং রাত্রে একজন দেখতে পেত।' এই ভাবে উদয়, নিশীথ ও সন্ধ্যাকুমার সম্পর্কে সে বিস্তারিত জানাল।

দাড়িওয়ালার কথা রাক্ষসটা হাঁ করে শুনছিল। যা শুনল তাই তার কাছে নতুন মনে হল। অবিশ্বাস্য মনে হল।

সব কথা শুনে রাক্ষস বলল, 'তাহলে আর আমি খেটে মরছি কেন? আমার তো পঞ্চাশ জন যমজ হয়ে গেছে। তুমি যা বলছ ঠিক বলছ তো? দাঁড়াও ওদের আগে জিজ্ঞেস করি ওরা যমজ কি না।' বলে রাক্ষস সন্ধ্যাকুমার ও নিশীথের দিকে ঘুরে বলল, 'দেখ, তোমরা যদি সত্যি কথা না বল তাহলে কোনো ক্রমেই বাঁচতে পারবে না। আর যদি সত্যি তোমরা যমজ হয়ে থাক তাহলে তোমাদের এই মানব জীবন সার্থক হয়ে উঠবে। তোমরা মহৎ উদ্দেশ্যে জীবন দান করার সুযোগ পাবে। তাতে তোমাদের ইহকাল এবং পরকাল উদ্ধার হবে।'

তৎক্ষণাৎ সন্ধ্যাকুমার ও নিশীথ বলল, 'সত্যিই আমরা যমজ।' ওদের চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল।

আড়ালে দাঁড়িয়ে উদয় সব কিছু দেখছিল। মনে মনে সে নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছিল। সে খুব সহজেই দাড়িওয়ালাকে মেরে ফেলতে পারত। দাড়িওয়ালা যে এ ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা করবে তা সে ভাবতেই পারেনি।

রাক্ষসের গলা শুনে উদয়ের চিন্তায় ছেদ পড়ল।

'তাহলে তৃতীয় জন কোথায়? ওকে না পেলে তো কোনো কাজই হবে না।' দাড়িওয়ালাকে জিজ্ঞেস করল।

দাড়িওয়ালা বলল, ‘তৃতীয় জন বাড়ি গেছে। এক সপ্তাহ হয়ে গেল এখনও ফেরেনি। ইতিমধ্যে ফেরার কথা। ফিরলেই দেখতে পেতাম। হয়তো পথে বিপদে পড়েছে।’

‘তাহলে আর দেরি করার দরকার হবে না। আমি যাব আর যেখান থেকে পারি ধরে নিয়ে আসব। তাই বলে ভেব না যে তোমাকে আমি এক্ষুনি ছেড়ে দিচ্ছি। তোমাকে আর বিশ্বাস করছি না।’ বলে রাক্ষস ওই পাঁচ জনকে পাঁচটি গাছের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে দিল।

তারপর ওই রাক্ষসটা বাজ পাখির রূপ ধরে উড়ে গেল।

রাক্ষসের উড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উদয় দাড়িওয়ালার কাছে গিয়ে তাকে মেরে ফেলার জন্য অস্ত্র তুলল।

‘আরে থাম! থাম! আমাকে মেরে ফেললে তোমাদের সর্বনাশ হবে। শান্ত হয়ে আগে আমার কথা শোনো। তারপর তোমার যদি মেরে ফেলার ইচ্ছে জাগে মেরে ফেলো।’ দাড়িওয়ালা বলল।

‘শুনব আবার কি? যা শুনেছি তাই যথেষ্ট। তোমাকে সেদিন মেরে ফেলিনি, ভুল করেছি। তোমার মতো বিশ্বাসঘাতককে মেরে ফেললে কোনো পাপ হবে না।’ উদয় রেগে গিয়ে বলল।

‘তুমি যে আমার উপর রেগে গেছ তা বেশ বুঝতে পারছি। তবু বলব, আগে আমার কথা শোনো। যে অবস্থায় পড়েছিলাম, আমি না পড়ে যদি তুমি পড়তে তুমিও আমার কথাই বলতে। আমি ওই কথা না বললে রাক্ষস এখান থেকে এক পাও নড়ত না। এতক্ষণে আমরা সবাই মরে যেতাম। এখন আগামী কাল পর্যন্ত আমরা যে সময় পেয়েছি এটা আমাদের কপাল জোর বলতে হবে।’ দাড়িওয়ালা বলল।

তার কথা শুনে উদয় প্রথমে অবাক হল। তারপর বুঝল দাড়িওয়ালা যা করেছে ঠিক করেছে। তা না করলে সত্যি মারাত্মক বিপদ ঘটে যেত।

উদয়কে ভাবতে হল দাড়িওয়ালার কথা। অস্ত্র নাবাল। বলল, 'কিন্তু একদিনে আমরা কি করতে পারি? কাল সকাল হতে-না-হতেই হয়তো রাক্ষসটা এসে যাবে। তখন বাঁচব কী করে?'

জবাবে দাড়িওয়ালা বলল, 'সব কথা ভেবেছি। যেভাবে ভেবেছি তাতে সকলের সামনে সব করা যাবে। আগে সকলের বাঁধন খোল।'

উদয় সকলের বাঁধন খুলে দিল। পরে সবাই পুকুরের কাছে গেল। ওদের দেখে রাজকুমারীরা পুকুর পাড়ে উঠে এল। দাড়িওয়ালা উদয়কে বলল, 'কই লাল অঞ্জনটা দাও তো?'

লাল অঞ্জন হাতে পেয়ে সে রাজকুমারীদের কাছে ডাকল। প্রথমে সুহাসিণীর কাঁধে লাগাল। মুহূর্তে তার একটি হাত লোপট হয়ে গেল। তারপর সুভাষিণীকে কাছে ডেকে তার পায়ে অঞ্জন লাগিয়ে দিল। সঙ্গেসঙ্গে তার পা হাওয়া হয়ে গেল। শেষে সুকেশিণীর চোখে অঞ্জন লাগিয়ে দিল। চোখের পলকে তার চোখ দুটো অন্ধ হয়ে গেল। ফলে তিন রাজকুমারীর অঙ্গহানি হল।

উদয় আর সহ্য করতে না পেরে বলে উঠল, 'একি করছ তুমি?'

'নাঃ, তুমিও দেখছি আর চারজনের মতো সাধারণ মানুষ। সব কিছুকেই সন্দেহ করছ। আগে দেখ, বোঝার চেষ্টা কর। না থাক তোমাকে বলেই ফেলি।' বলে দাড়িওয়ালা উদয়ের কানে কানে কিছুক্ষণ কী যেন বলল।

উদয় তবুও প্রশ্ন না করে পারল না, 'কিন্তু রাক্ষসটা কী ভাববে? এতকাল রাজকুমারীদের যে অবস্থা দেখে এসেছে আজ রাতারাতি বদলে গেলে তার বিশ্বাস হবে কেন?'

'কালকে দেখলেই বুঝতে পারবে। কালকে ও যখন আসবে তখন আমরা যথারীতি গাছে বাঁধা অবস্থায় থাকব। তুমি কিন্তু ভস্ম ছড়িয়ে অদৃশ্য রূপ ধরে সব কিছু লক্ষ রাখবে।' দাড়িওয়ালা দৃঢ় বিশ্বাসে বলল।
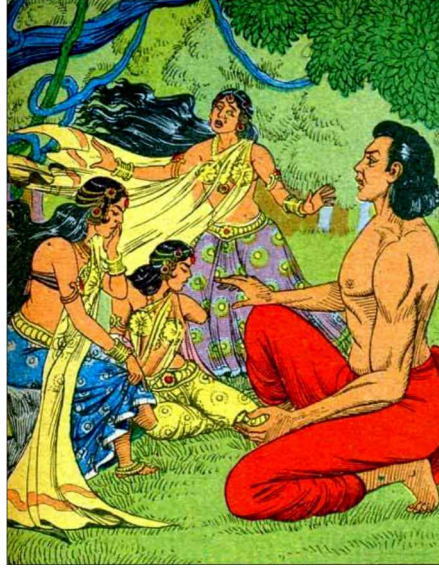
উদয় বলল, 'আরে ওই ভস্ম কি আর আমার কাছে আছে। শ্রাবস্তি নগরে যেতে আসতেই সব শেষ হয়ে গেছে। যাও একটু ছিল সেটাও কোথায় যেন হারিয়ে গেছে।'

'আমাদের কাছে যেটা দিয়ে গিয়েছিলে সেটা তো আছে। ভাবনা কীসের?' দাড়িওয়ালা এই কথা বলে ভস্ম তার হাতে দিয়ে দিল।

উদয় তার কথামতো সবাইকে গাছের সঙ্গে বেঁধে নিজে অন্যরূপ ধারণ করে রাক্ষসের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

পরের দিন সাতসকালে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যাওয়ার মতো শব্দ শোনা গেল। পরমুহূর্তেই রাক্ষস এসে গেল। এসে দেখল সবাই সে ভাবেই আছে। কিন্তু পরমুহূর্তে দেখা গেল দু-জন রাজ অনুচর এল। আর তাদের পেছনে আরও বহু লোক। ওদের চোখে-মুখে উৎসবের আনন্দ। রাক্ষস ওদের এক-এক জনকে ডেকে এক-একটা কাজের ভার দিয়ে দিল। জোরে জোরে বলল, 'এদের প্রত্যেককে ওই পুকুরের জলে চান করিয়ে ঠিকঠাক করে আমার কাছে নিয়ে আসবে।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল, রাক্ষসের সঙ্গে যারা এসেছিল তারা প্রত্যেকেই এক-একটা কাজ করছে। নিশীথ, সন্ধ্যাকুমার প্রমুখদের চান করিয়ে, পোশাক পরিয়ে রাক্ষসের সামনে ওদের দাঁড় করিয়ে দিল। এক-এক জনকে দাঁড় করানোর সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষস তার নাম-ধাম বলছে আর মনে মনে মিলিয়ে নিচ্ছে। ছেলেদের পর মেয়েদের এনে দাঁড় করানো হল।

রাক্ষসের সে কী আনন্দ। তার সামনে দাঁড় করানো রাজকুমার রাজকুমারীদের সে বলল, 'তুমি কনকপুরের রাজকুমারী না? আর তুমি তো অবন্তীর অপূর্ব সুন্দরী কন্যা! তাই না? তুমি তো মণিপুরের রাজকুমার। ঠিক বলেছি?'

ওরা জবাব দেবে কি, শুধু ঘাড় নাড়াল। ওদের চোখে জল। ওরা কেউ মাথা তুলতে পারছিল না।

ইতিমধ্যে এক পরিচারিকা অন্য এক রাজকুমারীকে এনে বলল, 'একি হল? অন্ধ রাজকুমারীকে ধরে এনেছেন? একে দেবী গ্রহণ করবেন?'

রাক্ষস থতমত খেয়ে বলল, 'কি বললে? অন্ধ?' বলে রাজকুমারীকে পরীক্ষা করতে যাবে এমন সময় অন্য এক পরিচারিকা আর এক রাজকুমারীকে ধরে এনে বলল, 'একি করলেন? একটা খোঁড়া রাজকুমারীকে দেবীর কাছে বলি দেবেন? দেবী গ্রহণ করবেন?' বলে পরিচারিকা খোঁড়া রাজকুমারীকে নিয়ে সোজা রাক্ষসের সামনে এসে দাঁড়াল।

রাগে রাক্ষসের চোখ দিয়ে যেন আগুনের ফুলকি ঠিকরে বেরোচ্ছিল। চিৎকার করে বলে উঠল, 'বেইমান! নিশ্চয় আমার সঙ্গে কেউ বেইমানি করেছে।'

'এ আমি কাকে চান করালাম! এ রাজকুমারীর যে হাত নেই?' বলতে বলতে পারিচারিকা অন্য এক রাজকুমারীকে নিয়ে হাজির হল।

রাক্ষসের রাগের আগুনে যেন ঘি পড়ল। সে তৎক্ষণাৎ দাড়িওয়ালার কাছে গিয়ে বলল, 'কী ব্যাপার? উঁ? আমি নিখুঁত রাজকুমার ও রাজকুমারীদের এনেছি। রাতারাতি একি হল? কেউ কানা, কেউ খোঁড়া, আবার কেউ হাতকাটা। ঠিক করে তাড়াতাড়ি বল। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারব না। দেরি করলেই তোমাকেই বধ করব।'

দাড়িওয়ালা গম্ভীর গলায় বলল, 'আমার উপর চোটপাট দেখিয়ে কোনো লাভ হবে না। তোমার তো সন্দেহ আমি এসব করেছি? একটু স্থির হয়ে দাঁড়াও। আমি যা বলছি ধৈর্য ধরে শোনো। আমার কথা শোনার পর তোমার যা ইচ্ছে তাই করো?'

'শুনব আবার কি। এদিকে আমি সমস্ত ব্যবস্থা করে ফেলেছি। হঠাৎ দেখি এই অবস্থা। যা বলার তাড়াতাড়ি বল।' বলতে বলতে রাক্ষস গাছটাকে মাটিতে ফেলে দিল।

'ওরা যে কী করে হাত, পা, চোখ হারাল তা জানি না। তবে অনুমান করতে পারি। এই সব একমাত্র উদয় করতে পারে। আমি যখন ওই যমজ ভাইদের কাছে বে-কায়দায় পড়েছিলাম, তখন অঞ্জন টঞ্জন সম্পর্কে মুখ ফসকে বলে ফেলেছিলাম। আজ না হোক কাল, কাল না হোক পরশু উদয় তোমার হাতে ধরা পড়বেই। ওর কাছেই ভস্ম অঞ্জন সব থাকতে পারে। ধরা পড়ার পর উদয়কে দিয়েই এসব ঠিকঠাক করে নেওয়া যেতে পারে। তখন আর কারো খুঁত থাকবে না। যতক্ষণ না তুমি উদয়কে পাচ্ছ ততক্ষণ, আমার অনুরোধ এই দু-জনকে বেঁধে রাখ। আমার পরামর্শ আমি দিলাম। এখন তোমার যা ইচ্ছে তাই কর।' দাড়িওয়ালা বলল।

'ঠিক আছে ওকে আমি হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে যাব। কিন্তু ততক্ষণ তোমাদের কাউকেই ছাড়ছি না।' বলে রাক্ষস সবাইকে বেঁধে রাখল একটি দড়ি দিয়ে। ওরা সব একসঙ্গে বাঁধা রইল।

উদয় সবই লক্ষ করছিল। এদিকে রাক্ষস একটি গাছ ধরে খুর জোরে নাড়ল। অসংখ্য পাতা ঝরে পড়ল। পাতা সরিয়ে একটি দরজা খুলে সে নিশীথ, সন্ধ্যাকুমার ও দাড়িওয়ালা প্রমুখদের ওই দরজা দিয়ে ঠেলে দিল। তারপর চলে গেল পুকুরের ধারে। সেখানকার পাহারাদারদের ধমক দিল। তারপর খুঁতযুক্ত রাজকুমারী সুহাসিণী, সুভাষিণী ও সুকেশিণীকে নিয়ে রাক্ষসটা বাজ পাখির রূপ ধরে উড়ে গেল।

পনেরো

উদয় নিজেকে আড়ালে রেখে ভাবতে লাগল কী করা যায়। পাতালভবনে গিয়েও লাভ নেই। কারণ রাজকুমারীরা আগেই জানিয়েছে সেখানে ভস্ম দিয়ে কোনো কাজ হয় না। তবু উদয়ের ইচ্ছে করল ওই ভবনে ঢুকে একবার পরীক্ষা করে দেখার।

উদয় সন্ধ্যাকুমার ও নিশীথের চেয়ে সাহসী ও বিচক্ষণ। রাক্ষস ভবনে ঢোকার আগে থেকে সে বার বার তার বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছে। যেকোনো নতুন পরিস্থিতি তাকে ভয় পাওয়াতে পারেনি। কোনো অবস্থাতেই তাকে ভীত মনে হয়নি। সে বিরাট চওড়া খাল পেরিয়েছে, সে তার দুই ভাইকে পদে পদে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছে। তার কাছেই গোঁফওয়ালা বেঁটে লোকটা জব্দ হয়েছে।

এক জায়গায় অনেক লতাপাতা পড়ে ছিল। উদয় সেগুলো সরালো। সরাতেই তার নজরে পড়ল একটি সিঁড়ি। সিঁড়ি বেয়ে নাবতে লাগল। দশ পা নাবতেই তার রূপ বদলে গেল। সে পেল নিজের রূপ। এতে সে ঘাবড়ে গেল না। থেমে গেল না সেখানেই। আরও দশ পা নাবল। কিন্তু আর তার পা এগোতে পারল না। সামনেই দেখতে পেল দু-টি ভয়ংকর সিংহ। আর সেই দুই সিংহের গলা জড়িয়ে রয়েছে দু-টি বিরাট সাপ। এই দৃশ্য দেখে সে সোজা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এল। সঙ্গেসঙ্গে সে আগের রূপ ধারণ করল।

সেখান থেকে উদয় গেল সেই পুকুরের কাছে। পুকুরের চারদিকে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছিল। রাক্ষস পরিবারের সকলে সেখানে পাহারা দিচ্ছিল। রাজকুমারীদের নিয়ে কখন যে রাক্ষস পালিয়ে গেছে তা সে বুঝতেই পারেনি। গুনে দেখল পুকুরে আটচল্লিশটা হাঁসের পরিবর্তে পঁয়তাল্লিশটা হাঁস আছে। আবার সে দুশ্চিন্তায় পড়ল। নিশ্চয় ওই তিন রাজকুমারীর কোনো বিপদ ঘটেছে! কী ঘটতে পারে? কাকে জিজ্ঞেস করলে আসল ঘটনা জানা যাবে? এখন নিজের রূপ ধরলে রাক্ষস দলের কেউ-না-কেউ দেখে ফেলবে। কী করা যায়! কোনোরকমে হাঁসের রূপ ধরে পুকুরে নাবতে যাওয়ারও বিপদ আছে। কারণ পুকুরের চারদিকে আগুন জ্বলছিল।
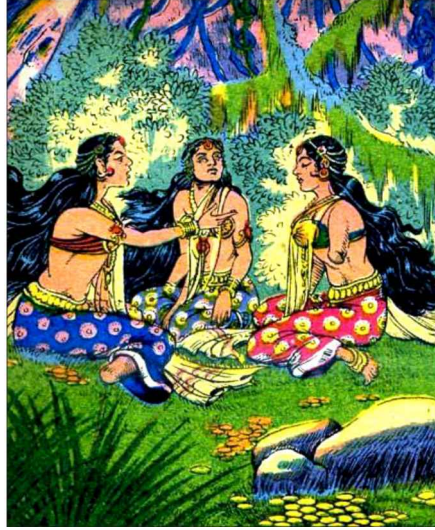
ইতিমধ্যে রাক্ষস বাজ পাখির রূপ ধরে সুহাসিণী, সুভাষিণী ও সুকেশিণীকে নিয়ে এক গভীর অরণ্যে গিয়েছিল। সেখানে ওদের নাবিয়ে দিল। পাছে ওরা কথা বলতে পারে সেই ভয়ে সে ওদের বোবা করে দিল। রাক্ষস ভেবেছিল কোনো না কোনো ভাবে এই রাজকুমারীরা অরণ্যের বাইরে বেরিয়ে পড়বে। অন্যদের জানিয়ে দেবে সব কিছু। লোকে জানতে পারলে হয়তো একদিন তার বিপদ ঘটতে পারে।

মানুষের যমজ সন্তানদের অপহরণ করেছে রাক্ষস। মানুষের চোখে ধুলো দিতে তাকে অনেক বার অনেক কৌশল করতে হয়েছে। সে জানে মানুষের সন্তান কখন কী করে।

বোবা হয়ে দুই রাজকুমারী পরস্পরের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকাতে লাগল। কোনোরকমে অরণ্যের বাইরে যাওয়াও সহজ ছিল না। কারণ সুভাষিণীর পা নেই। সুকেশিণীর চোখ নেই। এদের নিয়ে সুহাসিণী এগোবে কী করে?

সৌভাগ্যবশত সেই অরণ্যে শিকার করতে এসেছিলেন এক রাজা। অমন সুন্দর রাজকুমারীদের অঙ্গহানি দেখে রাজা অবাক হলেন।

রাজা ওদের কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমরা কারা? এই অরণ্যে এলে কেন?’ কিন্তু রাজকুমারীরা রাজাকে কোনো জবাব দিতে পারল না।

রাজা লক্ষ করলেন, ওরা মূক। ওদের কথা বলার ক্ষমতা নেই। দুঃখ পেলেন তিনি। কিন্তু রাজকুমারীরা হাত নেড়ে মাথা নেড়ে নিজেদের অবস্থা বোঝানোর চেষ্টা করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে রাজা ওদের বললেন, 'দেখ মেয়েরা, তোমাদের দেখে মনে হচ্ছে তোমরা কোনো অভিজাত পরিবারের মেয়ে। কোনো দুর্ঘটনা বশত তোমরা এখানে পড়ে আছ। তবে আর তোমাদের কোনো ভয় নেই। আমি তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যাব। তোমরা নিজেদের বাড়িতেই যত আরামে ছিলে আমার বাড়িতেও তত আরামে থাকতে পারবে। আমি মালব দেশে রাজা। আমার নাম প্রতাম সিংহ। হয়তো তোমরা আমাকে নামে চেনো।' এ ছাড়াও আরও অনেক কথা বলে রাজা রাজকুমারীদের মনে সাহস জোগালেন। রাজার কথা শুনে রাজকুমারীদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ওরা যে বিরাট বিপদে পড়েছিল তার থেকে উদ্ধার পাওয়ার আশা পেল।

রাজা ওই তিন কন্যাকে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে রওনা হয়ে গেলেন।

অনেকক্ষণ পরে সুহাসিনী, সুকেশিণী ও সুভাষিণীকে নিয়ে রাজা নিজের প্রাসাদে পৌঁছে গেলেন। প্রাসাদে পা রেখেই তিনি রাজকুমারীদের সম্পর্কে কীভাবে সব কিছু জানা যায় তা যেকোনোভাবে আবিষ্কার করতে অনুচরদের বললেন।

পণ্ডিতরা বসে অনেক পরিকল্পনা করে নানা দিক ভেবে শেষে একটি পদ্ধতি গ্রহণ করল। ওদের ধারণা ওরা যে পদ্ধতি ভেবেছে সেই পদ্ধতিতে রাজকুমারীদের পূর্ব ইতিহাস জানা যাবে। অনেকখানি বালি এনে রাজকুমারীদের

সামনে ফেলে সুহাসিণীকে একজন পণ্ডিত ইশারায় ডাকলেন। হাত দিয়ে লিখে জানানোর ইঙ্গিত করলেন। সুহাসিণী মাথা নীচু করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ইশারায় জানাল যে ওরা লেখাপড়া করার সুযোগ পায়নি।

পণ্ডিতদের অনেক আশা ভরসা ছিল। ওরা ভেবেছিল বালির উপর লিখিয়ে ওরা রাজকুমারীদের সমস্ত পরিচয় পেয়ে যাবে। কিন্তু সব মাটি হয়ে গেল।

সব দেশের পণ্ডিতদেরই চিন্তাভাবনার একটা পদ্ধতি থাকে। কোনো কোনো রাজার পণ্ডিতরা পাখির পেটে বড়ো বড়ো গ্রন্থ কুচি কুচি করে কেটে পুরে দিয়েছে। উদ্দেশ্য পাখিকে পণ্ডিত করে তোলা। বিশেষ করে যেসব পণ্ডিত রাজাদের কাছাকাছি থাকে তারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অবাস্তব পরিকল্পনা করে থাকে। এখানেও রাজকুমারীরা লেখাপড়া জানে কি না তা জানার আগেই তাদের সামনে বালি ছিটিয়ে দিল পণ্ডিতরা।

একজন পণ্ডিত রাজাকে বললেন, 'মহারাজ, আমরা ভেবে যা করেছি তাতে কোনো ফল হল না। আমরা অন্য কোনো পথ এক্ষুনি খুঁজে পাচ্ছি না। আমরা লজ্জিত মহারাজ!'

পরে রাজা প্রতাপসিংহ পরিচারিকাকে ডেকে ওই তিন রাজকুমারীকে দেখাশোনার ভার দিয়ে বললেন, 'এদের অন্তপুরে এমনভাবে রাখবে যাতে কোনো কিছুর কষ্ট না হয়। সবসময় সজাগ থাকবে। এদের যেন একটুও অসুবিধা না হয়।'

তারপর থেকে সুহাসিণী, সুভাষিণী ও সুকেশিণী রাজভবনে অন্তঃপুরে ভালোভাবেই দিন কাটতে লাগল।

* * *

শ্রাবস্তি নগরে যাওয়ার পথে উদয় এক অন্ধের চোখে আলো ফুটিয়েছিল। সেই অন্ধ উদয়কে তাদের দেশে থেকে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিল। রাজাও একই অনুরোধ জানিয়েছিল উদয়কে। আজ সেই রাজাই শিকারে গিয়ে পেলেন তিন রাজকুমারীকে। রাজকুমারীদের ওই বিকলাঙ্গ অবস্থা দেখে রাজা প্রতাপ ভেবেছিলেন, অন্ধের চোখে যে আলো ফুটিয়েছিল সে তো একদিন ফিরে আসবেই। তখন তাকে বলে এই মেয়েদের মূক মুখে ভাষা ফোটানো যাবে।

দিন সাতেক পরেই রাজা প্রতাপ সিংহের কাছে উদয় এল। তাকে দেখেই প্রতাপ সিংহ ভাবলেন উদয় এবার নিজের কথা রাখতে এসেছে। রাজা ভেবে খুব খুশি হলেন। উদয়কে দেখেই বললেন, 'দেখ আমি নিশ্চিত ছিলাম যে তুমি আসবে। তোমার আসাতে খুব আনন্দিত হয়েছি। তারপর কী খবর? আমার এখান থেকে যাওয়ার পর কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি তো?'

রাজার এই প্রশ্নের জবাবে উদয় বলল, 'মহারাজ, আমি যে কাজে বেরিয়েছিলাম সে কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। হয়নি বলেই আমি আপনার সাহায্যের জন্য ছুটে এসেছি।'

রাজা ছিলেন উদয়ের অপেক্ষায়। রাজকুমারীদের উদ্ধার করার পর থেকে রাজা তাদের সযত্নে রেখেছিলেন। অমন সুন্দর মেয়েদের অঙ্গহানি দেখে তিনি প্রথমে দুঃখ পেয়েছিলেন। পরে আশার আলো দেখেছিলেন। যার সাহায্য তিনি চেয়েছিলেন সেই উদয় যখন তাঁর কাছে সাহায্য চাইল তখন তিনি খুব অবাক হলেন।

'আমার সাহায্য? কী সাহায্য চাও বল? কোনো সংকোচ করবে না। যা সাহায্য চাইবে তাই পাবে।' রাজা প্রতাপ সিংহ বললেন।

তখন উদয় এক এক করে জানিয়ে গেল। কীভাবে কোথায় ওরা ছিল। কীভাবে ওদের খুঁজে পাওয়া রাজকুমারীরা হারিয়ে গেল। অঞ্জন ও ভস্ম দিয়ে কী কী করা যায় ইত্যাদি সবিস্তারে জানাল।

'তাহলে আমি এখন কী সাহায্য করব?' রাজা জিজ্ঞেস করলেন।

'আপনার চিত্রশিল্পীকে সাত দিনের জন্য আমার সঙ্গে পাঠাতে হবে। আমরা সাত দিনের মধ্যে ফিরে আসব।' উদয় বলল।

রাজা রাজি হলেন। চিত্রশিল্পীকে ডেকে উদয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। পরের দিন চিত্রশিল্পী ও উদয় রাক্ষস ভবনের দিকে রওনা হয়ে গেল। সেখানে পৌঁছে উদয় চিত্রশিল্পীর গায়ে ও নিজের গায়ে ভস্ম ছড়িয়ে রাক্ষসের চোখে ধুলো দিয়ে থাকতে পারল। একদিন এক রাত্রি সেই পুকুরের কাছে থেকে পরের দিন মালব দেশের দিকে রওনা হয়ে গেলে। এক সপ্তাহের মধ্যে ওরা মালব দেশের রাজধানীতে পৌঁছাল।

রাজমহলে ফিরে এসে এক-একটা ছবি পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। অনেকগুলো ছবি এঁকে চিত্রশিল্পী বলল, 'এইটা যেমন দেখতে হয়েছে আপনি যদি ঠিক সেইভাবে সাজতে পারেন তাহলে রাক্ষস কোনোক্রমেই ধরতে পারবে না।'

উদয় অনেকক্ষণ ওই ছবির দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে। আমি এই রাক্ষস পরিবারের একজনের মতোই সাজব।'

পরের দিন উদয় রাজা প্রতাপ সিংহের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

উদয় ওই পুকুরের কাছে গিয়ে যথারীতি ভস্ম আছে কি না দেখে নিল। কিন্তু

তার কাছে ভস্ম ছিল না। মুহূর্তকাল ভেবে পেল না কি করবে। শেষে ঠিক করল অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত গা-ঢাকা দিয়ে থাকবে। অন্ধকার হয়ে গেল। লক্ষ করল পুকুরের চারদিক। তখন রাক্ষস পরিবারের লোক পাহারা দিচ্ছিল। একদল রাক্ষস এল পাহারা দিতে। অন্যদল ছুটি পেল। ছুটি পেয়ে ওরা ওই পাতালভবনের দিকে এগোল। উদয় ঝট করে ওদের দলে মিশে গেল। ওকে বোঝা যাচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল সেও রাক্ষস পরিবারের একজন। বোঝা না গেলেও উদয় মনে মনে খুব ভয় পাচ্ছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সেই ভয় কেটে গেল।

এবার উদয় সিঁড়ি বেয়ে নেমে ওই সিংহগুলোর পাশ দিয়ে চলে গেল। নতুন লোককে হঠাৎ কীভাবে যেন ওরা বুঝে নিল। চোখের পলকে ওরা উদয়ের উপর ঝাপিয়ে পড়ল। উদয় আর্তনাদ করে মূর্ছা গেল। এ এক অবাক কাণ্ড। উদয় মানুষের চোখে ধুলো দিতে পারল, রাক্ষসকে ঠকাতে পারল, এমনকী বেঁটে লোকটাকেও বশ করতে পারল। কিন্তু ধরা পড়ল সিংহের কাছে। ছদ্মবেশী উদয়কে সিংহগুলো এক পলকে চিনতে পেরেছিল। চেনার পরে ওরা আর এক মুহূর্তও দেরি করেনি। একসঙ্গে প্রবল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। নেহাত কপাল জোরে সিংহের থাবা উদয়ের গলায় পড়েনি এবং রাক্ষসরাও তাকে চিনতে পারেনি। তাই ওরা উদয়কে আপনজন ভেবে সেবা করেছিল। পেট ভরে খেতে দিয়েছিল।

এই দৃশ্য দেখে অন্যেরা তাড়াতাড়ি ছুটে এসে এক কোপে দুটো সিংহকেই মেরে ফেলল।

ওরা ধরাধরি করে উদয়কে নিয়ে গিয়ে একটি জায়গায় শুইয়ে দিল। তারপর ওরা উদয়ের সেবা করতে করতে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, 'দেখলে

কী অবস্থা? আমাদের সিংহ আমাদেরই মেরে ফেলতে চাইছে। সিংহ দুটোকে যে মেরে ফেলেছিল ওরা তাকে প্রশংসা করল। অনেকক্ষণ সেবা করার পর ওরা উদয়কে বলল, 'ভাই, তুমি বিশ্রাম কর। তোমার যা কাজ তা আমরা করব। তুমি নিশ্চিন্তে বিশ্রাম কর।'

ওদের কথা শুনে উদয় বলল, 'ঠিক আছে, আমি বিশ্রাম করব। সময় মতো আমার খাবার পাঠিয়ে দিও।'

ওরা তাতে রাজি হয়ে চলে গেল। পরে মাংস ইত্যাদি পাঠিয়ে দিল। পুকুরের চারদিকে আবার পাহারা বদল হল। পরে অনেকেই উদয়কে বলতে লাগল, 'ভাই, তোমার কপাল খুব ভালো। তা না হলে সিংহের মুখে পড়েও বেঁচে যাও!'

তারপর ওরা খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঠিক মাঝরাত্রে রাক্ষস এল। এসেই সিংহ দুটিকে মরে পড়ে থাকতে দেখে ভীষণ রেগে গেল। পরে উদয়ের কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এটা কার কাণ্ড? এসব কে করেছে?'

ষোলো

রাক্ষসকে গর্জন করতে করতে আসতে দেখেই উদয় ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। কী একটা জবাব দেবার কথা ভাবতে না ভাবতেই রাক্ষসের পরিচারিকারা ছুটতে ছুটতে তার কাছে এল।

ওদের মধ্যে সিংহকে যে মেরে ফেলেছিল তার হাত বাঁধা ছিল। সে বলল, 'আমি মেরে ফেলেছি। এতকাল যে সিংহ আমাদের ভবনে ছিল, আমাদের দেওয়া খাদ্য খেয়ে যে সিংহ এত বড়ো হল সেই সিংহ আমাদেরই মেরে ফেলতে চায়। আমি যদি ঠিক সময়ে না আসতাম তাহলে ওকে বাঁচানো যেত না। ও এতক্ষণ সিংহের পেটে চলে যেত।' রাক্ষসকে সিংহ হত্যাকারী বলল।

তার কথা শুনে রাক্ষস বলল, 'ও তাই নাকি! তাহলে বেশ করেছ। তুমি ঠিক সময়ে হত্যা না করলে ও হয়তো এতক্ষণ মরে পড়ে থাকত। মনে হচ্ছে বসে বসে খেয়ে খেয়ে খুব তেজ বেড়ে গেছে। এক কাজ কর সপ্তাহ খানেক সিংহকে কিছু খেতে দিও না। পেটে মারলে সিংহ ঠিক পথে চলে আসবে।' বলতে বলতে রাক্ষস চলে গেল।

তখনও উদয় সাহস পেল না। কিছু না জানার মতো কাঠ হয়ে শুয়ে রইল। রাক্ষস যে কোন দিকে গেছে তা ভালোভাবে লক্ষ করতে লাগল।

রাক্ষস সেখান থেকে একটু দূরে গিয়ে কোমরের বাঁধা চাবি বের করল। কী যেন বিড় বিড় করে বলল। সেই ছোটো চাবিটা সাত বিঘত লম্বা হয়ে গেল। ওই চাবি দিয়ে বিরাট দরজা খুলল।

সেই সুযোগে উদয় ঝট করে উঠে উঁকি মেরে দেখে নিল। কিন্তু পরক্ষণেই তার ভয় করল। একবার রাক্ষসের হাতে ধরা পড়লে আর রক্ষা নেই।

রাক্ষস যে দরজা দিয়ে ঢুকেছিল সেই দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। দরজা বন্ধ করে, দরজায় চাবি ঘুরিয়ে, মন্ত্র পড়ে চাবিটিকে ছোটো করে নিল। সেই চাবিটা কোমরে গুঁজে রাক্ষস যে পথে এসেছিল সেই পথে চলে গেল।

ওর চলে যাওয়ার পর ওর সেবক-সেবিকারা যে-যার জায়গায় নাক ডেকে ঘুমোতে লাগল।

সবাই যখন ঘুমোচ্ছিল উদয় তখন উঠে পড়ল। যে ফুটোতে চাবি ঢুকিয়ে ছিল সেই ফুটোতে চোখ রেখে দেখল। দেখে চমকে উঠল। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। দেখল যে লোকটার জন্য উদয় এত কষ্ট করে আছে সেই বেঁটে দাড়িওয়ালা লোকটা সেখানে রয়েছে। অবশ্য সন্ধ্যা এবং নিশীথকে দেখা যাচ্ছে না। দাড়িওয়ালা লোকটা ঝুলছে। তার মাথা নীচের দিকে।

এই দৃশ্য দেখে উদয়ের ভয় করল। সে ভেবে পেল না ভাই দুটো কোথায়। আবার সে দাড়িওয়ালাকে ওই অবস্থায় দেখে অবাকও হল। একবার ভাবল দাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা করতে পারলে মন্দ হত না। কিন্তু ওই দরজা খোলা যাবে কী করে? চাবি কোথায়? চাবি পেলেও সেই চাবিকে বড়ো করবার মন্ত্র সে জানবে কোত্থেকে? মন্ত্র না পড়লে চাবি বড়ো হবে না, দরজাও খোলা যাবে না।

সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে উদয় সেই দরজার কাছে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। শেষে বিরক্ত হয়ে যেখানে শুয়েছিল সেখানে শুয়ে পড়ল। কিন্তু চোখে ঘুম এল না।

বার বার উদয়ের মনে প্রশ্ন জাগল, কীভাবে ওই দাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা করা যায়। ভাই দু-জন গেল কোথায়? সারারাত তার চোখে ঘুম ছিল না। সারারাত সে এই কথাগুলোই ভাবছিল।

সকাল হল। পাতালভবনে ঢুকল। সেখানকার সবাই যে-যার কাজে ব্যস্ত।

উদয় ঠিক করল, ওদের কাছেই প্রশ্ন করে দাড়িওয়ালার কাছে পৌঁছোবে। পরক্ষণেই তার মনে পড়ল তার নিজের ছদ্মবেশ বদলানো দরকার। তা না হলে তাকেই ধরা পড়তে হবে। আর একবার ধরা পড়লে রক্ষে নেই।

এক সপ্তাহের মধ্যে রাক্ষস ফিরে এল। আগের মতোই চাবি বের করে মন্ত্র পড়ল। বিরাট দরজা খুলল। এক ফাঁকে উদয়ও ওর পেছনে পেছনে ভেতরে ঢুকে গেল।

ভেতরে তিনটি বড়ো বড়ো পাত্র ছিল। সেই পাত্রগুলো ছিল ঢাকা। ঢাকনাটা খুলে দেখে উদয়ের মনে হল তার ভেতরে কোনো মানুষ আছে। ঝট করে সে ওই ঢাকনা বন্ধ করে দিল। দ্বিতীয় বড়ো পাত্রটির ঢাকনাও খুলল। তাতে মনে হল কেউ ছিল। সে ঝট করে ঢাকনা বন্ধ করে দিল। তৃতীয়টির ঢাকনা খুলে দেখল তাতে কিছু ছিল না। ঝট করে সেটাও বন্ধ করে দিল। উদয় এসব যখন করছিল তখন সে ঠিক লক্ষ করতে পারেনি যে রাক্ষস কোথায় গেছে। পরে রাক্ষস ওই পাত্রগুলোর কাছে এল।

ফিরে এসে রাক্ষস একটি পাত্রের ঢাকনা খুলল। ভেতরে লোকটা উঠে দাঁড়াল। রাক্ষস তার চুল ধরে তুলে পাত্র থেকে বাইরে আনল। তারপর দ্বিতীয়টিতে গর্জন উঠল। দ্বিতীয়টির ঢাকনা খুলল। তার ভেতরের লোকটাও দাঁড়িয়ে পড়ল। তারও চুলের মুঠি ধরে ওই বিরাট পাত্রের বাইরে দাঁড় করিয়ে দিল।

ওদের নিয়ে রাক্ষস বেরিয়ে এল। আগের মতোই দরজা বন্ধ করে ওই দু-জনকে দুই বগলে নিয়ে সে চলে গেল।

উদয় একমুহূর্তও দেরি করল না। তৎক্ষণাৎ পাত্রের মুখ খুলে বাইরে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করল। কিন্তু অত সহজে হল না। শেষে নানাভাবে লাফিয়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করল উদয়।

লাফালাফি করায় সেটা ভেঙে যাওয়াতে তার শাপে বর হল। সে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারল।

কিছুদূরে দাড়িওয়ালাকে ঝুলতে দেখল। ছুটে গেল তার কাছে। জিজ্ঞেস করল তাকে, ‘কী ব্যাপার? তোমার কপালে এ কী শাস্তি। আমার ভাই কোথায়

গেল? তাড়াতাড়ি বল, আমাকে এক্ষুনি পালাতে হবে। রাক্ষসটা যেকোনো মুহূর্তে চলে আসতে পারে।' দাড়িওয়ালাকে উদয় হাঁকপাঁক করে প্রশ্ন করল।

দাড়িওয়ালা কিছুক্ষণ সময় নিল উদয়কে চিনতে। তারপর বলল, 'তাই বলি, আমি তো প্রথমে চিনতেই পারিনি। রাক্ষসটা এক্ষুনি ফিরবে না। ওর আসতে এক সপ্তাহ। আগে আমার বাঁধন খোল। তারপর সব বলছি।'

উদয় দাড়িওয়ালার বাঁধন খুলে দিল। হাত-পা ঝেড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাড়িওয়ালা বলল, 'তুমি যে এর ভেতরে এসেছিলে, ঢাকনা খুলে দেখেছিলে এ সবই আমি লক্ষ করেছিলাম। ওই যে দুটো পাত্রে মানুষগুলো দেখলে, ওরা কারা? ওরাই তো তোমার ভাই। কপাল ভালো যে এখনও তোমাকে তৃতীয় পাত্রে পুরে রাখেনি।

শুনে উদয় ব্যস্ত হয়ে বলল, 'তুমি কি বলছ? ওরা আমার ভাই? সন্ধ্যাকুমার আর নিশীথকুমার ওর ভেতরে আছে চল! আগে ওদের মুক্ত করে আসি।'

দাড়িওয়ালা হো-হো করে হাসতে হাসতে বলল, 'তুমি পাগল হয়েছ। তোমার ভাইরা কি এখনও ওর ভেতরে আছে। লক্ষ করেছিলে ওই পাত্রের কাছে দাঁড়িয়ে রাক্ষস জোরে জোরে এক দুই বলেছিল। তারপরেই সে ওদের তুলে নিজের সঙ্গে নিয়ে চলে গেল।'

'তাই নাকি? ভালো কথা, রাক্ষসটা তোমাকে এভাবে ঝুলিয়ে রাখল কেন? আর ভাইদের বা ওই পাত্রে আটকে রাখল কেন? রাক্ষসটা তোমাদের নিয়ে আর কী কী করছে বল তো?' প্রশ্ন করল উদয়।

'আগে ভাঙা পাত্রের টুকরোগুলো জড়ো করে কোথাও লুকিয়ে রাখতে হবে। পরের কথা পরে হবে।' দাড়িওয়ালা বলল।

দাড়িওয়ালা ভাঙা পাত্রের টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিয়ে বলল, 'রাক্ষসের ধারণা তুমি কোথায় আছ তা আমরা জানতাম। জেনেও আমরা প্রকাশ করিনি। না জানালে কঠোর শাস্তি দেবে বলে রাক্ষসটা আমাদের অনেক ভয় দেখিয়েছিল। কিন্তু আমরা মুখ ফুটে কিছু বলিনি। শেষে সে ওই পাত্রে পুরে
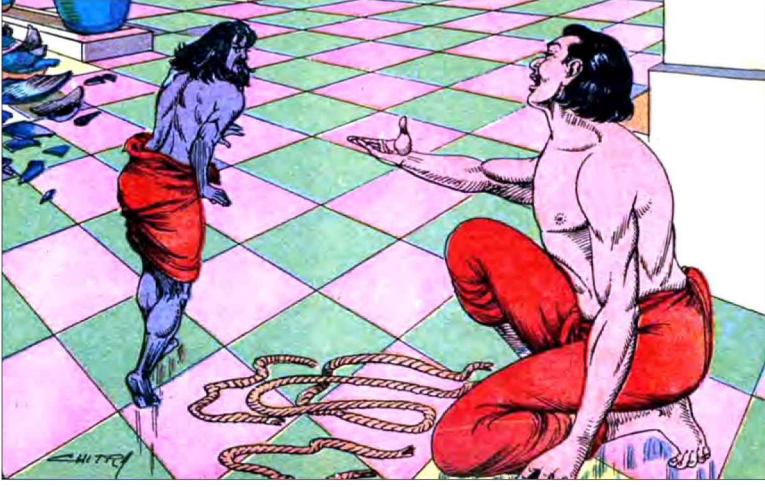
রাখল। তাতেও আমরা কেউ ভয় পাইনি। তোমার কথা প্রকাশ করিনি। এখন আমাকে ঝুলিয়ে রেখে তোমার ভাইদের অন্য কোনো শাস্তি দিতে কোথায় যে নিয়ে গেছে তা ঠিক বলতে পারছি না। আচ্ছা, তুমি কোথায় ছিলে? ওর চোখে ধুলো দিয়ে এখানে থাকা তো সহজ কথা নয়!'

উদয় ছদ্মবেশে কীভাবে যে সেখানে এল আর কীভাবে যে ভস্ম অঞ্জন প্রভৃতি হারাল তা বিস্তারিত জানাল।

শুনে দাড়িওয়ালা বলল, 'ভস্ম অঞ্জন এসব নিশ্চয় ওই রাজাই চুরি করেছে। যেকোনো ভাবে এখান থেকে বেরিয়ে ওই রাজার কাছ থেকে উদ্ধার করতে হবে। ওগুলো ছাড়া আমাদের কাজ এগোবে না।'

পরে দু-জনে বসে ভাবতে লাগল কীভাবে অঞ্জন ভস্ম প্রভৃতি রাজার কাছ থেকে উদ্ধার করা যাবে।

* * *

এদিকে মালব দেশের রাজার কাছে যে তিন রাজকুমারী ছিল তাদের মধ্যে বিচিত্র ঘটনা ঘটেছিল। উদয় ওই রাজার কাছে এসেছিল। তার কী আছে না আছে রাজা জেনে নিয়েছিল। উদয় যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল তখন রাজা অঞ্জন ও ভস্ম চুরি করে নিয়েছিল। পরের দিন সকালে রাজা এমন ভাব দেখাল যেন সে কিছুই জানে না। উদয় অবস্থা দেখে পরের দিন সেখান থেকে চলে গেল। উদয়ের চলে যাওয়ার পর রাজকুমারীদের কাছে ডেকে ওদের গায়ে অঞ্জন লাগিয়ে ওদের বিকলাঙ্গ অবস্থা দূর করল।

যমজ রাজকন্যাদের বিকলাঙ্গ অবস্থা দূর হওয়ার পর ওদের আরও বড়ো বিপদের
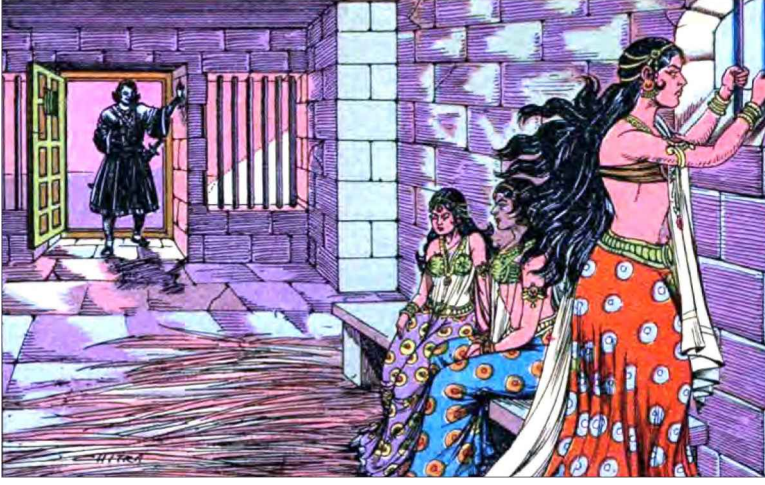
মুখে পড়তে হল। ওদের পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় দেখে রাজা প্রতাপ সিংহ অবাক হয়ে গেলেন। ওদের রূপ দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন। ওদের তিনি বিয়ে করবেন ঠিক করলেন।

কিন্তু রাজার বিয়ে করার প্রস্তাবে কোনো যমজ রাজকুমারী রাজি হয়নি। ওদের প্রাণের ভয় দেখালেন। কিন্তু ওরা ভয় পেল না।

রাজা ওদের যখন উদ্ধার করেছিল তখন ওরা আশাভরসা পেয়েছিল। কিন্তু রাজা যখন ওদের বিয়ে করতে চাইল তখন ওরা ভয়ে কুঁকড়ে না গেলেও দুঃখে ভেঙে পড়েছিল।

রাক্ষস সন্ধ্যাকুমার ও নিশীথকে এক পুকুরের ধারে দাঁড় করিয়ে বলল, 'শোনো, তোমাদের একবার শেষবারের মতো সুযোগ দিচ্ছি। তোমাদের আর এক ভাই কোথায় গেছে ঠিক করে বল। তা না হলে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তোমাদের মৃত্যু হবে। এতদিন সহ্য করেছি। আর একমুহূর্তও সহ্য করতে আমি রাজি নই।'

সন্ধ্যা ও নিশীথ স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু রাক্ষস যেন অস্থির হয়ে উঠেছিল। নিশীথ বুকে সাহস সঞ্চয় করে বলল, 'ও যে কোথায় গেছে, সত্যি বলছি, আমরা জানি না। তবে কথা দিচ্ছি, আমরা যদি মুক্ত হতে পারি, তুমি যদি আমাদের ছেড়ে দাও, তাহলে আমরা ওর খোঁজ করতে পারি। এখন আমাদের কথায় বিশ্বাস করা বা না করা তোমার ইচ্ছে। তা ছাড়া আমাদের ভাইয়ের খোঁজ পেলেই তোমার কাছে আসতে আমাদের কোনো বাধা নেই। তোমার খপ্পর থেকে আমরা তো পালাতে পারব না। পারলেও তুমি ইচ্ছে করলেই আমাদের ধরে আনতে পারবে।'

'ওহে, তুমি তো খুব ভালো ভালো কথা বলতে পার ! তোমরা আমাকে অনেক বার ঠকিয়েছ ? এখন আর ঠকানোর চেষ্টা করো না। তোমরা ভেব না যে তোমরা
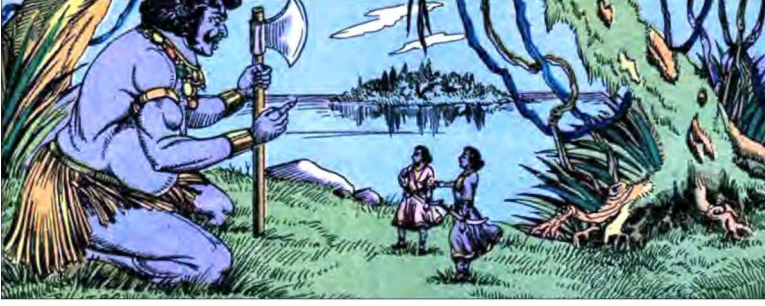
যা যা করেছ আমি ভুলে গেছি। সব মনে আছে। তোমরা যখন এত বার ঠকিয়েছ তখন ছাড়া পেয়ে আর একবার ঠকাতে পার।' রাক্ষস বলল।

ওর কথা শুনে নিশীথ বলল, 'তাহলে আমি যতক্ষণ না ফিরি ততক্ষণ তুমি আমার এই ভাইকে রেখে দাও। রেখে দিলে তো তোমার সন্দেহ কেটে যাবে। আর যাই হোক, ভাই হয়ে আমি ভাইয়ের মৃত্যু হোক, এটা চাইব না। আমার ভাইকে খুঁজে পেলেই আমরা দু-জনে তোমার কাছে আসব। তারপর তোমার ইচ্ছে হলে তুমি আমাদের ছাড়বে। তখন তোমার যা ইচ্ছে তুমি তাই আমাদের করতে পারবে।'

'তাহলে শোনো, একটা কথা বলি, তোমাদের আমি হয়তো কিছুই করব না। করে আমার কোনো লাভও নেই। তোমাদের মেরে ফেলার ইচ্ছে থাকলে আমি অনেক আগেই মেরে ফেলতাম। আসলে তোমাদের ওই ভাইয়ের কাছে ভস্ম ও অঞ্জন রয়ে গেছে। ওগুলো না থাকলে পদে পদে আমার অসুবিধা হয়। ওর অভাবে আমার চোখে ঘুম আসছে না, পেটে খিদে হচ্ছে না। ওই ভস্ম এবং অঞ্জন যেদিন আমাকে এনে দেবে সেইদিনই আমি তোমাদের ছেড়ে দেব। এখন তুমি যাও।' রাক্ষস বলল।

রাক্ষসের প্রস্তাবে সন্ধ্যাকুমার রাজি হল। নিশীথ বেরিয়ে পড়ল। অন্য হাঁসদের সঙ্গে সন্ধ্যাকুমারকেও রেখে দিতে রাক্ষসটা পাহারাদারাদের বলল। তারপর কী যেন ভেবে রাক্ষস চলে গেল।

সতেরো

যেকোনোভাবে উদয়ের খোঁজ করবে বলল নিশীথ। তার কাছে যে ভস্ম অঞ্জন প্রভৃতি ছিল সেগুলো উদয়ের কাছ থেকে এনে রাক্ষসের হাতে দেবে বলল নিশীথ। নিশীথকে রাক্ষস শপথ করাল। তারপর ঠিক ছেড়ে দেওয়ার আগে রাক্ষসের মনে সন্দেহ জাগল। রাজকুমারীদের সে যেভাবে অঙ্গহানি করে ছেড়ে দিয়েছিল সেভাবে নিশীথকেও বোবা করে ছেড়ে দিল।

নিশীথ বোবা। কথা বলে কাউকে কিছু বোঝানোর উপায় নেই। ইশারায় তার মনের কথা জানাতে হয়। দেশে দেশে ঘুরতে ঘুরতে নিশীথ মালবদেশে পৌঁছাল। উদয় আর নিশীথ প্রায় একরকম দেখতে। ওদের আদল এক, গায়ের রং অবিকল একরকম। এই একরকম দেখতে হওয়ায় নিশীথকেই উদয় ভেবে মালব দেশের রাজার অনুচরগুলো তাকে ধরে নিয়ে গেল রাজার কাছে।

মালব দেশের রাজা প্রতাপসিংহ নিশীথকে ভালো ভাবে দেখলেন। বুঝলেন এ উদয় ছাড়া আর কেউ নয়। ভস্ম অঞ্জন প্রভৃতি যেকোনোভাবে নিয়ে যেতে এসেছে। নিশীথকে ভুল বুঝে উদয় ভেবে রাজা প্রতাপসিংহ আরও অনেক কথাই ভাবলেন। কিন্তু মনের কথা মনে চেপে রেখে হাসতে হাসতে নিশীথকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কী ব্যাপার? যে কাজে বেরিয়েছিলে সে কাজে সফল হয়েছ তো?’

এদিকে নিশীথ মালব দেশে এই প্রথম ঢুকেছে। রাজাকেও সে দেখছে প্রথমবার। ওর মনে সন্দেহ জাগল, রাজা এবং তার অনুচরগুলো তার সঙ্গে কেন এত ভালো ব্যবহার করছে। এক অজানা লোকের সঙ্গে এত ভদ্র ব্যবহার করছে কেন? তার ইচ্ছে করল বলতে, ‘কি ব্যাপার মশাই, আমাকে কি আগে থেকে আপনারা চিনতেন? নাকি এভাবেই সকলের সঙ্গে আপনারা ব্যবহার করেন?’ কিন্তু কথা বলার ক্ষমতা কোথায়? রাক্ষস তো সেই ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে। নিশীথ ইঙ্গিতে রাজাকে জানাল যে সে মূক।

রাজা অবাক হয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, ‘সে কী কথা উদয়! তুমি তো এখান থেকে যাওয়ার সময় ভালোই ছিলে। বোবা হয়ে গেলে কী করে?’

রাজার মুখে ‘উদয়’ শব্দটি শুনেই নিশীথ বুঝে নিল কোথায় একটা গোলমাল হয়েছে। এবং সে আরও বুঝল যে উদয় এখানে এসেছিল। নিশীথ লিখে জানাবার আগ্রহ ইশারায় জানাল। কিছুক্ষণ পরে সে লিখে জানাল যে উদয় তার ভাই। ভাইয়ের খোঁজ করতেই সে দেশে দেশে ঘুরছে। ঘুরতে ঘুরতে সে এখানে এসেছে। সে আরও

জানাল যে উদয়ের খোঁজ পেলে অথবা কারও কাছে জানতে পারলে সে খুব খুশি হবে। রাজা প্রতাপসিংহও সমস্ত বুঝতে পারলেন।

নিশীথ যে উদয়ের ভাই এ-কথা জেনে রাজার মনে ভয় ঢুকল। তার মুখ দিয়ে কথা সরছিল না। ভাবল, 'ভেবেছিলাম ভস্ম অঞ্জন সব নিয়ে উদয়কে তাড়িয়ে দিয়েছি। আর কোনো ঝামেলা হবে না। কিন্তু এই আপদটা আবার কোত্থেকে এল। উদয়কে আমি চিনি বললেও উপায় নেই। আবার চিনিনাও বলা যায় না।'

আরও কিছুক্ষণ ভেবে মনে মনে রাজা প্রতাপসিংহ বললেন, 'উদয় কি আর এতদিন বেঁচে আছে? নিশ্চয়ই রাক্ষস ওকে শেষ করে ফেলেছে। একে আমি যদি কোনোরকমে সরাতে পারি তাহলে ভবিষ্যতে হয়তো তৃতীয়জন আসবে। তাকেও সরিয়ে দেব পৃথিবী থেকে। তখন ভস্ম অঞ্জন এবং রাজকুমারীরা পুরোপুরি আমার হাতের মুঠোয় এসে যাবে।' অনেকক্ষণ এই ধরনের কথা ভেবে রাজা নিশীথকে বললেন, 'শোন হে, তোমার ভাই যে এখানে এসেছিল সে-কথা সত্য। তবে সে এখানে শুধু একটি বেলা ছিল। তারপরেই চলে গেল। কোথায় যে গেল, আমি জিজ্ঞেস করিনি, সেও বলেনি। তবে তোমার এই দুরবস্থা দেখে তোমার প্রতি আমার সহানুভূতি জাগছে। তোমার যদি আমি কোনো উপকার করতে পারি তবে আমার ভালোই লাগবে। উদয়কে খোঁজার জন্য তুমি একা যাবে কেন, বল তো আমি তোমাকে দুটো লোক দেব। ওরা তোমাকে সাহায্য করবে।'

রাজার প্রস্তাবে নিশীথ রাজি হল। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রাজাকে নমস্কার জানাল। তৎক্ষণাৎ রাজা মন্ত্রীকে কাছে ডেকে কানে কানে বললেন, 'এই ছেলেটার সঙ্গে বিশ্বাসী দু-জন অনুচরকে পাঠাবে। দেশের নির্জন প্রান্তে নিয়ে গিয়ে ওরা যেন একে মেরে ফেলে। এমনভাবে সব কিছু করবে যাতে কেউ যেন কী করা হয়েছে টের না পায়।'

রাজার কথা শুনে মন্ত্রী মনে মনে খুব বিরক্ত হল। কিন্তু রাজার নির্দেশ পালন না করে উপায় নেই। গররাজি হলে তার গর্দান যাবে। তাই রাজার নির্দেশমতো দু-জন অনুচরের সঙ্গে নিশীথকে বিদায় দিল। নিশীথ রওনা হল। নিশীথ এগিয়ে চলেছে। রাজার অনুচর দু-জন তাকে অনুসরণ করে চলেছে।

এদিকে নিশীথের এই অবস্থা ওদিকে উদয়ের অবস্থাও কম জটিল নয়। রাক্ষসের ফিরতে আর মাত্র দু-দিন বাকি। কী যে করতে হবে ওরা কিছুই ভেবে পাচ্ছে না। অনেকক্ষণ ভেবেছে। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দাড়িওয়ালা বলল, 'উদয়, রাক্ষসটা আমাকে আগে যেভাবে ঝুলিয়ে রেখেছিল সেইভাবেই আমাকে ঝুলিয়ে দাও। হঠাৎ যদি রাক্ষস এসে হাজির হয় তুমি এক কোণে লুকিয়ে থাকবে। পরে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে। যথারীতি অন্যের সঙ্গে এক সারিতে পাহারা দেবে। ফাঁকে ফাঁকে ভাইয়েরা যে কোথায় গেল তার খোঁজ নেবে। এ ছাড়া এ অবস্থায় আর আমরা কী করতে পারি।'

‘রাক্ষসটা এসে তৃতীয় জালাটির খোঁজ করলে তুমি কী বলবে? এমন একটা জবাব দিতে হবে যাতে সে বিশ্বাস করে। তা না হলে রাক্ষসটা সব তোলপাড় করে দেবে।’ উদয় বলল।

‘তাহলে এক কাজ করতে হবে। জালার সব ভাঙা টুকরোগুলো এখানে জড়ো করে রাখতে হবে।’ দাড়িওয়ালা বলল।

ওরা ছড়িয়ে থাকা জালার টুকরোগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করে রাখল। রাক্ষসটা আসতে আর মাত্র একদিন বাকি। উদয় দাড়িওয়ালাকে আগের মতো ঝুলিয়ে রেখে দিল। সে নিজে ঘরের এক কোণে লুকিয়ে রইল। পরের দিন রাক্ষস এল। জালার ভাঙা টুকরোগুলোকে দেখে বলে উঠল, ‘এসব কার কাণ্ড?’ জোরে জোরে বলতে বলতে রাক্ষসটা ঝুলন্ত দাড়িওয়ালার কাছে গেল। তাকে জিজ্ঞেস করল। দাড়িওয়ালা ভয় পাওয়ার ভাব দেখিয়ে বলল, ‘আমার জন্য জালাটা ভেঙে গেছে। ঝুলে ঝুলে বিরক্ত ধরে গিয়েছিল। ভাবলাম কিছুক্ষণ দোল খেলে ভালো লাগবে। মনের আনন্দে একটু দোল খাচ্ছিলাম। এই দোল খেতে গিয়েই কীভাবে দোল খাওয়াটা বেড়ে গেল। হঠাৎ জালার গায়ে লেগে গেল। সঙ্গেসঙ্গে জালাটা ভেঙে গেল। আমাকে এরজন্য ক্ষমা করুন।’

‘দু-দিন ঝুলতে তোমার এত কষ্ট হয়ে গেল! এত অস্থির হয়ে গেলে? অপেক্ষা করতে পারলে না।’ রাক্ষস গর্জে উঠে বলল।

ওদের মধ্যে যখন কথা কাটাকাটি হচ্ছিল তখন উদয় এক-পা এক-পা করে আস্তে আস্তে সেখান থেকে সরে পড়ল। রাক্ষসের অনুচররা পাহারা দিতে বেরুচ্ছে। ওরা দিনের বেলার পাহারাদার। উদয় ওদের সঙ্গে মিশে গেল। সেদিন বিভিন্ন পাহারাদারদের সঙ্গে কথা বলে উদয় জানতে পারল যে তাকে খুঁজতেই নিশীথ বেরিয়েছে। অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই উদয় পাহারাদারদের সঙ্গে মিশে আছে। নিশীথ উদয়কে খুঁজতে গেছে। আর সন্ধ্যাকুমারকে রাক্ষস পুকুরে ফেলে রেখেছে।

এই অবস্থায় পড়ে উদয়ের মন খারাপ হয়ে গেল। নিশীথ সম্পর্কে তার দুশ্চিন্তা হল। নিশীথ তাকে খুঁজতে গেছে। সে তো এখানে আছে। নিশীথ তাকে খুঁজে পাবে

কী করে! সে বেরুলে এদিকের সব গোলমাল হয়ে যাবে। কী যে করতে হবে কিছুই ভেবে পেল না উদয়। ভাবল, 'দাড়িওয়ালার সঙ্গে পরামর্শ না করে কোনো কিছুই ঠিক করা যাবে না।'

সেদিন সন্ধ্যায় ঘুরে ঘুরে এক ফাঁকে দাড়িওয়ালার ঘরে চলে গেল। উদয় প্রথমে অবাক হল। কারণ দাড়িওয়ালার ঘরের দরজা খোলা ছিল। ঘরে ওই দড়িটা ঝুলছিল, দাড়িওয়ালা ছিল না।

এই দৃশ্য দেখে উদয় মুহূর্তে ভীষণ নিজেকে দুর্বল মনে করল। মনে মনে বলে উঠল, 'যার উপর নির্ভর করে সমস্ত কাজে এগোচ্ছি সেই উধাও হয়ে গেল! সে নিজে উধাও হবে কেন? তাকে হয়তো রাক্ষসটা সরিয়ে রেখেছে? হয়তো সে ভীষণ রেগে গেছে দাড়িওয়ালার উপর। আচ্ছা এও তো হতে পারে যে রাক্ষসটা দাড়িওয়ালাকে অন্যরকম কিছু করে দিয়ে গেছে। কিন্তু দাড়িওয়ালাকে তা করতে পারবে কেন? সেও তো মন্ত্রতন্ত্র কম জানে না। তাহলে কোথায় যেতে পারে? কেন যাবে? তবে দাড়িওয়ালার সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না? দেখা যদি না হয় আমাকে নতুন করে পরিকল্পনা করতে হবে।' এইভাবে ভাবতে ভাবতে সে ঘরের আনাচেকানাচে যা কিছু ছিল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল।

সারা ঘরে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ সে থমকে গেল। তার পা পড়ল একটা নুড়ির মতো কীসে যেন। আর মুহূর্তে তার চোখের সামনে যে দেওয়ালটি ছিল সেটা ফেটে দু-ভাগ হয়ে গেল। উদয় দেওয়ালটাকে দু-ভাগ হতে দেখল। সবই জাদুর মতো লাগছিল তার কাছে। উদয় এক-পা এগিয়ে গেল। আর এক-পা সামনে ফেলতে যাবে। তার আগেই তাকে থমকে দাঁড়াতে হল। সামনে দেখল সোনার সিঁড়ি। থমকে গেল।

রুপোর দরজা দেখতে পেল সে। দরজায় ঝুলছে ছ-টি সাপ। এর আগে উদয়কে অনেক বার বুদ্ধি খাটিয়ে বিভিন্ন বিপদের হাত থেকে মুক্তি পেতে হয়েছে। এবারও সে কিছুক্ষণ ভেবে জালার ভিতরে ঢুকে গেল। তারপর গড়িয়ে গড়িয়ে ঢুকতে গেল। এবারে একটু দ্রুত গড়ানোর ফলে রুপোর দেওয়ালে ঠেকে জালাটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। তখন অগত্যা উদয়কে জালার ভাঙা টুকরোর মাঝে দাঁড়িয়ে পড়তে হল।

সেই রুপোর ঘরে ঢুকে উদয় একটুও থমকে গেল না। অবাক হয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে সময় নষ্ট করল না। সে ওই ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য কোনো পথ আছে কি না দেখতে লাগল। কিছুই নজরে পড়ল না। শুধু একটি রুপোর শেকল উপর থেকে ঝুলতে দেখল। একটা লাফ দিয়ে ওই শেকলটাকে ধরে টান দিল। সঙ্গেসঙ্গে রুপোর দেওয়াল সরে গেল। একটি পথ গেল খুলে। উদয় পা বাড়াল। আবার তাকে একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। দরজায় শুধু সোনা-রুপা নয়, হিরে-মুক্তোও লাগানো ছিল। আর সেই দরজায় ঝুলছিল বারোটি ভয়ংকর সাপ।

এর আগে জালায় ঢুকে কৌশল করে কোনোরকমে ঘরে ঢুকতে পেরেছিল উদয়। কিন্তু সেই জালা তো ভেঙে গেছে। এখন কীভাবে যাবে। শুধু এই দরজা পেরোনোই তো মূল সমস্যা নয় সামনে তাকে আরও কত দরজা পেরোতে হবে কে জানে। একটা নয়, দুটো নয়, বারো-বারোটা সাপকে এড়িয়ে সে ঘরে ঢুকবে কী করে! উদয় দিশেহারা হয়ে মাথা চুলকাতে চুলকাতে ভাবতে লাগল এবং ভগবানকে ডাকতে লাগল।

এখন উদয় এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে যেখান থেকে ফেরারও বিপদ আছে। তাকে এখন ফিরতে গেলেও ছ-টি সাপকে মোকাবিলা করতে হবে। এগিয়ে যাওয়ার যেমন বিপদ আছে পেছিয়ে যাওয়ার বিপদও কম নয়।

অনেকক্ষণ ভেবে উদয় হঠাৎ তার কোমর থেকে তরবারি বের করে সাপগুলোর দিকে সজোরে চালিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ছ-টি সাপের মাথা কেটে গেল। আর একবার তরবারি চালাল। এবারের কোপে পাঁচটি সাপের মাথা কাটা গেল। উদয় ভাবল আর এক কোপে বাকি একটিকে নিশ্চয় শেষ করা যাবে। তারপর ঘরে ঢুকতে পারব। আর কোনো বাধা থাকবে না।

উদয় আবার তরবারি তুলল। তীব্র গতিতে তরবারি চালাল। কিন্তু সাপের

গায়ে লাগল না। সেই মুহূর্তে সাপ একবার পাক খেয়ে উদয়ের হাতে ছোবল মারল। হাত থেকে তরবারি খসে পড়ল।

উদয় বুঝল তার শরীরে সাপের বিষ ঢুকেছে। সে সঙ্গেসঙ্গে অন্য হাতে তরবারি তুলে নিয়ে সাপের ছোবল খাওয়া হাত কেটে ফেলল। কেটে না ফেললে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই উদয় মরে যেত। নিজের হাত কেটে ফেলেই সে প্রচণ্ড আক্রোশে সাপের উপর তরবারি চালাল। সাপ দু-টুকরো হয়ে গেল।

সাপ কাটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে উদয়েরও চৈতন্য লোপ পেল। অনেকক্ষণ ওইভাবে চেতনাহীন অবস্থায় পড়ে রইল।

জ্ঞান যখন ফিরল তখন উদয় দেখল যে রক্তে ঘর ভেসে গেছে। কাটা হাত দিয়ে তখনও রক্ত ঝরছিল। সেই রক্তাক্ত হাত ঝুলিয়ে উদয় এগোতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে সে একটি গুহা দেখতে পেল।

ওই গুহার ভিতরে ছিল একটি বিগ্রহ। দেবীমূর্তি। ভয়ংকর সেই মূর্তি। তার মুখ যেন জ্বালামুখী। তার মুখ দিয়ে আগুনের হলকা বেরুচ্ছিল। তার চোখে ছিল তীব্র আলোর ঝলকানি। ভয়ংকর দেবীর এক হাতে ছিল এক বাজ পাখি। সব মিলিয়ে গুহাটা ভয়ংকর দেখাচ্ছিল। গায়ে কাঁটা দেওয়ার মতো।

এই দৃশ্য দেখে উদয়ের চুল খাড়া হয়ে যায়নি। তার গায়েও কাঁটা দেয়নি। সে আরও ভালোভাবে দেবীকে দেখার জন্য সেই মূর্তির দিকে এগিয়ে গেল। দু-পা এগোতে না এগোতেই হঠাৎ গুহা ঘন ধোঁয়ায় ভরে গেল। সেই ধোঁয়ায় উদয় পথ খুঁজে পেল না।

আঠারো

উদয় বুঝল, সেখান থেকে সে আর বেরোতে পারবে না। তার মনে হল এসব রাক্ষসের নির্দেশেই হচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ ধোঁয়া মিলিয়ে গেল। উদয় অবাক হল।

কিন্তু সে ভয় পেল না। পরক্ষণে শুনতে পেল নানা ধরনের ধ্বনি। দেবীমূর্তিতে যেন প্রাণ এসেছে। সে সোজা ওই মূর্তির দিকে তাকিয়ে জোড় হাত করে বলল, 'দেবী, এতগুলো নিরপরাধীকে বলি দিতে বলছ কেন? ওরা তো তোমার কোনো ক্ষতি করেনি। নির্দোষিদের বলি দিয়ে ওই রাক্ষসটা কি তোমার কাছে আরও শক্তি পেতে চায়। ওই রাক্ষসের শক্তি বাড়িয়ে জগতের কি কোনো উপকার হবে দেবী?'

দেবীমূর্তি নড়ল না। তার মুখ থেকে কোনো কথাও শোনা গেল না। উদয় কিছুক্ষণ ভেবে আবার বলল, 'মা, বহু দিন ধরে আমরা অনেক রকমের কষ্ট পাচ্ছি। রাক্ষসটা আমাদের যা কষ্ট দেবার দিয়েছে, অন্যদের যে কত কষ্ট দিয়েছে তা তারাই বোঝে। আমরা ঠিক করেছি ওই রাক্ষসটাকে মেরে ফেলব। মাগো, তুমি বলে দাও, ওর প্রাণ কোথায় আছে। বল মা।'

দেবী নড়েনি। কথা বলেনি। তার এই অবস্থা দেখে উদয়ের ভীষণ রাগ হল। সে তখন ঝট করে পেছিয়ে গেল। তরবারি বের করল। দ্রুত এগিয়ে এসে দেবীর হাতে যে বাজ পাখি ছিল সেটিকে আঘাত করল। এক কোপে বাজ পাখি কাটা পড়ল। নীচের অগ্নিকুণ্ডে সেটি পড়ে গেল। মুহূর্তে দেবীমূর্তি কোথায় উধাও হয়ে গেল। চোখের পলকে গোটা অঞ্চল উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেল।

উদয় হকচকিয়ে গেল। এদিক-ওদিক তাকাল। পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখে যেসব দরজা পেরিয়ে এসেছিল সেসব দরজা আর নেই। ঘরগুলোও নেই। সব সমতল ভূমিতে পরিণত হয়েছে।

উদয় ফেরাপথ ধরল। যেখানে হিরে-মুক্তো ছিল সেখানে ডিমের মতো একটা হিরে পড়েছিল। সেটিকে তুলে নিয়ে কিছুদূর এগোতেই নজরে পড়ল একটি রুপোর ডিম। সেটি তুলে নিয়ে দু-পা যেতেই একটি সোনার ডিম কুড়িয়ে পেল। সেটাও তুলে নিল। এসব নিয়ে এগোতে এগোতে ভাবতে লাগল দাড়িওয়ালা বেঁটে লোকটা যে ঘরে ঝুলছিল সে ঘরটা কোথায়?

চারদিকে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ এক জায়গায় দেখতে পেল রাক্ষসের অনুচরেরা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। কিছুক্ষণ পরে দেখতে পেল পুকুর থেকে হাঁসগুলো উঠে আসছে। ওরা যে-যার রূপ পাচ্ছে। সবাইকে উদয় দেখতে পেল। দেখতে পেল না শুধু নিশীথকে। উদয় যন্ত্রের মতো দাঁড়িয়েছিল। এমন সময় লক্ষ করল রাক্ষসের অনুচরেরা তাকে কাঁধে তুলে নিয়েছে।

কাঁধে বসিয়ে মহানন্দে ওরা বলতে লাগল, 'তুমি আমাদের ঠাকুর, তুমিই দেবতা। তোমার জন্যই মুক্তি পেয়েছি।'

উদয়ের হাত দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছিল। ওদের মধ্যে একজন চিৎকার করে বলল, 'ওরে, তোরা ওষুধটা নিয়ে আয়।'

কিছুক্ষণের মধ্যে ওষুধ এনে উদয়ের হাতে ওরা লাগিয়ে দিল। তারপর উদয়

সবাইকে নিয়ে পুকুরের দিকে এগোতে লাগল। কিন্তু পুকুর কোথায়? পুকুর যেখানে ছিল সেখানে রয়েছে গাছপালা। পাথরের মূর্তিগুলো যেরকম ছিল সেরকমই আছে। উদয় বলল, 'মূর্তিগুলো তো আছে। কিন্তু পুকুরটা কোথায়?'

'পুকুর আর থাকবে কেন? দেবীর চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুকুর উধাও হয়ে গেছে।' ওরা বলল।

'তাহলে এই পাথরের মূর্তি আছে কী করে?' উদয় বলল।

'এরা উধাও হবে না। এদের মুক্তি নেই। এরা এখানেই পড়ে থাকবে।' ওরা বলল।

'সে কী কথা! অহেতুক এতগুলো প্রাণ পাথর হয়ে পড়ে থাকবে?' উদয় অত্যন্ত দুঃখ পেয়ে বলল।

কিছুক্ষণ পরে উদয় বলল, 'আমার ভাই নিশীথ এই পাথরের মূর্তিগুলোর মধ্যে নেই তো? দাড়িওয়ালা বেঁটে লোকটা কোথায় গেছে? সেও কি পাথর হয়ে গেছে? আর রাজকুমারীরা গেল কোথায়? খোঁজ করতে হবে এদের।'

'চলুন।' রাক্ষসের অনুচরগুলো বলল।

'তোমরা থাক। সবাই খুঁজতে বেরুলে কাজ এগোবে না।' উদয় বলল।

ওরা সেখানেই রইল। উদয় বেরুল। সঙ্গে নিল সন্ধ্যাকুমারকে। প্রথমেই সে গেল প্রতাপসিংহের দেশে।

উদয়ের প্রশ্ন শুনে রাজা প্রতাপসিংহ বলল, 'না তো, আমার এখানে তো কেউ আসেনি। তোমার যে আবার দেখা পাব এ আমি ভাবতেই পারিনি। ওই রাক্ষসটাকে এড়িয়ে আবার এলে কী করে?'

'রাক্ষসের খবর জানি না। তবে ওর অট্টালিকা ভেঙে ময়দান করে দিয়েছি। যাই হোক, এখন আমাকে খুঁজে বের করতেই হবে নিশীথ আর রাজকুমারীদের। ওরা যাবে কোথায়?' উদয় বলল।

'আমার কোনো সাহায্যের দরকার হলে বল।' প্রতাপসিংহ সাগ্রহে বলল।

'আপনার আগ্রহই আমার যথেষ্ট।' বলে উদয় প্রতাপসিংহের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

* * *

নিশীথ প্রতাপসিংহের কথামতো তার দু-জন লোককে নিয়ে রওনা হয়েছিল। তাতেই তার কাল হল। নির্জন জায়গায় প্রতাপসিংহের ওই লোক দুটো নিশীথের গলা কেটে মাটিতে পুঁতে রেখে চলে গেল। পরের দিন একজন ঋষি ওই পথে যাচ্ছিলেন। গন্ধ পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মাটি খুঁড়ে নিশীথের মুণ্ডু আর দেহ তুলে নিজের আশ্রমে নিয়ে গেলেন। তাঁর আশা ছিল একদিন না একদিন ওই মৃতদেহের আপনজন খোঁজ করতে করতে আসবে।
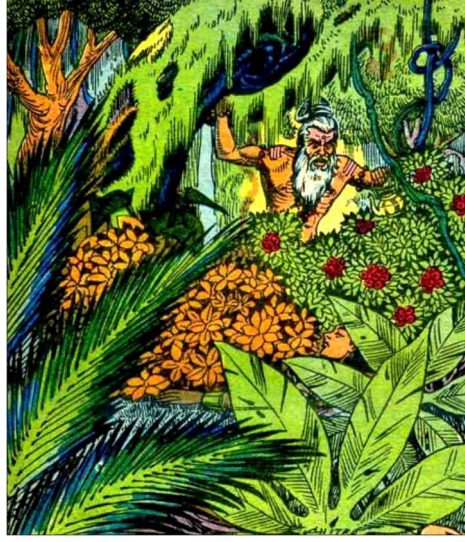
কিছুদিনের মধ্যেই দানশীল মহারাজের মন্ত্রী ওই আশ্রমে এল। নিশীথের মুখ দেখে মন্ত্রী চিনতে পারল। পেরেই আর্তনাদ করে উঠল, 'আহা, একি হল। এ যে আমাদের লোক। একে দেখলে তো আমার রাজা মূর্ছা যাবেন।'

'বাবা শোনো, এখানে দুঃখ করে কোনো লাভ হবে না। আমি এই মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার করতে পারব না। তবে এই দেহটাকে অক্ষত রাখতে পারি। তবে তারজন্য আমাকে এই দেহের সঙ্গে থাকতে হবে। তাই বলছি, চল। দু-জন মিলে এগিয়ে যাই।' ঋষি বললেন।

'এর বেশি আমি আর কিছু চাই না। নিশীথের দেহ যদি অক্ষত থাকে ভবিষ্যতে একটা ব্যবস্থা হবে। এই দেহ নিয়ে কোনোরকমে শ্রাবস্তী নগরে পৌঁছতে পারলেই যথেষ্ট।' মন্ত্রী বলল।

ঋষি ও মন্ত্রী নিশীথের মৃতদেহ নিয়ে শ্রাবস্তী নগরে কিছুদিনের মধ্যেই পৌঁছে গেল। নিশীথের মুখ দেখে সবাই গভীর দুঃখ পেল। যে দেখল তারই বুক ফাটতে লাগল। উদয়, সন্ধ্যাকুমার তাদের ভাই নিশীথের কাটা মুণ্ডু দেখে দুঃখে ভেঙে পড়ল। কারো মাথায় কোনো বুদ্ধি খেলছিল না। প্রত্যেকেই নিশীথের মুখের দিকে তাকিয়ে পাথরের মতো বসে ছিল। এমন সময় দাড়িওয়ালা পৌঁছে গেল।

তাকে দেখে সবাই অবাক। কিছুদিন ধরে দাড়িওয়ালাকে রাক্ষসটা সন্দেহ করছিল। তাই রাক্ষসটা যখন বেরোত বেঁটে লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে যেত।

রাক্ষস আকাশ পথে দাড়িওয়ালাকে নিয়ে উড়ছিল। নীচে সমুদ্র, উপরে আকাশ। ওদিকে উদয় যখন তরবারির এক কোপে বাজ পাখিটাকে কেটে ফেলেছিল তখন সেই আঘাত উড়ন্ত বাজ পাখির গায়ে লাগল মুহূর্তে বাজ পাখি রাক্ষসের আসল রূপ ধরল। এবং কাটা অবস্থায় আকাশ থেকে চরকি খেতে খেতে সমুদ্রে পড়ে গেল। দাড়িওয়ালাকেও সমুদ্রের জলে পড়তে হল।

তারপর অনেক পরিশ্রম করে, বুদ্ধি খাটিয়ে দাড়িওয়ালা সমুদ্রের তীরে দু-দিনের মধ্যেই পৌঁছাতে পারল।

রাক্ষস ভবনের অবস্থা বেঁটে লোকটা অনুমান করতে পারল। সে বুঝল, রাক্ষসের যখন মৃত্যু ঘটেছে তখন ভবনটিরও কিছু নেই। তারপর সে সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল কোনদিকে যাবে। ভাবতে ভাবতে সমুদ্রের তীর থেকে লোকালয়ের দিকে হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে নগরে পৌঁছে গেল। সেখানে জানতে পারল যে সেই নগরীর নাম শ্রাবস্তী নগর। জেনে সে খুব খুশি হল।

মহা উৎসাহে বেঁটে লোকটা রাজধানীর দিকে হাঁটতে লাগল। এক জায়গায় অনেকগুলো লোককে জড়ো হতে দেখল। কান্নাকাটি শুনতে পেল।

দাড়িওয়ালা বহুদিন রাক্ষসের অধীনে ছিল। সে দিনকে রাত, রাতকে দিন করার ক্ষমতা শিখে নিয়েছিল। আস্তে আস্তে ভিড় ঠেলে এগিয়ে গিয়ে সকলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কোনো ভয় নেই।'

তারপর আস্তে আস্তে উদয়ের কাছে গিয়ে বলল, 'আমি বুঝতে পেরেছি কে এই কাজ করেছে। এসব প্রতাপসিংহের কাণ্ড। অঞ্জন ও ভস্ম হাতিয়ে নেবার লোভেই প্রতাপসিংহ এই অপকর্ম করেছে। যেকোনোভাবে ওই অঞ্জন ও ভস্ম পেতে হবে। তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে।'

উদয় আর একমুহূর্ত সেখানে রইল না। দানশীল মহারাজের সেনাবাহিনী ও দাড়িওয়ালাকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হয়ে গেল মালব দেশের দিকে। সমস্ত রাজধানী আলোয় আলোয় সেজেছিল। উদয় জিজ্ঞেস করে জানতে পারল যে সেই রাত্রেই তিনটি রাজকুমারীর সঙ্গে রাজা প্রতাপসিংহের বিয়ে হবে। তিন জনেই

প্রতাপসিংহের রানি হবে। এত বড়ো ঘটনা কোনোদিন কোথাও ঘটেনি। তাই গোটা নগরী এত সুন্দর ভাবে সেজেছে।

উদয় ভাবল, বেঁটে লোকটা প্রাতাপসিংহকে ঠিক চিনতে পেরেছে। গোপনে উদয় ও দাড়িওয়ালা রাজভবনে ঢুকল। লক্ষ করল, সুহাসিণী, সুভাষিণী ও সুকেশিণী পাশাপাশি তিনটি পিঁড়িতে বসে আছে। বিয়ের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ। সামনের পিঁড়িতে রাজা প্রতাপসিংহ তিনটি রাজকুমারীকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তুত।

ভীষণ রেগে গিয়ে উদয় তৎক্ষণাৎ তরবারিতে হাত দিল। দাড়িওয়ালা সঙ্গেসঙ্গে উদয়ের হাত চেপে ধরল। ইতিমধ্যে দাড়িওয়ালার নির্দেশে ছদ্মবেশে দানশীল মহারাজের সেনারা বিয়ের পিঁড়ির কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। ইশারা পেয়েই ওই সেনারা রাজা প্রতাপসিংহকে ঘিরে ফেলে বন্দি করল।

উদয়ের চাপে পড়ে প্রতাপসিংহ নিজের সমস্ত অপকর্ম স্বীকার করল। ভস্ম ও অঞ্জন উদয়ের হাতে দিয়ে তাকে ও দাড়িওয়ালাকে প্রণাম করে প্রতাপসিংহ বলল, 'আমি যা করেছি ভুল করেছি। আমাকে ক্ষমা করুন।'

অনেক ঝড়ঝাপটার পরে জীবনের এক ভয়ংকর মুহূর্তে উদয়কে আবার দেখতে পেয়ে রাজকুমারীরা অবাক হল।

উদয়ের একটি হাত যে খণ্ডিত সে-কথা সকলের নজরে না পড়লেও বেঁটে লোকটার নজরে পড়েছিল। সে জানে তার হাতের ওই খণ্ডিত অংশ কোথায় পড়ে আছে। তৎক্ষণাৎ বেঁটে লোকটা যেখানে পাতালভবন ছিল সেখানে গেল। সেখান থেকে হাতের ওই খণ্ডিত অংশ এনে উদয়ের হাতের সঙ্গে জুড়ে অঞ্জন লাগিয়ে দিল। উদয় নিজের হারানো হাত ফিরে পেল।

যে মুহূর্তে রাক্ষস মারা গেল সেই মুহূর্তেই সে যার উপর বা যে জিনিসের উপর জাদু প্রয়োগ করেছিল তার ক্ষমতা লোপ পেল। তাই রাক্ষস মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মূক রাজকুমারীরা কথা বলার ক্ষমতা ফিরে পেল। ওরা এখন আগেকার মতোই সুললিত কণ্ঠেই কথা বলে।

শুধু হারিয়ে যাওয়া রাজকুমারীদেরই নয়, নতুন একটি দেশ জয় করে উদয় শ্রাবস্তী নগরে পৌঁছাল। পৌঁছেই দাড়িওয়ালা ভস্ম ও অঞ্জন প্রয়োগ করে নিশীথের কাটা মুণ্ডু জুড়ে দিল।

শ্রাবস্তী নগরের প্রজারা দু-হাত তুলে উদয় এবং তার ভাইদের কৃতজ্ঞতা জানাতে লাগল। অল্প সময়ের মধ্যেই সকলের উৎসাহে একটি সুসজ্জিত মঞ্চ তৈরি হয়ে গেল। সেখানে রাজা দানশীল প্রজাদের সামনে দাঁড়িয়ে উদয়ের হাতে সুহাসিণীর হাত রাখলেন, সন্ধ্যাকুমারের হাতে রাখলেন সুভাষিণীর হাত আর নিশীথের হাতে রাখলেন সুকেশিণীর হাত। তিন জোড়া দম্পতিকে শুধু রাজা ও রানি নয়, মালব দেশের সমস্ত প্রজা দু-হাত তুলে আশীর্বাদ করতে লাগল।
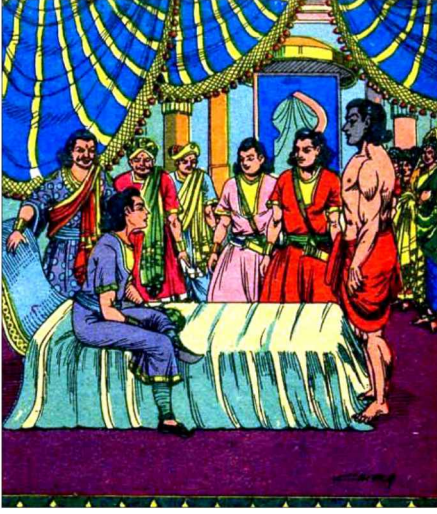
দানশীল মহারাজ, উদয়, সন্ধ্যাকুমার ও নিশীথ এমনকী দাড়িওয়ালা বেঁটে লোকটারও অন্যের রাজ্য দখল করে, বা দখলে রেখে শাসন করার ইচ্ছে ছিল না। তাই অনুতপ্ত প্রতাপসিংহকে ক্ষমা করে তার রাজ্য তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হল। দানশীল মহারাজ দাড়িওয়ালাকে অতিথি হিসাবে তার দেশে থেকে যেতে বললেন। কিন্তু চির ফকির দাড়িওয়ালা কোনো একটি দেশে পড়ে থাকতে রাজি হল না। প্রয়োজনে উদয়কে সাহায্য করাই যেন তার ব্রত ছিল।

দানশীল মহারাজ শ্রাবস্তী নগরকে তিন ভাগ করে তিন দম্পতিকে দিতে চাইলেন। তখন উদয় ডিমের মতো দেখতে যে হিরা, সোনা ও রুপার ডিম এনেছিল সেগুলো বের করল। দেখে দাড়িওয়ালা খুব খুশি হল।

দাড়িওয়ালার নির্দেশে প্রথমে হিরার ডিম ফাটানো হল। যেখানে সেই ডিম ফাটল সেখানে হিরের বাড়ি তৈরি হয়ে গেল। যেখানে সোনার ডিম ফাটানো হল সেখানে সোনার অট্টালিকা তৈরি হয়ে গেল। আর যেখানে রুপার ডিম ফাটানো হল সেখানে রুপোর ভবন তৈরি হয়ে গেল। তিনটি বাড়িতে উদয়, সন্ধ্যাকুমার ও নিশীথ সস্ত্রীক বাস করতে লাগল।

এত সুখের মধ্যে থেকেও উদয়, সন্ধ্যাকুমার ও নিশীথ রাক্ষস ভবনের ওই পাথরের মূর্তিগুলোর কথা ভোলেনি। ওরা শ্বেত পাথর দিয়ে আলাদা একটি ভবন তৈরি করল। শহীদ স্মৃতিতে ওই পাথরের মূর্তিগুলো এনে সেই শ্বেতভবনের চারদিকে থাম তৈরি করে ওই থামের উপরে মূর্তিগুলো রাখল।

প্রাচীন কালে কুণ্ডলিনী দ্বীপের রাজা ছিল চিত্রসেন। দু-বছরের মধ্যেই চিত্রসেন প্রজাদের মঙ্গলের জন্য অনেক কাজ করেছিল। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জলসেচের ব্যবস্থা করেছিল। ফলে ভালো চাষ হল। প্রজাদের ঘরে ঘরে নবান্নের উৎসব হল। রাজা চিত্রসেনের ভীষণ ইচ্ছা ছিল রামরাজ্য বলতে যা বোঝায় নিজের রাজ্যকে সেভাবে গড়া। প্রজাদের কর অর্ধেক কমিয়ে দিয়েছিল।

রাজার দানধর্ম, প্রজাদের প্রতি তার দরদ, কর অর্ধেক কমিয়ে দেওয়া প্রভৃতি বিষয় লক্ষ করে প্রজারা চিত্রসেনকে শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রশংসা করত। সারা দেশের আনাচেকানাচে রাজা চিত্রসেনের গুণকীর্তন হল।

বেশ চলছিল। কিন্তু ওদিকে রাজার প্রশংসা যত বাড়তে লাগল এদিকে রাজার কোষাগারের অর্থ তত কমতে লাগল। দানধর্মের বিষয়ে এত বেশি খরচ হলে রাজকোষাগারে টান পড়া স্বাভাবিক। আর রাজকোষাগারে টান পড়লে রাজার উদ্যোগে যেসব বড়ো বড়ো কর্মকাণ্ড হওয়ার কথা সেগুলো ঠিক ঠিক ভাবে হয় না এবং না হওয়ার ফলে প্রজাদের সুবিধাও কমে।

চিত্রসেনের প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত সূক্ষ্মবুদ্ধির লোক ছিল। দূরদর্শিতাও তার ছিল। এইভাবে খরচ হতে থাকলে পরিণতি যে কী হবে সে বিষয়ে তার পরিষ্কার ধারণা ছিল এবং ছিল বলেই ভবিষ্যতে কোন অবস্থায় পড়তে হবে সেটাও

ছিল তার নখদপর্ণে। এ বিষয়ে মাঝে মাঝে রাজার সঙ্গে সে পরামর্শও করত। সব কথা শুনেও রাজা চিত্রসেন বলত, 'পরিণতি যাই ঘটুক, আমার শাসনকালে প্রজাদের মঙ্গলের জন্য আমি কিছু করে যেতে চাই।'

শেষে একদিন মন্ত্রী পরিষ্কার ভাষায় রাজা চিত্রসেনকে বলল, 'মহারাজ, এতকাল যেভাবে যা করেছেন তাতে প্রজাদের মঙ্গল হয়েছে। কিন্তু এখন কোষাগারে অর্থ এত কমে গেছে যে আর নতুন প্রকল্প কার্যকরী করা যাচ্ছে না। দেশে যদি নতুন নতুন কাজ না হয়, প্রজাদের মঙ্গল করার উদ্দেশ্য যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে নিছক অলংকৃত করার জন্য আমার এই প্রধানমন্ত্রীর পদে থাকার কোনো অর্থ হয় না। তাই অনুগ্রহ করে আমাকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দিন। আমার এই প্রার্থনা মঞ্জুর হলে আমি বাধিত হব।'

'কোষাগারের অবস্থা এতটা খারাপ হয়ে গেছে প্রধানমন্ত্রী?' বিস্ময়ের সঙ্গে রাজা প্রশ্ন করল।

'তাহলে আর কী বলছি মহারাজ, রাজকর্মচারীদের মাহিনা ঠিক সময়ে দেওয়া যাচ্ছে না। সৈনিকদের মাহিনা বাকি পড়ে গেছে। কোষাগারে যা আছে তাতে রাজ উদ্যানের মালীর মাহিনা দেওয়া যাবে, অন্য কিছু হবে না। অথচ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মাত্র এক হপ্তার মধ্যে রাজকর্মচারী, সৈনিক প্রত্যেকের মাহিনা মিটিয়ে দেওয়ার কথা।' মন্ত্রী বলল।

রাজা চিত্রসেন কিছুক্ষণ ভেবে বলল, 'প্রধানমন্ত্রী, কালকে রাজসভা বসবে। এটা বর্ধিত আকারে হবে। এই সভায় থাকবে রাজকর্মচারীগণ, দেশের গণ্যমান্য নাগরিকেরা এবং সচরাচর যারা থাকে তারাও।'

প্রধানমন্ত্রী বলল, 'ঠিক আছে মহারাজ।' বলে বাইরে আসতে-না-আসতেই তার মনে প্রশ্ন জাগল, 'রাজার এই সভা এত বর্ধিত আকারে ডাকার কী অর্থ হতে পারে? কী হবে এই সভায়?'

সারা দেশে ঘোষণা করে দেওয়া হল এই রাজসভার বিষয়ে। এই ঘোষণা যারা

শুনল তাদের মনে নানা ধরনের প্রশ্ন জাগল, রাজা যে দয়ালু, দানধর্ম করতে আগ্রহী সেটা সবাই জানে। কোনো কোনো প্রজা বলল, 'এবারে হয়তো রাজা সমস্ত কর তুলে দেবে। আমাদের আর এক পয়সাও কর দিতে হবে না।' এইভাবে নানা জনের নানা মত মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

পরের দিন বর্ধিত রাজসভা বসল। দেশের গণ্যমান্য প্রজা ও রাজকর্মচারীগণের উপস্থিতির ফলে এই সভা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। সভা গমগম করতে লাগল। চিত্রসেন এসে সিংহাসনে বসল। তারপর তার নির্দেশে সভার কাজ শুরু করল প্রধানমন্ত্রী। রাজার বক্তব্য প্রধানমন্ত্রী এইভাবে বলল, 'উপস্থিত নাগরিকগণ, কর্মচারীগণ, আজ আমাদের দেশে একটি নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে। আপনারা জানেন আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের কর কমাতে কমাতে নামমাত্র কর রাখা হয়েছে। ফলে অতীতে দেশের অর্থভাণ্ডারে যত অর্থ সংগৃহীত হত তার তুলনায় এখন অত্যন্ত কম হয়। এ ছাড়া বন্যার ফলে দেশের বিভিন্ন জায়গায় সাহায্য বাবাদ অনেক অর্থ খরচ হয়ে গেছে। নামমাত্র কর আদায় করার ফলে দেশের রাজকোষাগারে যা হওয়া উচিত তাই হয়ে উঠেছে। অর্থের সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করেছে।'
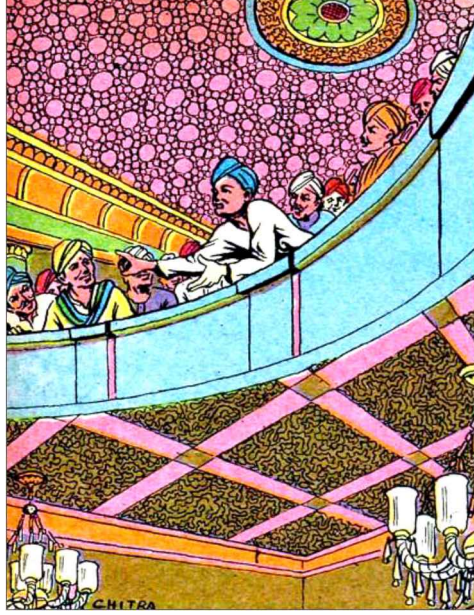
এতটা বলে প্রধানমন্ত্রী ঢোঁক গিলে অন্য কোনো কথা বলার আগেই একজন সভার মাঝখান থেকে উঠে বলল, 'প্রজাদের ঘাড়ে কর না চাপালে কি দেশ শাসন করা যায়?'

এই একটি কথা সভার মধ্যে গুঞ্জনের সৃষ্টি করল। প্রধানমন্ত্রী বিভ্রান্ত হল। কী যে বলবে কিছুক্ষণ তাকে ভাবতে হল। তার পর প্রধানমন্ত্রী বলল, 'দেশের এই সংকটজনক অবস্থা সবাইকে ভাবতে হবে। দেশের সমস্যা নিয়ে দেশবাসী যাতে চিন্তা করে তারজন্যই এই সভা ডাকা হয়েছে। আপনারা জানেন, আমাদের দেশের জনসংখ্যা কত? এতগুলো মানুষের সুখী জীবনের

জন্য কত অর্থ খরচ করতে হবে সেটা গভীরভাবে চিন্তা করার বিষয়। রুগিদের রোগ সারানো জরুরি কাজ। ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো একটি দেশের কাজ। শুধু তাই নয়, প্রতিটি প্রকল্প যাতে ঠিক ঠিক ভাবে ঘোষিত সময়ের মধ্যে হয়ে যায় সেটাও দেখা দরকার। সর্বোপরি যেকোনো দেশে রাজা যেকোনো সময়ে আক্রমণ করলে তার প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আমাদের রাখতেই হবে। আমরা শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে চাইলেও যারা অশান্তি চায় তাদের সংখ্যাও কম নয়। তাই কর যে কেন নেওয়া হয়, করের টাকা যে কোন কোন কাজে খরচ হয় সেটা দেশের সবাইকে উপলব্ধি করতে হবে।' এতটা বলার পর রাজা উশখুশ করতে লাগল। তার হাবভাব দেখে প্রধানমন্ত্রীর মনে হল, রাজা এবার কিছু বলতে চায়। তাই সে চুপ করে গেল।

'প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ নিঃসন্দেহে ভালো হয়েছে। কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন, কর বাড়িয়ে দিলেই কি প্রজাদের কাছ থেকে আদায় করে ফেলা যাবে?' রাজার এই কথা নিয়ে আবার গুঞ্জন উঠল। গোটা সভার মধ্যে তর্কবিতর্ক শুরু হল। এমন সময় হঠাৎ একজন উঠে নির্ভয়ে বলল, 'মহারাজ, বিশেষ অবস্থা বিবেচনা করেই কর কমানো হয়েছে। এখন যদি আবার বাড়ানো হয় তাহলে হয়তো নতুন সমস্যা দেখা দিতে পারে। শুধু আমাদের দেশেই নয়, বিদেশেও আমাদের দেশের রাজার যে প্রশংসা ছড়িয়ে পড়েছে সেই খ্যাতি কমে যেতে পারে। কারণ কর বাড়ালেই প্রজারা কষ্ট পাবে। কষ্ট পেলে প্রশংসা করবে না। সেই সুযোগে কিছু লোক নিন্দে করবে। ফলে রাজার গৌরব কর্পূরের মতো উবে যাবে। আমি একজন প্রজা হিসেবে কখনোই চাইব না যে রাজার গৌরব নষ্ট হোক। কারণ আমি ভালোভাবে জানি রাজার সম্মান দেশের সম্মান।'

প্রজার মুখে এই কথা শুনে রাজা চিত্রসেনের ভালো লাগল। সত্যিই তো সিংহাসনে বসার পর থেকে যে গৌরব অর্জিত হয়েছে, করের বোঝা চাপালেই চোখের পলকে তা উবে যাবে। তাই যে কর কমানো হয়েছে তা বাড়ানো উচিত নয়। রাজকোষাগারের অর্থ বাড়ানোর জন্য অন্য কোনো পন্থা সন্ধান করা উচিত। কিছুক্ষণ চিন্তা করে রাজা চিত্রসেন বলল, 'প্রজাদের অবস্থা বুঝেই আমরা করের বোঝা লাঘব করেছি। আর সেই বোঝা বাড়াতে চাই না। নতুন করে কর চাপানোর প্রশ্নই ওঠে না। এটা আমারও ইচ্ছা। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য থেকে দেশের অবস্থা পরিষ্কার হয়েছে। এখন কীভাবে দেশের অর্থ বাড়ানো যায় সেটা ভাবতে হবে।'

সভা নিস্তব্ধ হয়ে গেল। সভায় যারা উপস্থিত ছিল তারা একে অন্যের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। এই অবস্থায় কি বলা উচিত তা কেউ ভেবে পেল না। এইভাবে অনেকক্ষণ কেটে গেল।

তারপর দেশের সেনাপতি উঠে বলল, 'মহারাজ, দেশের কোষাগারের অর্থ বাড়ানো বিরাট কোনো সমস্যা নয়। আমরা সহজেই এই সমস্যার সমাধান করতে পারি। কিন্তু এই সমাধানের কথা আমি সকলের সামনে বলতে চাই না। গোপনে একমাত্র আপনাকেই এই সমাধানের কথা বলতে চাই।'

সেনাপতির এই কথা শুনে যে যাই বুঝুক, সবাই কিন্তু হাততালি দিল। তারপর সভা ভেঙে গেল। যে-যার বাড়ি চলে গেল।

সেইদিন রাত্রে সেনাপতি সমরসেন রাজার সঙ্গে গোপনে উদ্যানে দেখা করে বলল, 'মহারাজ, আমাদের দেশের সমস্যা নিয়ে আমি ভেবেছি। উন্নয়নমূলক অনেক কাজ আপনি করেছেন। কিন্তু আপনার প্রজাদের অবস্থা এখনও এতটা ভালো নয় যে কর বাড়ালেই তারা দিতে পারে। সবদিক ভেবে প্রজাদের সুখ এবং রাজকোষাগারে অর্থ যদি বাড়াতে হয় তাহলে পররাজ্যে গিয়ে লুণ্ঠন করা ছাড়া আমাদের সামনে আর কোনো পথ খোলা নেই। শাস্ত্র অনুসারে, দেশের স্বার্থে লুণ্ঠন অন্যায় নয়। এটা একটা রাজধর্ম। দেশে বছরের পর বছর প্রজাদের অর্থে সেনাবাহিনী রাখা হয়। তাদের পেছনে দেশবাসীর প্রচুর অর্থ খরচ করা হয়। আর দেশের সমস্যার সময় সেই সেনাবাহিনীকে যদি ব্যবহার করা না হয় তাহলে কীসের জন্য কোন স্বার্থে এই সেনাবাহিনী রাখা হল?'

রাজা চিত্রসেন কিছুক্ষণ ভেবে বলল, 'সমরসেন, রাজকোষাগারে অর্থ বাড়ানোর জন্য তুমি যে পন্থা বলেছ, তা সত্যি গ্রহণযোগ্য। কিন্তু এতে তো নতুন সমস্যা দেখা দিতে পারে। আমাদের দেশ হল একটি দ্বীপ। সমুদ্র পেরিয়ে অন্য দেশে গিয়ে, সেই দেশের সেনাবাহিনীকে জব্দ করে আমাদের লুণ্ঠন করে আনতে হবে। এর জন্য কত বড়ো বাহিনী থাকা দরকার? কত জনের বাহিনী হলে এই ধরনের আক্রমণাত্মক লুণ্ঠনের কাজ সম্ভব হয়— তা কি তুমি ভেবে দেখেছ? কত জাহাজ লাগবে চিন্তা করেছ?'

'মহারাজ, নৌবাহিনী, স্থলবাহিনী সব বিষয়ে পুরোপুরি দায়িত্ব আমার উপর ছেড়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।' সেনাপতি বলল।
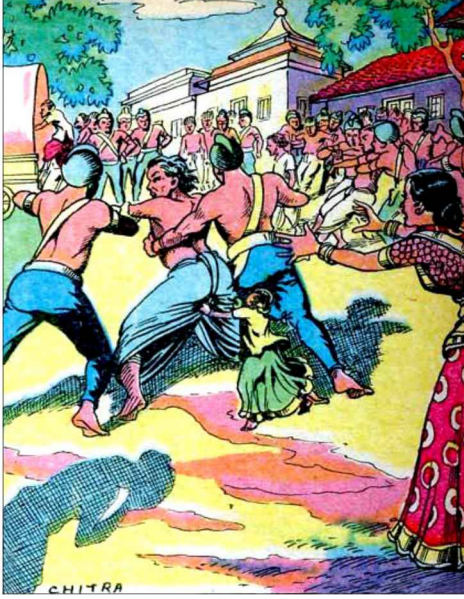
'ঠিক আছে, তোমার উপরেই সেই দায়িত্ব দিচ্ছি। তোমাকেই সমস্ত দিক দেখতে হবে। সেনাবাহিনীতে লোকসংখ্যা বাড়ানোর দায়িত্ব তোমার। তোমাকে এই বিশেষ ক্ষমতা দিচ্ছি। যখন যেখানে প্রয়োজন হবে তুমি এই চিহ্ন দেখাতে পার।' বলে রাজা নিজের আংটি খুলে সেনাপতিকে দিয়ে দিল।

সেনাপতি রাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সেনাবাহিনীর দলপতিদের সভা ডেকে রাজার সঙ্গে তার যে কথা হয়েছে সেই বিষয়ে আলোচনা করল। সব কথা শেষে সমরসেন বলল, 'এখন প্রশ্ন হল, আমরা যখন অন্য দেশ আক্রমণ করতে এবং সেই দেশের ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন করতে চলে যাব তখন দেশে অনেক কিছু ঘটতে পারে। একটা কথা আমাদের সবাইকে মনে রাখতে হবে, সেটা হল আমরা কিন্তু অন্য দেশ জয় করতে যাচ্ছি না, লুণ্ঠন করতে যাচ্ছি। উদ্দেশ্য, আমাদের দেশের অর্থভাণ্ডার বাড়ানো। যাই হোক, প্রথমে আমাদের যেটা করতে হবে, সেনাবাহিনীতে লোক বাড়ানো। আর একটা ব্যবস্থা করতে হবে, এই দ্বীপ থেকে আমাদের যাওয়ার পর, এই দ্বীপ যাতে সুরক্ষিত থাকে তার ব্যবস্থা করা। কারণ আমাদের অনুপস্থিতির সময় কোনো রাজা যদি আক্রমণ করে, সেই আক্রমণের প্রতিরোধ করার ক্ষমতা সেইসময় আমাদের রাজার যেন থাকে। আর একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, দেশে যখন অর্থনৈতিক সংকট দেখা যায় তখন দেশের মানুষ ক্ষুব্ধ থাকে। তারা বিদ্রোহ করতে পারে। তাদের বিদ্রোহ ন্যায়সঙ্গত হলেও সেনাবাহিনীর কর্তব্য হচ্ছে বিদ্রোহকে দমন করা।'

এমন সময় এক বৃদ্ধ বলে উঠল, 'আমার ধারণা, দেশে যখন সংকট দেখা দেয় তখন বিদ্রোহ করলে একমাত্র যুবকরাই বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কাজেই প্রথমে আমরা যদি দেশের সমস্ত যুবকদের সেনাবাহিনীতে ঢুকিয়ে নিতে পারি তাহলে এক ঢিলে দুটো পাখি মরবে। সেনাবাহিনী শক্তিশালী হবে এবং কোনো যুবকের বিদ্রোহী হওয়ার কোনো আশঙ্কা থাকবে না। সেনাবাহিনীতে

যুবকদের টানার জন্য প্রয়োজন হলে মিথ্যা কথাও বলা যেতে পারে। প্রলোভন দেখিয়ে যুবকদের নিতে হবে।'

তার এই কথা উপস্থিত সকলের ভালো লাগল। তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করার জন্য লোক বেরিয়ে পড়ল।

রাজার নির্দেশ বলে ঘোষণা করে প্রত্যেক গ্রাম থেকে যুবকদের সেনাবাহিনীতে নেওয়া হল। সব জায়গার যুবকরা সেনাবাহিনীতে সানন্দে আসেনি। বলপ্রয়োগ করে যুবকদের সেনাবাহিনীতে নিতে হয়েছে।

ওদের উপর আরও বেশি অত্যাচার করে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের হাত-পা বেঁধে রাজধানীতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যারা পালিয়েছিল তাদের মধ্যে কিছু লোক ছিল পণ্ডিত। ওদের ধারণা ছিল এসব সেনাপতির ব্যক্তিগত ইচ্ছেতেই হচ্ছে। রাজাকে বললে এর প্রতিবিধান হয়ে যাবে। তাই ওরা রাজার সঙ্গে গোপনে দেখা করে এইসব অত্যাচারের কথা জানাল। রাজা ওদের কথা শুনে বলল, 'তোমরা আমাকে প্রশংসা করে অনেক কাহিনি এবং কবিতা লিখেছ। তোমরা কি চাও তোমাদের সেইসব প্রসংশা ধুলোয় মিশে যাক?'

শুভমুহূর্ত দেখে কুণ্ডলিনী দ্বীপের সেনাবাহিনী রওনা হওয়ার আগে রাজা বলল, 'তোমাদের যাত্রা শুভ হোক।'

ঠিক সেই মুহূর্তে আকাশের দক্ষিণ দিকে অতি দ্রুত প্রকাশমান একটি ধূমকেতু নজরে পড়ল। ওই ধূমকেতু দেখে সেনাবাহিনীর কেউ কেউ বলে উঠল, 'এই লক্ষণ অশুভ।'

রাজার পুরোহিত বলল, 'ওই ধূমকেতু যখন নজরে পড়ে গেছে তখন যাত্রা স্থগিত রেখে অন্য শুভমুহূর্তে যাত্রা শুরু করা ভালো।'

কিন্তু তার কথায় রাজা অথবা সেনাপতি কান দিল না।

তারপর রাজা ও সমরসেনের নির্দেশে সেনাবহিনীর জলযান রওনা দিল। যেদিকে ধূমকেতু দেখা গিয়েছিল সেই দক্ষিণ দিকেই ওরা এগোতে লাগল।

দুই

কুণ্ডলিনী দেশের সেনাবাহিনী রওনা হওয়ার সঙ্গেসঙ্গে দক্ষিণে দেখা দিল ধূমকেতু। সমুদ্রে জাহাজগুলো যখন এগিয়ে যাচ্ছিল তখন সমুদ্র ছিল শান্ত, হাওয়া ছিল অনুকূলে।

সেনারা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বিদেশের সন্ধানে রওনা হয়েছে। সেনাপতি সমরসেন জাহাজের এককোণে উঁচু জায়গায় বসেছিল। সে এক দৃষ্টিতে দক্ষিণে দৃশ্যমান ধূমকেতুর দিকে তাকিয়ে রইল।

দেখতে দেখতে দক্ষিণ দিকটা কালো মেঘে ঢেকে গেল। কিছুক্ষণ আগেও যে ধূমকেতু উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল ক্রমশ সেটা ঢাকা পড়ল ঘন মেঘের অন্ধকারে। ক্রমশ সমুদ্রের গর্জন বাড়তে লাগল। উত্তাল সমুদ্র তরঙ্গের গর্জন শুনে সৈনিকদের মধ্যে আতঙ্কের ছায়া নামল।

সমরসেন এক দৃষ্টিতে দক্ষিণের দিকে তাকিয়ে রইল। সেইসময় জাহাজের ক্যাপ্টেন তার কাছে এসে বলল, 'হে মহাসেনাধিপতি। আমাদের সেনাবাহিনীর লোকজন অত্যন্ত ভয় পেয়েছে। ওরা তীরে পৌঁছানোর জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। ওদের আর্তনাদ আর শুনতে পারছি না।'

সমরসেন বসেছিল, উঠে দাঁড়াল। তারপর একবার আকাশের দিকে আর একবার সমুদ্রের দিকে তাকাল। তারপর ক্যাপ্টেনকে বলল, 'কুণ্ডলিনী দেবী যদি করুণা করেন তাহলে আমরা অতি সহজেই লক্ষ্যে পৌঁছে যাব। আমার জীবনে পরাজয় কাকে বলে জানি না। আমাদের সৈনিকদের জানা উচিত তারা কার অধীনে আছে। আমি যতক্ষণ পরিচালনা করছি ততক্ষণ কোনোরকম বিপদের আশঙ্কা আছে বলে আমি মনে করি না। যান, আমার এই কথা ওদের জানিয়ে দিন।'

তারপর প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা কেটে গেল। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কোনো পরিবর্তন হল না। কখনো সমুদ্রের বড়ো বড়ো ঢেউ জাহাজে আছড়ে পড়ছিল। ক্রমশ ঘন কালো মেঘ যেন নামতে নামতে আরও অনেক নীচে এসে গিয়েছিল। তার সঙ্গে ছিল ঝড়। বাতাসের গতিবেগ যে এত তীব্র হতে পারে সমরসেনের তা জানা ছিল না।

সেই ঝড়ের মুখে জাহাজগুলো আর চালকের ইচ্ছানুযায়ী নির্দিষ্ট দিকে এগোতে পারেনি। জাহাজগুলো ঝড়ের ঠেলায় ভেলার মতো এগিয়ে চলেছে। এক-একটা জাহাজ চলেছে এক এক দিকে। এখন সৈনিকরা প্রাণ বাঁচানোর জন্যে যাকে পাচ্ছে তাকেই অনুরোধ করছে, 'যে যেদিকে পার ছুটে যাও।'

যত রাত বাড়তে লাগল তত তুফানের তীব্রতা বাড়তে লাগল। জাহাজে

জাহাজে ধাক্কাধাক্কি হতে লাগল। জাহাজগুলো অনেক দামি হওয়ায় সেগুলো ভেঙে চুরমার হয়ে যায়নি।

ঠিক এই পরিস্থিতি দেখে সমরসেনও মনে মনে ভয় পেয়েছিল। সেই অন্ধকারে ক-টা জাহাজ যে ডুবে গেছে, কোনটা যে কোথায় গেছে তাও বোঝা যাচ্ছিল না। সূর্য উঠলে বোঝা যাবে ক-টা সৈনিক ডুবলো, ক-টা জাহাজ জলের তলায় তলিয়ে গেল, আরও কত রকমের ক্ষতি হল। এখন আর কিছু করার নেই— এ-কথা ভেবে সমরসেন গেল নিজের ঘরে। এই ঘরেই আছে কুণ্ডলিনী দেবীর মূর্তি। সে মূর্তির সামনে বসে দেবীর পুজো করতে লাগল।
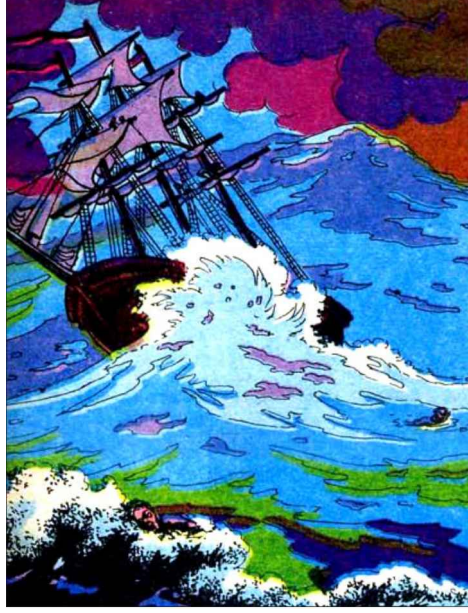
কয়েক ঘণ্টা পরে ভোর হল। সূর্য উঠল। ঝড় থামল। আকাশ হল মেঘ মুক্ত। আকাশে আর সেই কালো রং নেই। দেবী কুণ্ডলিনীর সামনে বসে সমর সেন শুনতে পেল সৈনিকদের ডাক, 'আপনি বেরিয়ে আসুন। দয়া করে একবার নীচে নেমে আসুন। সমুদ্র শান্ত, ঝড় থেমে গেছে। আমরা এখন কোথায় যাব, কি করব ভেবে পাচ্ছি না। দয়া করে বলুন।'

সমরসেনের মনে হল তার মাথা থেকে যেন এক বিরাট বোঝা নেমে গেছে। সেই দেবী মূর্তির সামনে থেকে উঠে সে শান্ত মনে চারদিকে তাকাল। যতগুলো জাহাজ নিয়ে সে বেরিয়েছিল তার অর্ধেক সংখ্যক জাহাজও কাছাকাছি ছিল না। অনেক দূরে এক-একটা জাহাজ ভাসতে দেখা গেল।

সমরসেন বুঝতে পারল বহু সৈনিক প্রাণ হারিয়েছে। কিছুক্ষণ ভেবে সে ঠিক করল, দূরে থাকা জাহাজগুলোকে আগে কাছাকাছি আনবে। তারপর সে তড়িৎ গতিতে নেমে গেল কাজে। প্রত্যেকটা জাহাজকে তীরে নোঙর ফেলতে বলল। ছোটো ছোটো নৌকায় সৈনিকদের পাঠিয়ে দিয়ে দূরের জাহাজগুলোকে কাছে ডেকে আনতে বলল।

তড়িৎ গতিতে কাজ হওয়ার ফলে কিছুক্ষণ আগে যে জাহাজগুলো দূরে
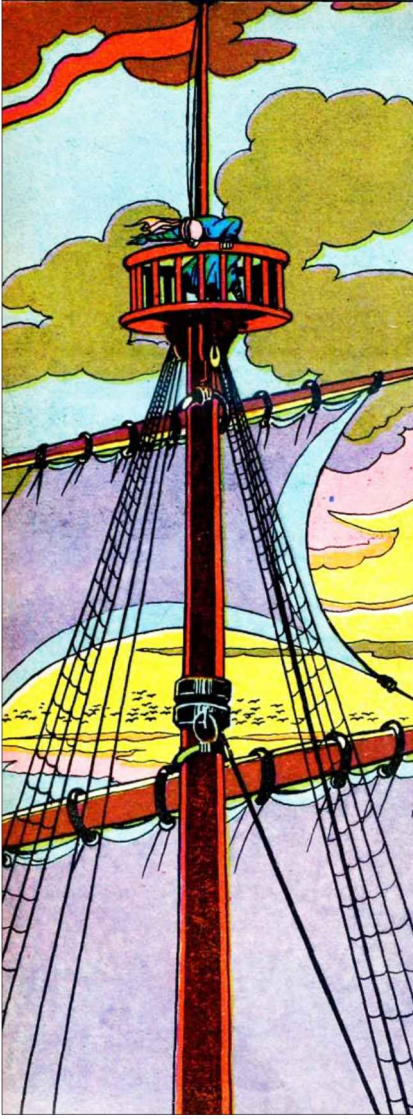
দূরে ছিল সেগুলো কাছাকাছি এল। সমরসেনের জাহাজকে ঘিরে অন্য জাহাজগুলো নির্দেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল। প্রত্যেকটি জাহাজে যে সৈনিকেরা ছিল তারা বাইরে এসে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইল।

যারা মাথা নত করে দাঁড়িয়েছিল তারা যে বিগত রাত্রে ঝড় তুফানের তীব্র গতিবেগের মুখে পড়ে আর্তনাদ করে উঠেছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না।

ওদের দিকে একবার চোখ ফিরিয়ে সমর সেন বুঝতে পারল ওদের মধ্যে কোনো উৎসাহ নেই, নেই কোনো উদ্দীপনা। এখনও তাদের মনে সমুদ্রের প্রচণ্ড রূপ উজ্জ্বল হয়ে আছে। সমরসেন তখন নিজেই বুঝতে পারছিল না সে কোথায় আছে। দেশের কোন প্রান্তে যে তার জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে তা সে অনুমান করতে পারল না। একজন সৈনিককে কাছে ডেকে, জাহাজের উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে কোথাও কোনো জমি দেখা যাচ্ছে কি না তা দেখতে বলল।

সৈনিকটি মাস্তুলে উঠে চারদিকে তাকাতে লাগল। সে তাকাচ্ছিল চারিদিকে আর অন্য সৈন্যরা তাকাচ্ছিল তার দিকে। সেখান থেকে সৈনিকটি চিৎকার করে বলল, 'কোথাও কোনো গাছপালা বা জমির চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি না। শুধু পূর্ব দিকে কিছু পাখি উড়ছে। পূর্ব দিকের পাখি ছাড়া আর কোনো দিকের কিছু নজরে পড়ছে না।'

এই কথা শুনে সমরসেন উল্লাসে জোরে বলে উঠল, 'জয় মা কুণ্ডলিনীর জয়!' তার সঙ্গে গলা জুড়ে সৈনিকেরাও উৎসাহের সঙ্গে চিৎকার করে উঠল, 'জয় মা কুণ্ডলিনীর জয়!' তাদের জয়ধ্বনি শুনে মনে হল যেন তারা কোনো দেশ জয় করেছে।

তারপর সমরসেনের নির্দেশে জাহাজগুলো যেদিকে পাখি উড়ছিল সেই দিকে এগোতে লাগল। যে সৈনিক উপরে উঠে পাখি দেখতে পেয়েছিল সে অন্য জাহাজকে ওই দিকে যাওয়ার জন্য ইশারা করল। ক্রমে সূর্য উপরে উঠে মধ্যাহ্ন হল। দুপুর থেকে বিকেল, বিকেল থেকে সন্ধে হয়ে এল। কিন্তু কোনো জমির চিহ্ন দেখা গেল না। সৈনিকদের মধ্যে সকালে যে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল সন্ধ্যার দিকে তা ক্রমশ কমতে লাগল। ওরা বলাবলি করতে লাগল, 'আর একটু পরেই অন্ধকার হয়ে যাবে চারদিক। আমরা কোথায় যাচ্ছি, কোন মহাসমুদ্রের দিকে এগোচ্ছি কিছুই বুঝতে পারছি না।'
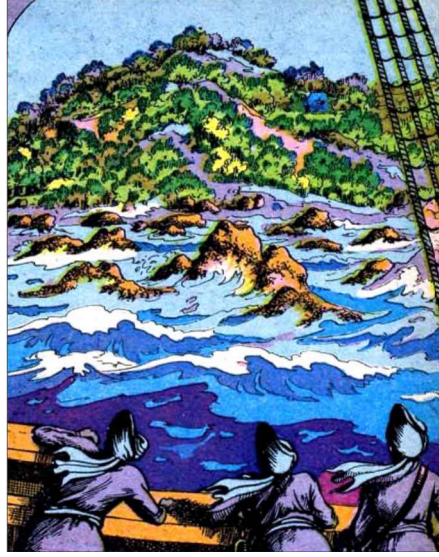
এমন সময় উপর থেকে যে সৈনিক চারদিকে নজর রেখেছিল সে আনন্দে চিৎকার করে উঠল, 'পেয়েছি! দেখতে পেয়েছি! জমি দেখতে পেয়েছি।' মুহূর্তে সৈনিকদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার এল।

জাহাজগুলো এগোতে লাগল, যেদিকে জমি দেখা গিয়েছিল সেইদিকে। ততক্ষণে সূর্যাস্ত হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যে সমস্ত জাহাজ একটা তীরের কাছাকাছি পৌঁছাল। দূর থেকে মনে হল সেটা একটা দ্বীপ। জাহাজ থেকে নেমে পড়ার জন্য প্রত্যেকটি সৈনিক ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। তীরে জাহাজ ভেড়ার সঙ্গেসঙ্গে সমস্ত সৈনিক যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ রইল না। এমন সময় সমরসেন গম্ভীর গলায় নির্দেশ দিল, 'আমার অনুমতি ছাড়া কেউ এক পা-ও নড়তে পারবে না, কেউ জাহাজ থেকে নামতে পারবে না।'

ওরা যে জমির সন্ধান পেয়েছিল সেটা ছিল সমুদ্রের মাঝখানে একটা ভয়ংকর দ্বীপ। ওই দ্বীপে রয়েছে কিছু পাহাড়। আর পাহাড়ের আশেপাশে আছে বিশাল আকারের গাছ। গাছের আলো-আঁধারি পরিবেশে রয়েছে নানা

ধরনের পশু। সেনাপতি সমরসেন ভাবল, 'এই ধরনের দ্বীপে সমস্ত সৈনিকের একসঙ্গে নেমে পড়া ঠিক হবে না।'

সমরসেন সেনাবাহিনীকে দুটো ভাগে ভাগ করে দিল। তার মধ্যে একটি ভাগের কিছু সৈনিককে একটি জাহাজে চাপিয়ে ওই দ্বীপে পাঠাবে ঠিক করল। ওরা দ্বীপে যাবে, দেখে আসবে, তারপর পরিস্থিতি বুঝে অন্যেরা যাবে কি না ঠিক করা যাবে। সমরসেন এখন ভাবছে, 'কোন কোন সৈনিককে দ্বীপে পাঠালে ঠিক ঠিক ভাবে দ্বীপের অবস্থা বোঝা যাবে। যে সৈনিক সাহসী, যার ধৈর্য আছে এবং উপস্থিত বুদ্ধিও যার প্রখর এমন যুক্তিবাদী সৈনিককে পাঠানোই ঠিক।'

তারপর সে ভাবল, শুধু অন্য সৈনিকদের উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায় না, তারও যাওয়া উচিত। অনেকক্ষণ ভেবে, চিন্তা করে শেষপর্যন্ত ছ-জন সৈনিককে বাছাই করল। এরা এর আগেও অনেক যুদ্ধ করেছে, যুদ্ধের অভিজ্ঞতাও তাদের গভীর। এই ধরনের ছ-জনকে নিয়ে সমরসেন নিজে একটা ছোটো জাহাজে করে সেই দ্বীপের দিকে রওনা দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেল সেই দ্বীপে।

দ্বীপে পা রেখেই সমরসেন বুঝতে পারল দ্বীপটা বড়ো নির্জন। চারদিকে তাকিয়ে একটা মানুষও দেখতে পেল না। লোকজন দেখা যাচ্ছে না বলে তো চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। তাই সে খাপ খোলা তরবারি নিয়ে এগোতে লাগল। না-জানি কেন তার মনে হল, 'মানুষ থাকলেও থাকতে পারে। যদি থাকে, গাছের আড়ালে থেকে তির যদি ছোড়ে, তাহলে তো প্রাণহানি ঘটতে পারে।'

কিছুক্ষণ পরে সমরসেন হঠাৎ এক ভয়ংকর জন্তুর গর্জন শুনতে পেল।

এই গর্জন শুনে একজন সৈনিক বলল, 'সেনাপতি, এই গর্জন মারাত্মক, ভয়ংকর।'

যে ক-জন সৈনিকের কানে ওই গর্জন গেল তাদের প্রত্যেকেই ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। ওদের অভয় দিয়ে সমরসেন এগিয়ে যেতে লাগল। সৈনিকরা তাকে অনুসরণ করল। কিছুদূর এগোনোর পর যা ওদের চোখে পড়ল তা দেখে চমকে উঠল।

জলাশয়ের অদূরে দুটো ভয়ংকর জন্তু পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। অন্য ধরনের কিছু জন্তু আশেপাশে, কিছুটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ওদের লড়াই দেখছিল। অদূরে দাঁড়িয়ে যেসব জন্তুগুলো দেখছিল তাদের মধ্যে বনমানুষের মতো একটা জন্তু রয়েছে। ওরা নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কথাও যেন বলছিল। বনমানুষের হাতে আছে পাথরের অস্ত্র।

সমরসেন ওদের লক্ষ করে সৈনিকদের বলল, ‘এই দ্বীপের জন্তুদের দেখতে অদ্ভুত।’

সেনাপতি সমরসেন ওদের যাই বলুক না কেন ওদের মন থেকে কিন্তু ভয় একটুও কমল না। ওরা বার বার ভাবতে লাগল, ‘এই ভয়ংকর জন্তুজানোয়ার ভরা জায়গায় আমাদের পক্ষে থাকা কি সম্ভব হবে?’

কিন্তু বেশিক্ষণ ভাবতে হল না। ভাবনাগুলো তছনছ হয়ে যেতে লাগল ভয়ংকর জন্তুর বিকট গর্জনের ফলে।

হঠাৎ একটা মস্ত হাতি ওই দিকে এগিয়ে এল। সমরসেন সৈনিকদের গাছে উঠে পড়তে বলল। ওদের গাছে ওঠার সঙ্গেসঙ্গে হাতির ওপর দুটো সিংহ ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল।

তিন

সমরসেন এবং তার সৈনিকরা গাছের ডাল এবং পাতার আড়ালে নিজেদের লুকিয়ে রেখে ওই বিচিত্র এবং ভয়ংকর জন্তুদের লড়াই দেখছিল। সিংহের খপ্পরে পড়ে গেল হাতি। সেই হাতি তার খপ্পর থেকে বেরিয়ে পালানোর চেষ্টা করছিল।

সমরসেনের কাছাকাছি ডালে যে সৈনিক ছিল সে সমরসেনকে বলল, 'সেনাপতি, আমরা ভয়ংকর খারাপ পরিস্থিতিতে পড়ে গেছি। এই দ্বীপ থেকে যদি পালাতে পারি তাহলে বুঝব আমাদের কপালের জোর আছে। আমার তো মনে হয় এই দ্বীপে টাকাপয়সা, ধনদৌলত কিছুই নেই। যে উদ্দেশ্যে আমার বেরিয়েছি তা যদি না থাকে তাহলে দ্বীপে ঘুরে লাভ কি?'

তার কথা শুনে আর একটা সৈনিক বলে উঠল, 'এই দ্বীপে আর টাকাপয়সার খোঁজ করতে হবে না। কোনোরকমে প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলে বুঝতে হবে চোদ্দোপুরুষের ভাগ্য ভালো।'

ওদের কথা শুনে সমরসেন গভীরভাবে ভাবতে লাগল। ভাবল, 'সারা দুনিয়ার মানুষ সভ্যতার আলোয় নিজেদের সাজাচ্ছে কিন্তু এখানকার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে এই অঞ্চলে কোনো রাজা নেই, কোনো শাসন নেই, কোনো শোষণ নেই। যেখানে এসব নেই সেখানে টাকাপয়সা, সোনাদানা, অথবা মণিমুক্তা পাওয়া যাবে কী করে?'

সমরসেন এই ধরনের কথা ভাবছিল। এমন সময় গোটা অরণ্য কাঁপিয়ে গুরুগম্ভীর কথা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হল। 'ওরে হেই কালো ভুজঙ্গ, কঙ্কাল, আয় তোরা আয়। ওই চতুর্নেত্রটাকে খুঁজে বার কর। ওর মতিভ্রম ঘটেছে, ওকে ধর।'

এই কথাগুলো শুনে সমরসেনের রক্ত হিম হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। গাছের ডালে যে সৈনিকরা নিজেদের গোপন করে রেখেছিল ওরা ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল। ওই গলা শুনে যত জন্তুজানোয়ার ছিল এমনকী কিছু কিছু গাছে যে নরবানর ছিল তারাও যে যেদিকে পারল পরিত্রাহী করে পালাল।

দেখতে দেখতে সেখানে একটা ভয়ংকর আকারের একজন এল। প্রায় তালগাছের মতো লম্বা চেহারা। একটিমাত্র চোখ জ্বলজ্বল করছে। দুই পায়ে কী যেন জড়ানো আছে। সামনের দিকে, বুকের ওপর ফেলে রেখেছে কালসাপ। পেছনদিকে নড়াচড়া করছে মানুষের মাথার খুলি।

এই ভয়ংকর রূপধারী একটি জলাশয়ের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'হেই মন্ত্রের দেবী, হেই শুনছ, পাহাড়ের টিলার উপর দাঁড়িয়ে কী দেখতে পাচ্ছ, কী দেখছ কঙ্কাল?'

তার প্রশ্নের জবাবে মানুষের মাথার খুলি বিকট হাসি হেসে বলল, 'সমুদ্রে আছে জাহাজ। জাহাজে আছে অনেক ধনসম্পত্তি। জাহাজের বাইরে আছে নাগকন্যা। সেই-ই পাহারা দিচ্ছে। নাগকন্যাকে সরিয়ে দিতে পারলে গোটা জাহাজের সম্পত্তি পেয়ে যাব।'

তার কথা শুনে আবার ওই একচোখা ভয়ংকরদেহী প্রশ্ন করল, 'নাগকন্যাকে সরাতে পারলে জাহাজের সব কিছু পেয়ে যাব এটা ঠিক। কিন্তু ওই চারচোখোটা কোথায় আছে দেখ। দেখে আমাকে বল।'

গাছের ডালের উপর পাতার আড়াল থেকে সমরসেন এই কথাগুলো শুনে এক দিকে যেমন ভীষণ ভয় পেল অন্যদিকে অবাক হয়ে ভাবল, 'এতক্ষণে বুঝলাম আমি যে দ্বীপে আছি সেই দ্বীপ তান্ত্রিকদের। আর এই দ্বীপের কোনো একটি পাহাড়ের উপর থেকে তাকালে সমুদ্রে যে জাহাজ দেখা যাচ্ছে সেই জাহাজে আছে অগাধ সম্পত্তি। এখন প্রশ্ন হল, ওই চতুর্নেত্রটা কে? এই একচোখা ভয়ংকরদেহী বার বার চারচোখোর খোঁজ করছে কেন? এদের দু-জনের মধ্যে কি শত্রুতা আছে? এদের শত্রুতার মূলে কি জাহাজের ওই অগাধ ধনসম্পত্তি, নাকি অন্য কিছু?'

সমরসেন এইভাবে নানা কথা ভাবছিল। এমন সময় ওই একচোখা তান্ত্রিক কোথায় চলে গেল। তাকে অনুসরণ করল কালসাপ এবং মানুষের খুলি।

এতক্ষণ গাছের ডালে যে সৈনিকরা ঠক ঠক করে কাঁপছিল তারা একটু স্বস্তি পেল। প্রত্যেকে সমরসেনের দিকে তাকাল। ওদের সকলের মুখেই ভয়ের চিহ্ন।

ওদের মধ্যে একজন সৈনিক বলল, 'মনে হচ্ছে ওই একচোখোটা মস্তবড়ো তান্ত্রিক আর ওর সঙ্গে যে কালসাপ এবং মানুষের খুলি আছে এই দুটোকে দেখে যেকোনো লোক ভয় পাবে। এই ধরনের ভয়ংকর দ্বীপ ছেড়ে যত তাড়াতাড়ি পালানো যায় ততই মঙ্গল।'

এই কথার জবাবে সমরসেন যে কী বলবে তা শোনার জন্য প্রত্যেকে কান খাড়া করে রইল। সমরসেন কোনো কথা বলল না। সে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর মুখ খুলল, 'দ্বীপটা যতই ভয়ংকর হোক না কেন আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি এই দ্বীপে অগাধ সম্পত্তি আছে। এখন আমাদের যা চাই তা হল আত্মবিশ্বাস এবং সাহস। এই সাহস এবং শক্তিতে ভর করে, আমরা যে উদ্দেশ্যে বেরিয়েছি সেই উদ্দেশ্যের কথা অবশ্যই মনে রেখে আমাদের এখন এগিয়ে যেতে হবে।

সমরসেন এই কথাগুলো বলে তার সৈনিকদের মুখের দিকে একবার নিরীক্ষণ করে আবার বলল, 'সবাই কি শুনতে পেয়েছ ওই একচোখো লোকটার কথা? সেই পাহাড়, তার চূড়া থেকে ওরা যা দেখতে পেয়েছে সেই জাহাজের বর্ণনা। আমরা যদি সেই জাহাজের সম্পত্তি দখল করতে পারি তাহলেই তো কেল্লাফতে হয়ে গেল।'

সমরসেনের কথা শুনে একজন সৈনিক বলল, 'ওই একচক্ষু তান্ত্রিক যা শুনল যা বলল তার সঙ্গে বাস্তবতার কোনো মিল আছে বলে মনে করেন?'

সমরসেন কিছুক্ষণ ওই সৈনিকের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'আমার ধারণা, ওই তান্ত্রিকের প্রশ্ন এবং খুলির জবাবের মধ্যে মিথ্যা কিছু নেই। কোনো নাগকন্যা ওই জাহাজটিকে পাহারা দিচ্ছে। এটা আমরা খুলির কথায় জানতে পারলাম। ওদের কথায় জানা যায় যে চারচোখোর সঙ্গে একচোখোর শত্রুতা আছে। এখন প্রশ্ন হল একচোখো, চারচোখো এবং নাগকন্যাকে জয় করে অথবা এদের প্রত্যেককে এড়িয়ে কী করে আমরা ওই জাহাজের সম্পত্তি দখল করব। এই সমস্যা নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে। ভেবে আমাদের এগোতে হবে। সবাইকে ভাবতে হবে।' বলে সমরসেন চুপ করে রইল।

সেনাপতির কথা শুনে প্রত্যেক সৈনিকের কাছে সমস্যার সমাধান কঠিন মনে হল। সেনাপতি যে বিষয়ে ভাবতে বলল সেই বিষয়ে ভেবে একটা পরিকল্পনা করার সাহস, বুদ্ধি এবং মনোবল তখন কারও ছিল না। যে সৈনিকরা

ভয়ংকর ঝড়ে পড়ে নিজেদের কোনোরকমে বাঁচিয়ে এখানে আসতে পেরেছে তারা এই নতুন সমস্যা নিয়ে ভাবতে পারছে না। সমরসেনের কথা শুনে তাদের মনে হল, তারা একটি ভয়ংকর ঝড় থেকে উদ্ধার পেয়ে যেন আর একটি ঝড়ে পড়ে গেছে।

সমরসেন গাছ থেকে নেমে এতক্ষণ আলোচনা করে এবার এগোতে লাগল। সৈনিকরা তাকে অনুসরণ করল। গাছের আড়ালে আড়ালে কিছুদূর ওরা হেঁটে গেল। হঠাৎ ওরা কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার মতন চিৎকার শুনতে পেল।

যেদিক থেকে ওই তীব্র চিৎকার শোনা গেল সেইদিকে তাকাতেই সমরসেন দেখতে পেল একটি ঘন কালো রঙের পেঁচা মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যেতে যেতে বলছে, 'চারচোখো, চারচোখো, নরমানব-নরাধম, অনেক জন, অনেক জন!' এক কথা বার বার বলতে বলতে পেঁচাটা উড়তে লাগল।

ওই কালো পেঁচা তার ভয়ংকর কানের পর্দা ফাটানো চিৎকার শুনে সমরসেন এবং তার সৈনিকরা হকচকিয়ে গেল। ওরা ভাবল, যে তান্ত্রিক পাখিদের মুখে মানুষের কথা বলাতে পারে সেই তান্ত্রিকের ক্ষমতা আছে। এমন ক্ষমতা খুব কম তান্ত্রিকের থাকে। পেঁচাকে

দেখে এবং তার কথা শুনে সমরসেন ও তার সৈনিকরা রীতিমতো অবাক হয়ে ভয় পেল।

এই ঘোর কাটতে না কাটতেই সমরসেন ও সৈনিকরা আর একটি দৃশ্য দেখতে পেল। ওরা দেখল এক নরবানরকে। তার মধ্যে মানুষ ও বানরের লক্ষণ পরিষ্কার ফুটে উঠেছিল। সে একটা গাছ থেকে ঝপ করে নীচে পড়ল। এতক্ষণ যে পেঁচা উড়তে উড়তে কথা বলছিল, এখন সেটা ওই নরবানরের কাঁধে বসে, তার কানে কানে কী যেন বলল।

তৎক্ষণাৎ ওই নরবানর সমরসেন ও সৈনিকদের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখে নিল।

তারপর বিভিন্ন গাছের ডাল ধরে এক গাছ থেকে আর এক গাছে দুলতে দুলতে, লাফাতে লাফাতে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল।

সৈনিকদের মধ্যে একজন যেদিকে নরবানর চলে গেল সেইদিকে হাঁ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বলল সমরসেনকে, 'সেনাপতি, এই মোক্ষম সময়। এখনই আমাদের পালানো উচিত। তান্ত্রিকের এত খেলা যেখানে চলছে সেখানে আমরা কিছু করতে পারব না। যে দ্বীপের পাখি এবং জন্তুজানোয়ারও তান্ত্রিককে শক্তি জোগায়, সাহায্য করে সেখানে আমরা তির-ধনুক আর তরবারি দিয়ে কিছু করতে পারব না।'

সৈনিকটি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে কথাগুলো বললেও সমরসেন কথাগুলো শুনেও শুনল না। তার চোখ নিবদ্ধ ছিল কালো পেঁচাটার উপর। কালো পেঁচাটা একদৃষ্টিতে সমরসেনের দিকে তাকিয়েছিল। অনেকক্ষণ সমরসেন তার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সে এমনভাবে মাথা নাড়ল যেন সে একটি উপায় খুঁজে পেয়েছে। সে ঝট করে পাশে যে সৈনিকটা ছিল তার কাছ থেকে তির-ধনুক নিয়ে পেঁচার দিকে তাক করে দাঁড়াল।

তৎক্ষণাৎ একজন সৈনিক বলল, 'সেনাপতি, যে পেঁচার মধ্যে মন্ত্রশক্তি আছে তার গায়ে এই তির বিদ্ধ নাও হতে পারে। উপরন্তু আমরা এই পেঁচার প্রভুকে শত্রু করে ফেলব। যেচে একজন তান্ত্রিককে শত্রু করা কি উচিত হবে সেনাপতি?'

সমরসেন তিরটাকে পেঁচার দিকে নিবদ্ধ করে রেখে বলল, 'এই তির ছুড়লেই বুঝতে পারব কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।' বলেই সে তির ছুড়ল পেঁচার দিকে। তিরটা সোজা গিয়ে পেঁচার গায়ে লাগল। সমরসেন ভেবেছিল তির বিদ্ধ পেঁচা ছটফট করতে করতে নীচে পড়ে যাবে। কিন্তু তার সেই আশা পূরণ হল না।

পেঁচার ডানার পালকে তিরটা যেন আটকে গেল। পেঁচাটা ওই তির নাক দিয়ে টেনে ছুড়ে ফেলে কানের পর্দা ফাটানোর মতো চিৎকার করে বলল,

‘ওরে নরাধম, তোরা ভেবেছিস আমাকে তোরা মেরে ফেলতে পারবি? অনেক ক্ষমতা নিয়েও ওই একচোখো তান্ত্রিকটা আমাকে কিছুই করতে পারল না। সে যা পারল না তোরা সেটা পারবি? দাঁড়া, একটু অপেক্ষা কর, আসতে দে আমার চারচোখোটাকে। তারপর তোরা অনেক কিছু দেখতে পাবি।’

পেঁচার কথা শুনে সমরসেন বুঝল, সে এবং তার সৈনিকগণ কিছুক্ষণের মধ্যে একটা ঝামেলায় পড়বে। সে ঝট করে সৈনিকদের ইশারা করে, সেখান থেকে ছুটতে লাগল। ওদের ছোটার সঙ্গেসঙ্গে তাদের অনুসরণ করে পেঁচা উড়তে লাগল।

সমরসেন ভাবল, ‘আর দেরি নয়। যত তাড়াতাড়ি পারা যায় সমুদ্রতীরে পৌঁছে এখান থেকে পালানো উচিত। কিন্তু পেঁচার একনাগাড়ে চিৎকার, তাকে বিভ্রান্ত করল। সে পথ ভুলে গেল। সমুদ্রের তীরের দিকে ছোটার পরিবর্তে বনের আরও গভীরে ঢুকে গেল। একজায়গায় কিছুক্ষণ থেমে সে গভীরভাবে ভাবতে লাগল, সমুদ্রতীর থেকে আসতে তো এত সময় লাগেনি।’

পেঁচাটা সমরসেনকে বেশিক্ষণ ভাবতে দিল না। সে একনাগাড়ে সেই গগনভেদী চিৎকার করতে লাগল।

প্রতিকূল অবস্থায় দাঁড়িয়ে সমরসেন সৈনিকদের বলল, ‘আমরা পথ হারিয়েছি। কারণটা হয়তো তান্ত্রিকদের কোনো খেলা। অধিকন্তু তান্ত্রিক হয়ে গেল আমাদের শত্রু।’

একজন সৈনিক বলল, ‘আমাদের যেকোনোভাবে এই ভয়ংকর কালো পেঁচাটাকে এড়িয়ে যেতে হবে।’

সমরসেন ওই সৈনিকের কথার জবাবে কিছু বলার আগেই আবার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ‘হে কালোভুজঙ্গ, হে কঙ্কাল!’

ওই কণ্ঠস্বর শোনার সঙ্গেসঙ্গে চারচোখোর চেলা কালো পেঁচা উড়ে গেল।

ওই পেঁচার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে না ফেলতেই অন্যদিক থেকে সেই ভয়ংকর আকারের দীর্ঘদেহীকে দেখতে পেল। সমরসেন আর কালমাত্র বিলম্ব না করে সেখান থেকে ছুটে পালাতে লাগল। সকলের সামনে ছুটছে সমরসেন।

চার

সেনাপতি সমরসেন সহ সৈনিকগণ তীব্রবেগে ছুটে পালাতে লাগল। ছুটতে ছুটতে ওরা একটি পাহাড়ের প্রান্তদেশে পৌঁছাল। সেই ভয়ংকর আকৃতির তান্ত্রিক একচোখোর কণ্ঠস্বর আর ওরা এখন শুনতে পাচ্ছে না। ওর হাঁকডাক কানে না যাওয়ায় ওরা ভাবল আর কোনো বিপদ নেই। ওর সঙ্গে যে চারচোখো, বনমানুষ এবং পেঁচা ছিল তাদেরও দেখা যাচ্ছিল না। এদের গলা শুনতে না পাওয়ায় এবং এদের দেখতে না পাওয়ায় সৈনিকরা স্বস্তি বোধ করল।

'সেদিকের বিপদ না হয় কাটল কিন্তু এখন কী করা যাবে?' এই প্রশ্ন সকলের মাথায় ঘুরতে লাগল। আবার কোনো বিপদে পড়ার আগে ওই দ্বীপ থেকে যে কেটে পড়া উচিত সে ব্যাপারে ওদের কারও মনে সন্দেহ রইল না। শুধু তাই নয় সমুদ্রে যে জাহাজগুলো ছেড়ে আসা হয়েছে সেগুলোর অবস্থা কী হয়েছে কে জানে। সেনাপতি ভাবল, 'আমরা যেরকম এখানে একটা বিপদে পড়েছি সেইরকম কোনো বিপদে মাঝসমুদ্রের জাহাজে যে সৈনিকদের রেখে এসেছি তারাও পড়তে পারে। কিন্তু এখন আমরা দ্বীপের কোন দিকে আছি?'

এখন ওরা কোথায় আছে! সেখান থেকে সমুদ্র তীর কত দূরে তা ওরা বুঝতে পারছিল না। অথচ অবিলম্বে সমুদ্রের তীরে গিয়ে ওই জাহাজগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার। ওরা যেদিকে তাকাল সেদিকেই পাহাড় ছিল।

উপরের দিকে তাকালে আকাশ দেখা যায় না, এত ঘন হয়ে গাছের পাতা ওপরটা ছেয়ে রয়েছে যে সূর্যের আলো ওই পাতা ভেদ করে নীচে নামে না।

সমরসেনের মনে যখন এই দিকনির্ণয় নিয়ে সমস্যা দেখা দিল তখন এক ফাঁক দিয়ে সূর্যের তীব্র আলো ওদের গায়ে পড়ল। ওই আলো দেখে সমরসেন বুঝতে পারল দ্বীপের কোন দিকে ওরা আছে।

সমরসেন সৈনিকদের উদ্দেশ্যে বলল, 'আমরা এই ঐন্দ্রজালিক দ্বীপের পশ্চিম দিকে আছি। আমাদের জাহাজগুলো ছেড়ে এসেছি দ্বীপের পূর্ব দিকে। আমরা যে কোন সমস্যায় পড়েছি সেটা তোমরা বোঝার চেষ্টা কর।'

একজন সৈনিক এগিয়ে এসে বলল, 'তাহলে আমাদের প্রথম কাজ হল দ্বীপের পূর্ব দিকে যাওয়া।'

'সে তো বটেই। এখন প্রশ্ন হল সেই পূর্ব দিকে যাওয়া যাবে কী করে? পথে তো পদে পদে বাধা। এদিক-ওদিক করে যে যাব তারও উপায় নেই। চোখের সামনে উঁচু উঁচু পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। ওদের চোখে ধুলো দিয়ে আমাদের যেতে হবে পূর্ব দিকে।' বলতে বলতে থেমে গিয়ে সমরসেন কী যেন ভাবতে লাগল।

সেনাপতির মুখে এই ধরনের হতাশাজনক কথা শুনে সৈনিকরা হতভম্ব হয়ে গেল। আরও কিছুক্ষণ ভেবে সমরসেন ওদের উদ্দেশ্যে বলল, 'দেখ, বেশি ভেবে লাভ নেই। আমাদের হাতে আছে তরবারি। আমাদের বুকে আছে কুণ্ডলিনী দেবীর প্রতি বিশ্বাস। এই দুটো যদি ঠিক থাকে তাহলে আমাদের কেউ কিছু করতে পারবে না। তোমরা এসো আমার সঙ্গে।' বলে সমরসেন পা বাড়াল।

কিছুদূর যাওয়ার পর সমরসেন হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল, 'হিস্, থামো।' বলেই ইশারায় সৈনিকদের চুপচাপ দাঁড়ানোর নির্দেশ দিল। সমরসেন চোখের সামনে ভয়ংকর এক দৃশ্য দেখতে পেল। ওই ধরনের দৃশ্য দেখেই যেকোনো লোকের রক্ত হিম হয়ে যাওয়ার কথা।

বিরাট আকারের, একটি পাহাড়ি সাপ, গাছ থেকে আস্তে আস্তে নামছে। গাছের নীচে আছে দুটো চিতাবাঘ। সাপটা যে বাঘের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে তা বাঘগুলো টের পায়নি।

সমরসেন এবং তার সৈনিকরা অত বড়ো সাপ জীবনে দেখেনি। হঠাৎ থপ করে সাপটা একটি চিতাবাঘের ওপর পড়ে গেল। সাপটা মুখ দিয়ে বাঘের গলাটা ধরে দড়ি দিয়ে বাঁধার মতো বাঘটাকে কষে বেঁধে ফেলল। সাপ একটা বাঘকে ধরতেই অন্য বাঘ পালিয়ে গেল।

পালিয়ে সে বেশি দূর যায়নি। গাছের আড়াল থেকে দেখছিল কীভাবে
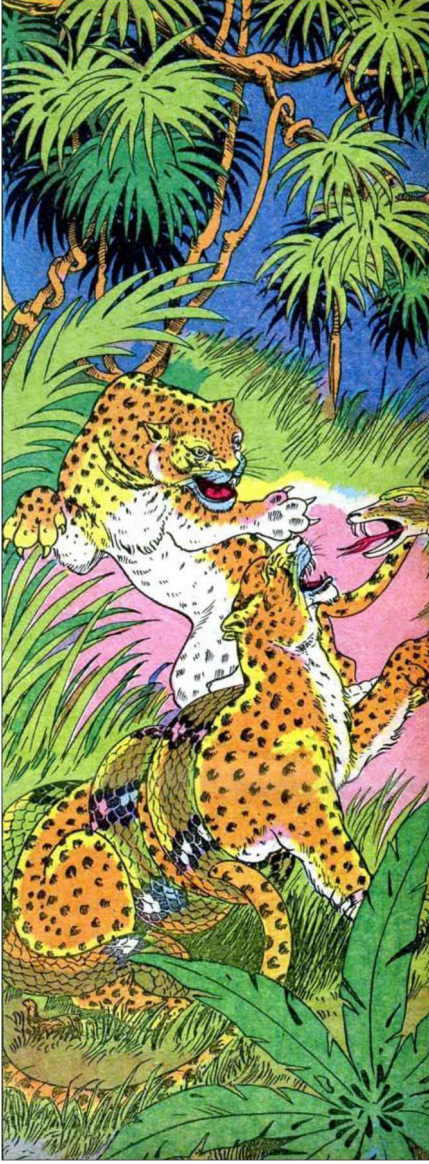
পাহাড়ি সাপের খপ্পর থেকে নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করছে বাঘটা। কিছুক্ষণ দেখে আর স্থির থাকতে না পেরে প্রচণ্ড গর্জন করে সাপের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সমরসেন আর তার সৈনিকরা চোখ বড়ো বড়ো করে সেই দৃশ্য দেখতে লাগল। সমরসেন সৈনিকদের ফিসফিস করে বলল 'দেখলে তো, কী অবস্থা? এই দ্বীপে একটু অসাবধান থাকার উপায় নেই। চল।'

সৈনিকদের নিয়ে সমরসেন অন্য পথে পা বাড়াল। পথটা ভালো ছিল না। পাহাড়ের উপর থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে। পথের যেখানে-সেখানে কাদা। পাথরের চাঁই। বাঁশের ছোটো ছোটো ঝাড়। এগুলোর ভেতর দিয়ে সমরসেনকে এগোতে হচ্ছিল। সাপ যেভাবে গাছ থেকে আস্তে আস্তে নেমে বাঘের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, সেই দৃশ্য দেখে আর কি কেউ সাবধানে না চলে পারে? সমরসেন যেতে যেতে মাঝে মাঝে সৈনিকদের মনে সাহস জোগাতে লাগল, 'ওখানে ছিল ঘন বন। আর এখানে জল আর কাদা। এই জলে, আমাদের ভালো লাগছে না বটে তবে এখানে জন্তুজানোয়ারের ভয় নেই। আর যাই হোক বাঘ এবং সাপের মতো কোনো ভয়ংকর জীব আমাদের সামনে পড়বে না।'
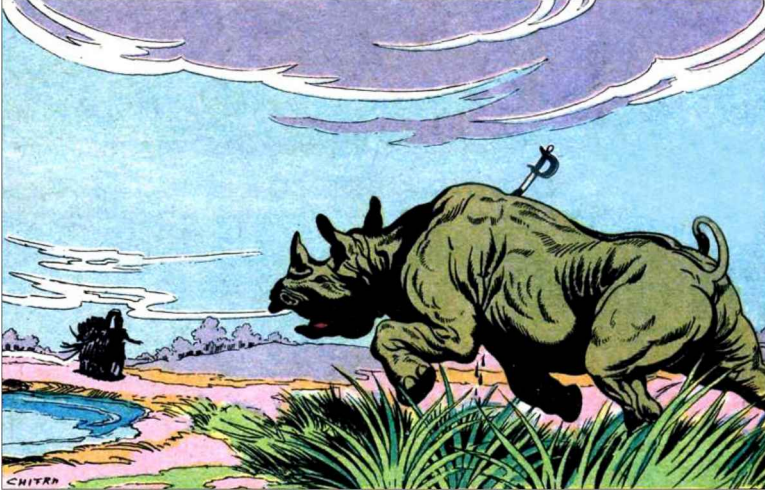
সমরসেন বিজ্ঞের মতো এই কথাগুলো বলছিল। কিন্তু তাকে বেশিক্ষণ বলতে হল না। কিছুক্ষণের মধ্যে তাদের সামনে হাজির হল একটা গণ্ডার। তাকে দেখেই সৈনিকরা এদিক-ওদিক তাকাল— উদ্দেশ্য পালানো। সৈনিকদের মনোভাব লক্ষ করে সমরসেন বলল, 'এখন যে পালাতে যাবে সেই মরবে। সবাই আমার পেছনে সারিবদ্ধ হও, তরবারি খোল।'

গণ্ডার মাথাটা উপরের দিকে তুলে ভয়ংকর গর্জন করল। তারপর ঘন ঘন সামনের পা দুটো নীচে ঘষতে লাগল। সৈনিকরা ভয়ে কাঁপতে লাগল। সমরসেনের কাছ থেকে এখন ওরা কিছু শুনতে চায়। সমরসেনের কিছু বলার আগেই গণ্ডার আস্তে আস্তে এগিয়ে আসতে লাগল।

সকলের সামনে ছিল সমরসেন। একদম যখন কাছে এসে গেল তখন সমরসেন তার উপর তরবারি চালিয়ে দিল। অন্য কোনো জন্তু হলে তরবারির ওই আঘাতে মরে না যাক, মাটিতে পড়ে যেত। কিন্তু গণ্ডার সেই জন্তু নয়। সে মাটিতে পড়েনি। তবে তার আর্তনাদ পাহাড়ের গায়ে ঠেকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। আর একবার পা দিয়ে নীচে ঘষে আবার সৈনিকদের দিকে এগিয়ে এল। সমরসেনের তরবারির এক আঘাতের ফলে গণ্ডার যেভাবে আর্তনাদ করে উঠেছিল সেই আর্তনাদ শুনে সৈনিকদের মনে যথেষ্ট সাহস সঞ্চারিত হল। ওরা আস্তে আস্তে গণ্ডারকে ঘিরে ফেলল। তারপর গণ্ডারের দেহে যে যেখানে পারল তরবারির আঘাত করতে লাগল। অতগুলো সৈনিকের তরবারির আঘাত সহ্য করতে না পেরে গণ্ডারটি মাটিতে পড়ে গেল। সে আর ওদের আক্রমণ করতে এগিয়ে আসতে পারল না। তখন সমরসেন
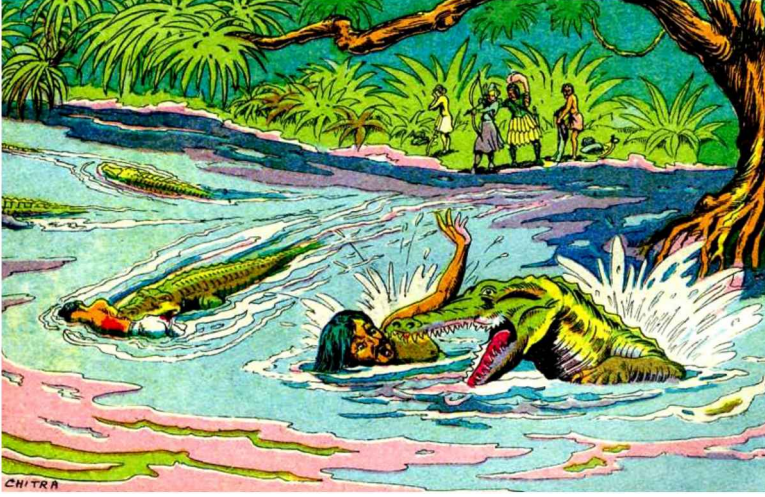
সৈনিকদের বলল, ‘যাক একটা ফাঁড়া কাটল। তবে গণ্ডারটা যেভাবে আর্তনাদ করছে আমি নিশ্চিত এর আর্তনাদ শুনে কিছু জন্তু এদিকে এগিয়ে আসবে। ওদের এখানে আসার আগে আমাদের কেটে পড়া ভালো।’

আবার ওরা এগোতে লাগল। কিছুদূর যাওয়ার পর ওরা স্বচ্ছ জলের সন্ধান পেল। গণ্ডারের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করতে গিয়ে ওরা যথেষ্ট ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তাই স্বচ্ছ জলের সন্ধান পেয়ে ওদের একজন বলল, ‘এত ভালো জলে একবার স্নান করতে পারলে খুব ভালো হত।’

সমরসেন ওদের বলল, ‘একটা কথা তোমরা সবসময় মনে রাখবে, এই দ্বীপ হল ঐন্দ্রজালিক দ্বীপ। এখানে কোথায় যে কী আছে সেটা আমরা সহজে বুঝতে পারি না। তাই এই জলে যদি স্নান করতে হয় সাবধানে করবে। সবাই একসঙ্গে জলে নামবে না।’

দু-জন নামল। ওদের নামার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জলে ছোটো ছোটো ঢেউ উঠল। পরক্ষণেই দেখা গেল চারদিক থেকে কুমির ওই দু-জনের দিকে ধেয়ে আসছে। অবস্থা দেখে ওই দুটো সৈনিক আর্তনাদ করে উঠল। তীরে যে সৈনিকরা ছিল তারা কুমিরগুলোর উপর তির ছুড়ল। কিন্তু চারদিক থেকে যে কুমিরগুলো এসেছিল তারা ওই দু-জনকে চোখের পলকে টেনে নিয়ে চলে গেল।

গণ্ডারকে মেরে সৈনিকদের মনে যে সাহস এসেছিল, এখন দুটো সৈনিককে কুমির টেনে নিয়ে যাওয়ায়, ওদের মনে ত্রাসের সঞ্চার হল। ছ-জনের মধ্যে দু-জন গেল, বাকি রইল চার। যে মন নিয়ে কিছুক্ষণ আগে ওরা স্নান করতে চেয়েছিল সেই মন এখন আর ওদের নেই। এখন ওরা খুব সাবধানে পা

ফেলছে। কিন্তু যে খালে বা ছোটো নদীতে দু-জন সৈনিকের মৃত্যু ঘটেছে সেই খাল তাদের পেরোতে হবে। এখন ওদের অবস্থা হয়েছে জলে কুমির ডাঙায় বাঘ। কোন দিকে যাবে? ওরা সবাই ভাবছিল। এমন সময় জলে এমন আওয়াজ হল যেন কেউ স্নান করছে। সেদিকে তাকাতে গিয়ে নজরে পড়ল সেই জলে নুয়ে থাকা একটি গাছের ডাল। সেই ডাল থেকে
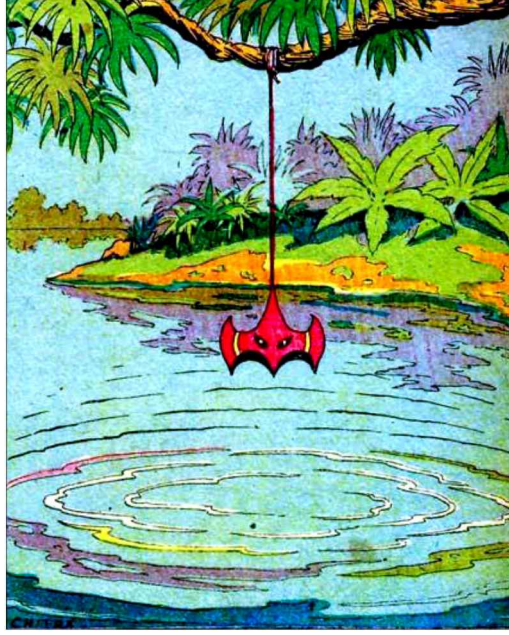
ঝুলছে একটি টুপি এবং দুটি চোখ অথবা ওই ধরনের কোনো জিনিস। এই দৃশ্য দেখে সৈনিকরা অবাক হল আর সমরসেন এই অদ্ভুত দৃশ্যের অর্থ খুঁজতে লাগল। তখনও জলের একটি জায়গা নড়ছিল। ঠিক মনে হচ্ছিল একটা অদৃশ্য মানুষ স্নান করছে। সৈনিকদের নিয়ে সমরসেন এক দৃষ্টিতে ওই দৃশ্য দেখছিল। কিছুক্ষণ লক্ষ করে সমরসেন বলল, 'এই যে একজন স্নান করছে অথচ লোকটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না, এ সেই তান্ত্রিক একচোখো নয় তো? তাই যদি হয় তাহলে টুপিটা গাছে তুলে রাখবে কেন? আর দুটো চোখের মতো টুপিতে ওটা কি? আচ্ছা এও তো হতে পারে এ সেই একচোখো নয়, অন্য কোনো তান্ত্রিক!'

কথাগুলো বলতে বলতে সমরসেন শুনতে পেল মন্ত্রপাঠ। শুধু যে স্নানের শব্দ তাই নয়, এখন আবার শোনা যাচ্ছে শ্লোক। সবাই কান খাড়া করে শুনতে লাগল। একের-পর-এক অদ্ভুত দৃশ্য। চোখের পাতা ফেলতে পারছে না। শ্লোক শুনতে শুনতে ওদের চোখ পড়ল একটি ঝাড়ের উপর। সেই ঝাড়ের ভেতর থেকে মনে হল একটি সাপ যেন মাথা তুলছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল সেটা সাপ নয়। হাতির চেয়ে চার-পাঁচ গুণ বড়ো জন্তু।

ওই জন্তুকে দেখে ওরা ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ওরা প্রত্যেকে বুঝেছিল, ওই ভয়ংকর জন্তুটা যদি ওদের দিকে আসে তাহলে ওদের কিছু

করার ক্ষমতা থাকবে না। জন্তুটা যেখান থেকে মানুষের শব্দ পাচ্ছিল সেদিকে এগিয়ে যেতে লাগল। মনে হল যাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না তাকে সে ধরতে যাচ্ছে। জন্তুটা জলের কাছে গিয়ে মুণ্ডুটা ডুবিয়ে আবার তুলতে না তুলতেই সেই জল থেকে আর্তনাদ শোনা গেল। আর সেই মুহূর্তে গাছের ডালে ঝুলন্ত সেই টুপিটা পড়ে গেল। টুপিটা পড়ার সঙ্গেসঙ্গে ওই টুপি পরা একটি লোককে জলে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। সেই লোকটাকে দেখে জন্তুটা পালিয়ে গেল।

'ও হো, তুমি মহোদর এসেছ। আমাকে খেতে এসেছ? তোমার এত বড়ো সাহস যে চতুর্নেত্রকে খেতে এসেছ!' সে এমনভাবে বলল যেন মেঘের গর্জন হল।

তান্ত্রিক চতুর্নেত্রকে দেখে সমরসেন এবং তার সৈনিকরা রীতিমতো ভয় পেল।

যাও বা তান্ত্রিক একচোখোর নজর এড়িয়ে পালানো গেল এখন এই চারচোখো যদি ওদের দেখতে পায় তাহলে তো ওদের আর রক্ষা নেই। সমরসেন তার সঙ্গীদের প্রত্যেকের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিল। কারও মুখে কোনো কথা নেই। ভয়ে প্রত্যেকের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। সমরসেন ভীষণ ভয় পেয়ে ভাবছে, 'এখন কী করা যায়?'

পাঁচ

জলাশয়ের অদূরে, গাছগাছড়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে সমরসেন পরিষ্কার দেখতে পেল একটা লোক জলে দাঁড়িয়ে আছে। তার টুপিটা অদ্ভুত ধরনের। ওই টুপির সামনের দিকে দুটো চোখের ছবি আঁকা আছে। তার মধ্যে একটা চোখ থেকে যেন জ্যোতি বেরোচ্ছে। এই জ্যোতি দেখেই সমরসেন চিন্তিত হল।

কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর সমরসেন বুঝতে পারল এই লোকটাই একচোখো তান্ত্রিকের ঘোর শত্রু। বিরাটদেহী একটি জন্তু যখন তাকে গিলে ফেলার জন্য আসছিল তখন এই লোকটা দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, 'তুমি এগিয়ে আসছ কেন? চারচোখোকে গিলতে চাও?' এই কথা তার মুখে শুনে সমরসেন ভাবল, চারচোখোটা নিশ্চয় অত্যন্ত ক্ষমতাবান।

সমরসেনের এখন ভাবনা হল কীভাবে এই ভয়ংকর চারচোখোর নজর এড়িয়ে সেখান থেকে কেটে পড়া যায়। সে যখন এই কথা ভাবছিল তখন তাকে একটা সঙ্গী প্রশ্ন করল, 'সেনাপতি, ওই লোকটা তো আমাদের মতো সাধারণ লোক নয়? মনে হচ্ছে এর দুটো চোখ বেশি আছে।'

সৈনিকের কথা শুনতে শুনতে সমরসেন ভাবতে লাগল, এর পর কী করা যায়। কিছুক্ষণ পরে সমরসেন সৈনিকদের দিকে ঘুরে, তাদের উদ্দেশ্যে বলল, 'তোমরা কি এখনও সব পরিষ্কার বুঝতে পারছ না? এর আগে আমরা যে একচোখোকে দেখেছিলাম তার সঙ্গে এই চারচোখোর শত্রুতা আছে। এরা পরস্পরের ঘোরতর শত্রু।'

সেনাপতির কথা শুনে একজন বাদে সবাই মাথা নাড়ল। একজন বলল, 'আপনি যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আমি একটা ছোট্ট প্রশ্ন করতে পারি।'

'আমরা এমন একটা সময়ে, এমন জায়গায় আটকে পড়ে আছি যে এখন আমি কারও কোনো প্রশ্নে অন্য কিছু মনে করতে পারি না। মনের সংশয়, প্রশ্ন, আশঙ্কা ইত্যাদি রেখে কোনো কাজ করলে সে কাজ সফল হয় না। শুধু তুমি কেন, তোমাদের যেকোনো জনের যেকোনো প্রশ্নের জবাব দিতে আমি রাজি আছি। এবং সবশেষে আমাদের সবাইকে ভাবতে হবে আমাদের কর্তব্য।' সমরসেন বলল।

'সেনাপতি, একচোখো এবং চারচোখোর মধ্যে যে বিরোধ আছে আপনি কি সেই বিরোধকে কাজে লাগাতে চান? যদি তা চান তাহলে আমার একটা ছোট্ট পরামর্শ আছে। সিংহ এবং বাঘ দু-জনেই পরস্পরের শত্রু। আবার এও সত্য যে এই দুটো জন্তুই অত্যন্ত হিংস্র। এই প্রবাদ আমরা কিছুতেই ভুলে যেতে পারি না।' একজন সৈনিক বলল।

সৈনিকটির কথা শুনে সমরসেন নতুন করে চিন্তা করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে সমরসেন ওই সৈনিককে বলল, 'তুমি ঠিক কথাই বলেছ। এই দুটোই তান্ত্রিক। যেকোনো মুহূর্তে যেকোনো লোকের সর্বনাশ করতে পারে।' সেনাপতির কথা শেষ হতে না হতেই চারচোখোটা জল থেকে উঠে তীরে দাঁড়াল।

চারচোখোর ভয়ংকর চেহারা দেখে সমরসেন ও তার সৈনিকরা রীতিমতো

ভয় পেল। ওরা ভাবতে লাগল কোন দিকে পালাবে। এমন সময় চারচোখোর কথা ওই নিস্তব্ধ গভীর বনে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল, 'ওরে মূর্খের দল, তোমরা আমার জায়গায় ঢুকে আমার চোখে ফাঁকি দিতে চাইছ? এটা তোমরা কোনোদিনই পারবে না। এখানে যত গাছ আছে, যত জন্তুজানোয়ার, পাহাড় আছে সব আমার অধীন। আমার দৃষ্টিশক্তি পাহাড় ভেদ করে কোনো কিছুকে দেখার শক্তি রাখে। অতএব, তোমরা যে মূর্খের মতো আমার নজর এড়ানোর চেষ্টা করছ, আমার নাগালের বাইরে চলে যাবার তাল করছ তা কিন্তু পারবে না। এই দ্বীপে, এই মুহূর্তে কোথায় কী হচ্ছে সব বলে দিতে পারি। ওহে পেঁচা, ওহে নরবানর তোমরা কোথায়?' বলে চিৎকার করে উঠল।

তার চিৎকার শুনেই কালো পেঁচা এবং নরবানর পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে এসে সমরসেনের সামনে দাঁড়াল। নরবানরের হাতে ছিল একটা গাছের ডাল। কিছুক্ষণের মধ্যেই নরবানর ওই ডাল নাড়তে লাগল আর পেঁচা তারস্বরে ডাকতে ডাকতে চারপাশে ঘুরতে লাগল।

সমরসেন ভালোভাবেই বুঝতে পারল যে সে বেঘোরে পড়ে গেছে। নিজে ভয় পেলেও অন্যদের মনে সাহস সঞ্চারের জন্য সমরসেন নিজের সৈনিকদের বলল, 'তোমাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। যতক্ষণ আমরা কুণ্ডলিনী দেবীর

কথা স্মরণ করব ততক্ষণ আমাদের কোনো বিপদ ঘটতে পারে না।' এই কথা সৈনিকদের কানে ঢুকলেও তাদের মনে গাঁথেনি।

এমন সময় লম্বা লম্বা পা ফেলে সৈনিকদের কাছে এসে চারচোখোটা প্রশ্ন করতে লাগল এক এক জনকে, 'তোমরা কারা? এই দ্বীপে কেন এসেছ?'

চারচোখো যখন এই প্রশ্ন করছিল তখন তার চোখে-মুখে প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছা অথবা প্রতিহিংসা নেবার কোনো মনোভাব ফুটে ওঠেনি।

চারচোখো সম্পর্কে, দূর থেকে দেখে সমরসেনের যত ভয়ংকর মনে হচ্ছিল এখন অত ভয়ংকর মনে হল না। সমরসেন ভাবল, এই চারচোখোর প্রশ্নের জবাব দেওয়া উচিত। এর প্রশ্নের সঠিক জবাব দিলে আখেরে হয়তো ভালো হতে পারে। চারচোখোকে এড়িয়ে এই দ্বীপে যখন কোনো কাজ করা যাবে না তখন তার কাছে কোনো কিছু লুকিয়ে কাজ নেই।

সমরসেন চারচোখোকে বলল, 'আমরা কুণ্ডলিনী দ্বীপ থেকে বেরিয়েছিলাম। ঝড়ে পড়ে হঠাৎ এই দ্বীপে উঠেছি। এই দ্বীপে আসার আমাদের পরিকল্পনা ছিল না।'

তার কথা শুনে চারচোখোটা হেসে বলল, 'তোমার কথা বিশ্বাস করছি। কিন্তু তোমরা যে কোন উদ্দেশ্যে সমুদ্রে পাড়ি দিলে সেটা আমি এখনও জানি না। তুমি কি তোমাদের অভিযান শুরু করার উদ্দেশ্য আমার কাছে গোপন রাখতে চাইছ?'

সমরসেন আবার বুঝল যে চারচোখোর কাছে কোনো কথাই গোপন রাখা যাবে না। তাই সে পরিষ্কার জানিয়ে দিল যে তাদের বেরিয়ে পড়ার উদ্দেশ্য হল অন্যান্য দেশ থেকে ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করে নিজের দেশের ধনভাণ্ডার পূরণ করা।

সেনাপতির কথা শুনে চারচোখো হাসতে হাসতে বলল, 'তাহলে তোমরা অন্য দেশে লুণ্ঠন করে নিজেদের দেশে ফেরার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছ? বেরিয়ে ঝড়ে পড়ে এই দ্বীপে এসেছ? এখানে একজন তান্ত্রিক আছে তার ধনসম্পত্তির আশা সীমাহীন। তোমরা দু-জনে যদি এক হও তাহলে দু-জনেরই ইচ্ছা পূরণ হতে পারে।'

চারচোখোর কথা শুনে সমরসেন ভেবে পেল না, জবাবে কি বলবে। এমন সময় গোটা গভীর বন কাঁপিয়ে শোনা গেল একচোখোর গম্ভীর কণ্ঠস্বর, 'ওহে, কালভুজঙ্গ, তোমরা সব কোথায়? এসো, এক্ষুনি খুঁজে বের কর।'

এই চিৎকার শুনে সৈনিকরা রীতিমতো ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল। সেনাপতি বলল, 'তোমরা এত ভয় পাচ্ছ কেন? এক কাজ কর, ওই ঝোপের ভেতর লুকিয়ে পড়।'

সঙ্গেসঙ্গে সৈনিকরা লুকিয়ে পড়ল। ওরা যেখানে লুকোল সেখানে একচোখো একটা বিরাট সাপ নিয়ে হাজির হল। চারচোখোর কাছে গিয়ে একচোখোটা ঝট করে তরবারি বের করে তাকে আক্রমণ করতে এগিয়ে এসে বলল, 'অনেকদিন পরে ধরা পড়েছ।'

একচোখোকে আসতে দেখে চারচোখো একচুলও না নড়ে বলল, 'ও একচোখো নাকি? অনেকদিন দেখতে পাইনি। তারপর তোমার খবর কী?'

একচোখো কী যেন বলতে গেল এমন সময় চারচোখো চিৎকার করে উঠল, 'ওহে নরবানর, পেঁচা তোমরা কোথায়?' সঙ্গেসঙ্গে ওরা তার কাছে হাজির হল। ওদের দেখে একচোখো একটু চমকে গেল। চারচোখো এবং তার পেঁচা ও নরবানরকে দেখে একচোখো রীতিমতো ঘাবড়ে গেল।

আর ওই অবস্থা লক্ষ করে চারচোখো বলল, 'পেঁচা, ওই একচোখোটার বাঁ-চোখটা যে কেমন তা তো তুমি জানো। এখন ডান চোখটাকে একবার চেখে দেখতে পার।'

পরক্ষণেই কালো পেঁচা একচোখোকে আক্রমণ করতে গেল। তখন সে ঘাবড়ে গিয়ে নানা ধরনের কথা চিৎকার করে বলতে লাগল। তার চিৎকার শুনে এক বিরাট ভয়ংকরদেহী, বড়ো হাঁ করে ওই পেঁচাকে খেতে গেল। সেই দৃশ্য দেখে একচোখো অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে লাফাতে লাগল। তার ওই আনন্দ দেখে চারচোখোর খুব রাগ হল। সে চিৎকার করে বলল, 'নরবানর, তুমি তোমার কাজ শুরু কর।' পরক্ষণেই নরবানর একচোখোকে আক্রমণ করতে গেল। আক্রান্ত হয়ে একচোখো চিৎকার করে বলল, 'কালভুজঙ্গ!' সঙ্গেসঙ্গে কালসাপ ফোঁস ফোঁস করতে করতে নরবানরকে ছোবল মারতে গেল।

সমরসেন এবং তার সৈনিকরা ঝোপের আড়াল থেকে এই ভয়ংকর দৃশ্য দেখতে লাগল। একজন সৈনিক ফিসফিস করে বলল, 'চারচোখো এবং একচোখোর মধ্যে কেউ কিন্তু কম যাচ্ছে না।'

'ওরা নিজেদের মধ্যে লড়ছে বলেই হয়তো আমরা এযাত্রা বেঁচে গেছি।' সমরসেন বলল।

একচোখোর পক্ষে যারা ছিল তাদের সঙ্গে চারচোখোর পক্ষের পশুপাখিদের অনেকক্ষণ ধরে ভয়ংকর যুদ্ধ হল।

দূরে দাঁড়িয়ে চারচোখো এবং একচোখো পরস্পরের দিকে কটমট করে তাকাচ্ছিল।

ওরা ভালোভাবেই জানে ওদের পক্ষ নিয়ে যারা লড়ছে তাদের যুদ্ধ অত সহজে তখনই শেষ হবে না।

হঠাৎ একসময় চারচোখো হো-হো করে হেসে নিজের টুপি ওপরের দিকে
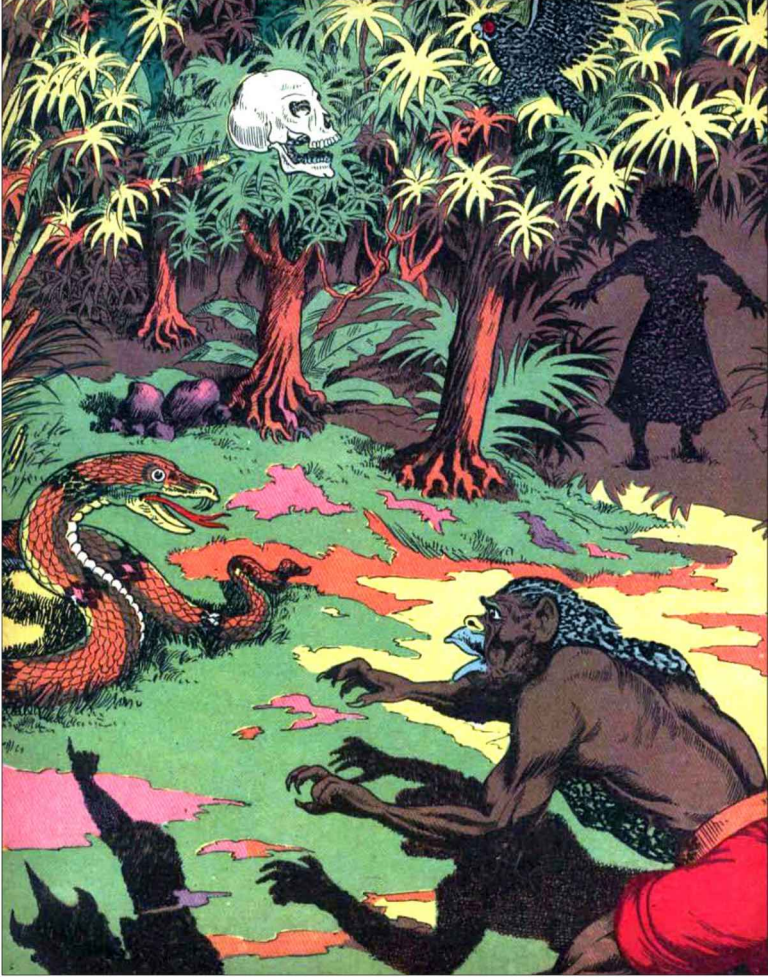
তুলে বলল, 'ওম হ্রিং!' এই কথা বলার সঙ্গেসঙ্গে চারচোখোর দেহ সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। যে মুহূর্তে চারচোখো অদৃশ্য হল সেইমুহূর্তে পেঁচা এবং নরবানরও অদৃশ্য হয়ে গেল।

একচোখো থ বনে গিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, 'কাপুরুষ কোথাকার! অদৃশ্য হয়ে পালাবে কোথায়? একদিন-না-একদিন মোকাবিলা হবেই। তখন তোমাকে একচোট দেখে নেব।'

কিছুক্ষণ পরে, একচোখোর মনে পড়ে গেল সমরসেন ও তার সৈনিকদের কথা। সে এদিক-ওদিক তাকাল। কিন্তু সমরসেন বা তার সৈনিকদের সে

দেখতে পেল না। তার মনে হচ্ছিল যেকোনো সময়ে ওই কালো পেঁচাটা এসে তার চোখ উপড়ে ফেলবে। তাই সে তরবারি হাতে নিয়ে চারদিকে তাকাতে তাকাতে এগিয়ে যেতে লাগল। একচোখো ওই কালো পেঁচাকে ভীষণ ভয় করে। কারণ এই পেঁচাই কিছুকাল আগে হঠাৎ আক্রমণ করে তার একটি চোখ উপড়ে ফেলেছিল। তারপর থেকে একচোখো ওই কালো পেঁচাকে ভীষণ ভয় করে। তাকে দেখলেই তার মনে আতঙ্ক জাগে।

একচোখোর চলে যাওয়ার পর ঝোপের ভেতর থেকে সমরসেন এবং তার সৈনিকরা বেরিয়ে পড়ল।

বিপদ কেটে গেছে ভেবে সমরসেন নিজের সৈনিকদের নিয়ে পূর্ব দিকে এগোতে লাগল। কিছুদূর যাওয়ার পর ভয়ংকর শব্দ শোনা গেল। মাটি কেঁপে উঠল। সমরসেন লক্ষ করল, দূরের পাহাড়ের চূড়া থেকে আগুনের হলকা বেরোচ্ছে। সমরসেন এবং তার সৈনিকরা অবাক হয়ে পাহাড়ের চূড়ার দিকে তাকিয়ে রইল।

ছয়

সমরসেন ও তার সঙ্গী সৈনিকরা অবাক হয়ে দেখতে লাগল অগ্নিপর্বত থেকে নির্গত আগুনের হলকা। আগুনের পিণ্ড তার থেকে নির্গত হতে লাগল। সেগুলো বিভিন্ন দিকে পড়তে লাগল। শুধু আগুন নয়, আগুনের সঙ্গে ধোঁয়াও ছিল। এত ধোঁয়া ছিল যে, কোথায় যে কী আছে তা দেখা যাচ্ছিল না।

সঙ্গীদের নিয়ে সমরসেন এগোচ্ছিল। অগ্নিপর্বতের এই অবস্থা দেখে ওরা সেদিক দিয়ে পূর্ব দিকে এগোতে পারল না। অন্য পথ ধরল। সৈনিকরা এত ভয় পেয়েছিল যে তাদের সেনাপতি যেদিক দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সেদিক

দিয়ে মুখ বুজে যাচ্ছিল। মুখে তাদের কথা ছিল না। কারণ ভয়। তখন সকলে পশ্চিম দিকে হাঁটছিল। অথচ ওদের ফেলে আসা জাহাজগুলো পড়ে আছে ওই দ্বীপের পূর্ব দিকে। এই দ্বীপে এসে ওদের অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। দু-দুটো জাঁদরেল তান্ত্রিক তাদের সামনে পড়ে গেছে। আর পদে পদে পেয়েছে হিংস্র জন্তুজানোয়ার। অগ্নিপর্বত থেকে আগুনের পিণ্ড নির্গত হওয়ার পর ওরা বাধ্য হল নিজেদের পথ পরিবর্তন করতে।
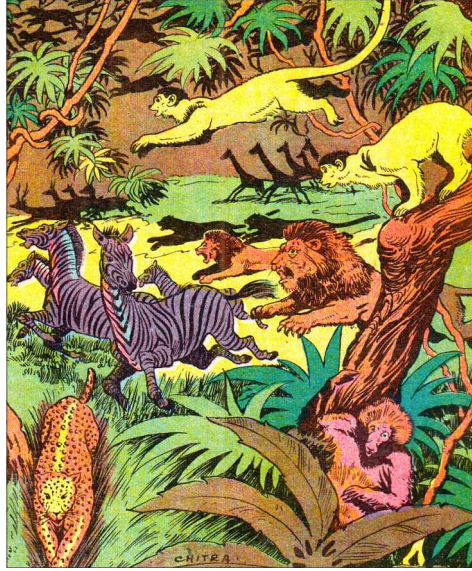
বনজঙ্গলের ভেতর দিয়ে সেনাপতি এগোতে লাগল। তার পেছনে যেতে লাগল সৈনিকগণ।

ইতিমধ্যে আরও একটি বিপদ দেখা দিল। অগ্নিপর্বত থেকে নির্গত পিণ্ডগুলো যেসব জায়গায় পড়ছিল সেখানকার পশু-পাখি দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূ ন্য হয়ে পালাচ্ছিল। ফলে যেকোনো মুহূর্তে যেকোনো পশু তাদের সামনে পড়ে যাচ্ছিল। ভয়ংকর পশুদের আর্তনাদ শুনে সমরসেনের সৈনিকরা ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল।

এইভাবে কিছুদূর যাওয়ার পর সমরসেন দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকাল। লক্ষ করল পাহাড় চিড়ে যে ফুটন্ত লাভা বেরিয়ে এসেছিল সেটা একটা নর্দমার মতো দ্রুত বনবাদাড় পোড়াতে পোড়াতে চলে যাচ্ছে। সেই আগুনে কোনো পশু পুড়ে যাচ্ছে, কোনোটি আবার আহত হচ্ছে। আহত পশুদের আর্তনাদে গোটা অঞ্চল ভয়ংকর হয়ে উঠেছিল।

সমরসেন নিজের সৈনিকদের মনে যাতে সাহস থাকে সেই ধরনের কথা বলতে বলতে হাঁটছিল। কিন্তু তাকেও থমকে দাঁড়াতে হল। যে দৃশ্য তার চোখের সামনে পড়ল তা কল্পনা করা যায় না। আরও দু-পা এগিয়ে সে পরিষ্কার বুঝতে পারল, দূর থেকে যে দৃশ্য সে দেখতে পেয়েছে সেটা কত সত্য। একটা মানুষ মাথা নীচের দিকে রেখে গাছের ডালে ঝুলছে। মনে হচ্ছে গাছের ডালে তার

পা কেউ বেঁধে দিয়েছে। লোকটা মৃত কি জীবিত তা বোঝা যাচ্ছে না। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে সে অরণ্যের অধিবাসী।

শুধু সেনাপতি নয় তার সঙ্গী সৈনিকরাও অবাক হয়ে সেদিকে তাকাচ্ছিল। এতক্ষণে তারা বুঝতে পারল এই অরণ্যে শুধু দুটো তান্ত্রিক এবং হিংস্র জন্তুজানোয়ার নেই কিছু মানুষও আছে। সেনাপতি সঙ্গীদের বলল, 'এই অরণ্যবাসী মানুষটাকে কে এত বড়ো শাস্তি দিল?'

সেনাপতির কথা শুনে সৈনিকরা কেউ কোনো কথা বলতে পারল না। সমরসেন আবার বলল, 'এই লোকটার পরিচয় জানতেই হবে। শুধু একা একটি মানুষ, এ-রকম ভয়ংকর অরণ্যে কখনোই থাকতে পারে না। নিশ্চয় আরও কিছু মানুষ এই দ্বীপে কোনো-না-কোনো প্রান্তে আছে। যদি মানুষের সন্ধান পাই তাহলে নিশ্চয় আমরা উপকৃত হতে পারি।'

সৈনিকদের মনে এক চিন্তা, 'কতক্ষণে আমরা পুব দিকের তীরে পৌঁছাব। কতক্ষণে বাড়ি ফিরে যাব।' সমরসেন ঝুলন্ত লোকটার কাছে তার শরীরে কোনো আঘাত আছে কি না লক্ষ করল। কিন্তু কোথাও কোনো আঘাতের চিহ্ন ছিল না। সমরসেন ভাবল, 'হয়তো শত্রুতাবশত কোনো লোক এই লোকটাকে ঝুলিয়ে দিয়েছে। লোকটা না খেতে পেয়ে মারা গেছে।'

ওই ঝুলন্ত লোকটার দিকে তাকিয়ে সবাই দুঃখ পেল। অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে লোকটাকে দেখে সমরসেন সৈনিকদের বলল, 'এই লোকটার মৃত্যুর

পেছনে নিশ্চয় কোনো রহস্য আছে। কী করে জানা যায়? আমি নিশ্চিত এই দ্বীপের কোনো-না-কোনো অঞ্চলে মানুষের বাস আছে। এই লোকটার মৃত্যুর কারণ আবিষ্কার করতে গিয়ে সব কিছুর অনুসন্ধান করতে পারব।'

কথা বলতে বলতে সমরসেনের চোখ পড়ল অদূরে পড়ে থাকা একটি জিনিসের ওপর। এগিয়ে গিয়ে সমরসেন জিনিসটাকে হাতে তুলে দেখল। জিনিসটা কেমন যেন দেখতে। ভালো করে পরীক্ষা করে সমরসেন বুঝতে পারল জিনিসটা ভ্রমণের সময় ব্যবহৃত জিনিস, জল পানের জন্য এটা লাগে। সেটা একটি সুতো দিয়ে বাঁধা আছে। তার মনে হল ধারে-কাছে আরও মানুষ আছে। তা না হলে এই জিনিসটা এল কোত্থেকে? সে হাত ওপরের দিকে তুলে, 'মা, মাগো, কুণ্ডলিনীদেবী মা, বাঁচিয়ো মা।' বলে নমস্কার করল। সেনাপতির কথা এবং হাবভাব লক্ষ করে সৈনিকরা ভাবল, 'তাদের সেনাপতি একটা কোনো সূত্র আবিষ্কার করতে পেরেছে।' ওরা সেনাপতির মুখের কথা শোনার জন্যে অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। ওদের মনের অবস্থা বুঝতে পেরে সেনাপতি বলল, 'আর কোনো ভয় নেই। আমরা এমন এক জায়গায় আছি সেখান থেকে কিছুদূরের মধ্যেই মানুষের বাস আছে। এই লোকটাকে কোনো তান্ত্রিক মেরে ফেলেনি। মেরে ফেলেছে তার সঙ্গীরা। এই যে পাত্র, এটা কোনো এক সময় খুলির একটি অংশ হলেও এখন একটি জলপাত্র। এই পাত্রে জলপান করা হয়। এর একটি কোণে ফুটো আছে। সেই ফুটোতে সুতো বাঁধা আছে। সব মিলিয়ে এটা যে যাত্রীর নিত্যব্যবহার্য বস্তু সে ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই। মানুষগুলো যে কোন পথে এখানে এল আর কোন পথ ধরে যে গেল সেটা যদি আমরা ধরতে পারি তাহলে আমাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

সেনাপতির মুখে এই কথা শুনে সৈনিকরা মাটিতে পায়ের ছাপ খুঁজতে লাগল। কিছুক্ষণ খোঁজার পর ওদের পরিশ্রম সার্থক হল। ওরা অনেকগুলো

মানুষের পায়ের ছাপ দেখতে পেল। সেনাপতির কথা যে সঠিক ছিল তা ওরা ভালোভাবেই বুঝতে পারল। যেদিকে পায়ের ছাপ দেখল সেদিকেই তারা এগোতে লাগল। এগোতে এগোতে কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা একটি উঁচু জায়গায় গেল। সেখানে দাঁড়িয়ে ওরা চারদিকে তাকাল। দেখতে পেল অগ্নিপর্বত থেকে তখনও আগুন বেরোচ্ছে। প্রাণের ভয়ে বহু জন্তু ছোটাছুটি করছে। ওদের আর্তনাদে গর্জনে গোটা তল্লাটের আবহাওয়া ভয়ংকর হয়ে উঠেছিল। কয়েকটি গাছে আগুন লেগে যাওয়ায় গাছগুলো পুড়ছিল।

নতুন উৎসাহে সমরসেন এগিয়ে যেতে লাগল। এখন সবাই জানে যেকোনো মুহূর্তে যেকোনো পরিস্থিতির সামনে তারা পড়ে যেতে পারে। সব কিছু এখন তাদের জানা হয়ে গেছে। অনবরত ভয়ংকর পরিস্থিতির সামনে পড়ে যাওয়ার ফলে তারা যেন অনেকখানি ভয় কাটিয়ে উঠেছে। এখন আর তাদের ভয় করছে না। সামনে সেনাপতি, পেছনে তারা এগিয়ে চলেছে। এগোতে এগোতে তাদের সামনে পড়ল একটি নদী। নদী প্রবাহের ধ্বনি আছে। স্রোতের যথেষ্ট গর্জনও আছে। তাদের সামনে প্রশ্ন: নদী কি পেরোতে হবে? সকলের মনে একই প্রশ্ন জেগেছিল। কিন্তু তারা তো জানে না ওপারে গেলে তাদের কোনো লাভ আছে কি না। কোথায় কী আছে যতক্ষণ না তারা জানতে পারছে ততক্ষণ তাদের কাছে এপার-ওপার দুটোই সমান। লক্ষ্য তো পুব দিকের তীর। যাচ্ছিলও সেদিকে। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়াল অগ্নিপর্বত। সকলে যখন দ্বিধায় পড়েছিল সেইসময় একজন সৈনিক এগিয়ে এসে বলল, ‘সেনাপতি, আমার মনে হচ্ছে এই নদী পেরোনো সহজ হবে না।’

সমরসেন বলল, ‘আমিও তাই ভাবছি। তবে লম্বা একটা দড়ি পাওয়া গেলে অতটা কঠিন নাও হতে পারে। কিন্তু এই বনজঙ্গলে দড়িটা পাওয়াই শক্ত। চেষ্টা করলে গাছের লতা দিয়ে দড়ি পাকানো যায়। যদি কেউ পার তা কর।’ সঙ্গেসঙ্গে সৈনিকরা গাছের লতা ঝুরি দিয়ে মোটা লম্বা একটা দড়ি বানিয়ে নিল। ওরা দড়ির ওই একপ্রান্ত নদীর তীরের একটা গাছে বাঁধল। তারপর অন্যপ্রান্ত ধরে জলে নেমে পড়ল। একে একে নদী পেরোতে লাগল। দেখতে দেখতে দলের প্রত্যেকেই নদী পেরিয়ে গেল। মহানন্দে সমরসেন সৈনিকদের নিয়ে একটি উঁচু জায়গায় গেল। সেখানে অত বেশি গাছ ছিল না। সেখানে আবার ওরা মানুষের পায়ের চিহ্ন পেল। পেয়ে তাদের মনে ভরসা এল। এই ভরসাই তাদের মনে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা জোগাল। ওরা পায়ের চিহ্ন ধরে এগোতে লাগল। হঠাৎ ওদের কানে এল অনেকগুলো হাতির ডাক। হাতির ডাক ওদের কাছে পরিচিত। অরণ্যের হাতি ভয়ংকর হয়। অতগুলো হাতির ডাক একসঙ্গে কানে যেতেই ওদের ভীষণ ভয় করল। নদী

পেরিয়ে ওরা যতটা উৎসাহ পেয়েছিল অনেকগুলো হাতির ডাক শুনে তাদের সেই উৎসাহে ভাটা পড়ল। ভয়ে ভয়ে সেনাপতির দিকে তাকাল। সেনাপতি তৎক্ষণাৎ একটি উঁচু গাছে উঠে পড়ার ইশারা করে নিজেও উঠল। ওদের গাছে ওঠার পর, কিছুক্ষণ যেতে-না-যেতেই, অনেকগুলো হাতি ওই গাছের তলা দিয়ে চলে গেল। অতগুলো হাতি যেখান দিয়ে যাচ্ছে সেখানকার মাটি কেঁপে উঠছে। অগ্নিপর্বতের আগুনের পিণ্ড ছিটকে ছিটকে যেখানে পড়ছে সেখানকার পশুগুলো প্রাণের ভয়ে পালাচ্ছে। হাতিগুলো যেদিক থেকে গেল সেদিকের বনজঙ্গল মাড়িয়ে গেল।

গাছের ওপর থেকে অতগুলো হাতিকে একসঙ্গে যেতে দেখে সমরসেনের সৈনিকরা ভয় তো পেয়েছিলই, সমরসেন নিজেও কম ভয় পায়নি। সে ভাবতে লাগল, গাছে উঠে পড়ার বুদ্ধি যদি সময়মতো না জাগত তাহলে কী ভয়ংকর বিপদেই না পড়তে হত। এত হাতি তাদের উপর দিয়ে মাড়িয়ে যাওয়ার পর আর তাদের বাড়ি ফেরা হত না।

সমরসেন ও তার সঙ্গীরা গাছের ওপর থেকে পরিষ্কার দেখতে পেল হাতির দল অনেক দূর চলে গেছে। ওদের চলে যাওয়ার পর সমরসেনের মনে হল, এবার নামা যেতে পারে। কিন্তু তার মনে হলেও প্রতিমুহূর্তেই সকলের মনে একই প্রশ্ন, 'আবার না কোনো বিপদে পড়তে হয়।' বরং ওদের ইচ্ছে করছিল গাছের ওপর আরও কিছুক্ষণ বসে থাকতে। ওরা জানে ওরা বসে থাকলে ওদের ভাগ্যও বসে থাকবে।

দোনামনা করে সমরসেন ও তার সৈনিকরা আস্তে আস্তে গাছ থেকে নীচে নামল। এখন তাদের মনের অবস্থা এমন হয়েছে যে গাছের পাতা নড়লেও ওদের ভয় করছে। সর্বক্ষণ ওরা কান খাড়া করে আছে। নীচে নেমে ওরা লক্ষ করল হাতিগুলো ছোটো ছোটো গাছ ভেঙে মাড়িয়ে সমান করে গেছে। এতক্ষণ ওরা যেভাবে পায়ের চিহ্ন খুঁজে খুঁজে পথ বের করে হাঁটছিল এখন আর সেসব চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেল না। যে পথে হাতি গেছে সে পথে কি আর মানুষের পায়ের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়? সকলের এক প্রশ্ন, 'এখন কী করা যায়?'

সাত

সমরসেন সৈনিকদের মনে সাহস যুগিয়ে একটা উঁচু জায়গায় উঠে চারদিকে তাকাতে লাগল। তার আশা, অদূরে কোনো কুঁড়ে ঘর দেখতে পাবে। অনেকক্ষণ তাকানো সত্ত্বেও কোনো ঘরবাড়ি সমরসেনের চোখে পড়ল না।

এখন কী করা যায়? কোন পথে এগোলে, পুব দিকের জাহাজের কাছে পৌঁছানো যাবে? এই প্রশ্ন সমরসেনের মনে বার বার জাগতে লাগল। এই একই প্রশ্ন তার সৈনিকদের মনেও জাগছিল। সমরসেন ভাবতে লাগল, কী করা যায়? অনেকক্ষণ ভেবেও সে ঠিক করতে পারল না যে কী করবে।

এইভাবে সকলের মগজে যখন একই চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল তখন আর্তনাদ শোনা গেল। ওই আর্তনাদ একচোখোর বা চারচোখোর ছিল না। অন্য কোনো মানুষের আর্তনাদ এরা শুনতে পেল। ওই গভীর অরণ্যে মানুষের আর্তনাদ শুনে সৈনিকরা চমকে উঠে সমরসেনের দিকে তাকাল। সমরসেন ঝট করে খাপ থেকে তরবারি বের করে সৈনিকদের নির্দেশ দেয়, 'চলে এসো।' বলেই এগোতে থাকে যেদিক থেকে আর্তনাদ শোনা গিয়েছিল সেইদিকে। তাকে অনুসরণ করতে গিয়ে সৈনিকরাও তরবারি বের করল। যত ওরা এগোচ্ছিল ততই মানুষের কণ্ঠস্বর ওরা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা ঘটনাস্থলে পৌঁছাল। সেখানে যে দৃশ্য ওরা দেখল তাতে তারা রীতিমতো ভয় পেল। কিন্তু সেটা কিছুক্ষণের জন্য। তারপর তাদের বুকে আবার আশা জাগল। কারণ ওই ভয়ংকর দ্বীপে এই প্রথম ওরা একটা জ্যান্ত মানুষ পেল। কিন্তু লোকটা এমনভাবে আছে যে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কি হল। হয়তো তাকে মেরে গাছের সঙ্গে বেঁধে চলে গেছে। ওই অসহায় লোকটাকে খেয়ে ফেলার জন্য চার-পাঁচটা নেকড়ে তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। নেকড়েগুলো যখন এগোচ্ছিল তখন এক বিশালাকায় বাঘ সেখানে এসে পড়ল।

একদিকে বাঘ, অন্যদিকে নেকড়ে। কে যে ওই লোকটাকে আগে খাবে তার যেন প্রতিযোগিতা লেগে গেল। ঠিক সেইসময়ে ওই অসহায় মানুষটা আর্তনাদ করে উঠল।

সমরসেন কিছুক্ষণের মধ্যেই গোটা ব্যাপারটা অনুধাবন করল। বাঘের থাবা খেয়ে এক-একটা নেকড়ে ছিটকে পড়ছিল। হয়তো বাঘের ইচ্ছা ছিল সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীদের মেরে ফেলে দিয়ে ধীরে-সুস্থে মানুষটাকে খাওয়া। সমস্ত নেকড়েগুলো যখন পড়ে গেল, তখন সমরসেন ভাবল, আর একমুহূর্ত বিলম্ব করা উচিত নয়। সে তৎক্ষণাৎ ধনুকে তির চড়িয়ে বাঘকে মারল। বাঘ গর্জন করতে করতে মাটিতে পড়ে গেল।

বাঘের পড়ে যাওয়ার সঙ্গেসঙ্গে সৈনিকরা দ্রুত এগিয়ে গেল আর ঠিক সেইসময়ে ক্ষুধার্ত নেকড়েগুলো ওদের দিকে এগোতে লাগল। কিন্তু সৈনিকরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে নেকড়েগুলোর মোকাবিলা করল। কিছুক্ষণের মধ্যে নেকড়েগুলোকে মেরে ফেলা হল। তারপর সমরসেন এগিয়ে এসে গাছে বাঁধা অবস্থায় থাকা মানুষটাকে মুক্ত করল।

মুক্ত হয়ে লোকটা বলল, 'আপনাদের সবাইকে নমস্কার করছি। আপনারা মহান, তা না হলে আমার মতো অসহায় মানুষটাকে নেকড়ে আর বাঘের খপ্পর থেকে উদ্ধার করতেন না।'

লোকটার দেহের গঠন, আচরণ এবং কথা শুনে সমরসেন অবাক হল। সে নিশ্চিত হল যে এই লোকটা কোনোক্রমেই এই তান্ত্রিকে ভরা দ্বীপের অধিবাসী নয়। ঘটনাচক্রে হয়তো এসেছে। এইসব কথা ভাবতে ভাবতে সমরসেন লোকটাকে প্রশ্ন করল, 'তুমি কোথাকার লোক?'

'আমি...আমি কুণ্ডলিনী দ্বীপের সৈনিক। আপনি তো একটা দেশের সেনাপতি। আপনার নাম তো সমরসেন, তাই না?' লোকটা সরাসরি এই প্রশ্ন করল।

লোকটার প্রশ্ন শুনে সমরসেন এবং সৈনিকরা রীতমতো অবাক হল। এই লোকটা যে ওদের জাহাজে আসেনি সে ব্যাপারে কারও কোনো সন্দেহ ছিল না। তাহলে এই লোকটা এই দ্বীপে কী করে এসেছে? কেন এসেছে? এই ধরনের প্রশ্ন সমরসেন এবং তার সৈনিকদের মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল।

সমরসেন এবং তার সৈনিকদের হাবভাব লক্ষ করে লোকটা বলল;

তোমরা যেদিন বেরিয়েছিলে সেদিন কি একটা ধূমকেতু লক্ষ করনি? তোমরা কারও বারণ শোনোনি। সোজা বেরিয়ে পড়েছিলে। তারপর ঝড়ে পড়লে। সমুদ্র

হল উত্তাল। রাজা চিত্রসেন খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। তোমরা যাতে কোনো বিপদে না পড়, সেজন্যে রাজা চিত্রসেন টানা চার-পাঁচ দিন কুণ্ডলিনীদেবীর পুজো করলেন।

কিন্তু ঝড়বৃষ্টি টানা এক হপ্তা চলেছিল। রাজা চিত্রসেন দুর্ভাবনায় পড়লেন। প্রজারাও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হল।

শেষে রাজা চিত্রসেন পুরুতঠাকুর এবং জ্যোতিষীর মাধ্যমে গণনা করিয়ে তোমরা যে কোন অবস্থায় আছ তা জানতে পারলেন। দেবজ্ঞ গণনা করে জানিয়ে দিলেন, সকলে দ্বীপে পৌঁছে গেছে।

তারপর রাজা চিত্রসেন মন্ত্রীমণ্ডলীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করলেন। তারা ভাবলেন, মুষ্টিমেয় কয়কে জন সৈনিককে নিয়ে নতুন দ্বীপে উঠে বিরাট ঝুঁকি নিয়েছ। তারপর ঠিক হল, তাদের খুঁজে বার করার জন্য কিছু সৈনিককে পাঠানো হবে। শেষে কুম্ভাণ্ডের নেতৃত্বে তোমাদের খোঁজার জন্য এক সৈন্যদল বের হল।

ওই লোকটা এতটা জানাবার পর সেনাপতি সমরসেন চোখ ছানাবড়া করে বলল, 'কে এই কুম্ভাণ্ড?' পরক্ষণেই সমরসেন বলল, 'ওহো! এখন মনে পড়েছে, সংস্থানাধিপতি কুম্ভাণ্ড।'

'হ্যাঁ, সেই-ই। তারই জন্য আমার এই অবস্থা হয়েছে।' লোকটা বলল।

এখন সমরসেন বুঝতে পারল, ওই লোকটা তারই দেশের সৈনিক। কিন্তু তার কথা শুনে সমরসেন এবং তার সৈনিকদের বিস্ময় আরও বেড়ে গেল। ওই সৈনিক আবার তার কাহিনি শুরু করল:

তোমাদের সন্ধানে জাহাজে বেরিয়ে কয়েক দিনের মধ্যে এই দ্বীপে পৌঁছেছি। এই দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে নেমেছি। কুম্ভাণ্ড আমাদের সবাইকে তীরে অপেক্ষা করতে বলে দু-জন সৈনিককে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

সারাদিন আমরা তার অপেক্ষায় ছিলাম। টানা চব্বিশ ঘণ্টার পর, পরের দিন, কুম্ভাণ্ড একা ফিরে এল। একা ফেরার কারণটা যে কী তা না জানিয়েই আমাদের শুধু হুকুম করতে লাগল। আমাদের কাছে তির-ধনুক অস্ত্র যা কিছু ছিল সব সমুদ্রে ফেলে দিতে বলল। আমরা অনেক ভেবেও বুঝতে পারলাম না কেন আমাদের জিনিসগুলো ফেলে দিতে বলল। তার চেয়ে আশ্চর্যের কথা, কুম্ভাণ্ড যে দু-জনকে নিয়ে গিয়েছিল ওদেরকে যে কোথায় রেখে এসেছে, কী যে ঘটেছে, তাও কিছু বলল না। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে অনেক বার প্রশ্ন করার পর আমরা জানতে পারলাম যে ওই দু-জনকে বনের অধিবাসীরা মেরে ফেলেছে।

লোক দুটো সম্পর্কে কুম্ভাণ্ড যা বলল তাতে আমরা সন্তুষ্ট হতে পারিনি। তাই আমরা ওকে চেপে ধরি। তখন সে খেপে গিয়ে বলল, 'আমি সেনাধিপতি,

আমি যা আদেশ করব সেটা তোমরা পালন করবে। আমার মুখের ওপর কারও কোনো কথা বলার অধিকার নেই।'

সমরসেন নতুন এই সৈনিকটিকে বলল, 'আচ্ছা, কুম্ভাণ্ড তো তোমাদের অস্ত্র ফেলে দিতে বলেছিল। সে নিজের তির-ধনুক প্রভৃতি অস্ত্র কি ফেলে দিয়েছিল?'

'সেটাই তো আশ্চর্যের বিষয়। নিজের তির-ধনুক যত্ন করে রেখে আমাদেরগুলো ফেলে দিতে বলল। এই ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে কয়েক জন শিকারি হইচই করতে করতে পৌঁছে গেল। আমাদের কাছে যা-কিছু ছিল সব তো ফেলে দিয়েছিলাম সমুদ্রে। তাই আমরা ছিলাম নিরস্ত্র। অগত্যা হাতের কাছে পাথর ইত্যাদি যা পেলাম তাই দিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমরা প্রতিরোধের চেষ্টা করলে কী হবে আমাদের সেনাপতি কুম্ভাণ্ড নির্দেশ দিল ওদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে। এই ধরনের নির্দেশ শুনে আমরা রীতিমতো বিচলিত হয়েছি এবং অবাক হয়েছি। ইতিমধ্যেই আমাদের দলের অনেকে ওই বুনো শিকারিদের কাছে আত্মাহুতি দিয়েছে। বাকি যারা বেঁচে ছিলাম তারা নিরুপায় হয়ে ওদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলাম।'

সমরসেন বিচলিত হয়ে কুম্ভাণ্ডের উপর রেগে গিয়ে বলল, 'তোমাদের উপর এ-রকম আক্রমণ যখন চলছিল, তোমরা যখন দলে দলে মৃত্যুবরণ করছিলে, তখন কুম্ভাণ্ড তোমাদের বাঁচানোর চেষ্টা করেনি?'

'একটুও না। তারপর ওরা আমাদের পিছমোড়া করে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখল। কুম্ভাণ্ডকে ওরা পালকির মতো উঁচু একটা জিনিসের উপর বসিয়ে মহা উৎসাহের সঙ্গে নিয়ে গেল। মনে হল ওরা ওদের মনের মতো একটা রাজাকে পেয়েছে। তাই মহানন্দে কাঁধে চাপিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কী করে যে আমরা নিজেদের ছাড়াব, নিজেদের বন্ধন খুলব, ভেবে পাচ্ছিলাম না। আর কুম্ভাণ্ড কোন জাদুর বলে যে ওদের এতটা অধীনে এনে ফেলতে পারল সেটাও আমাদের কাছে বিস্ময়। আবার যখন ভাবি ওদের কাছে আমরা যাতে

পরাজিত হই সেইজন্যেই তির-ধনুকসহ আমাদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ফেলে দিতে বলেছিল।' ওই লোকটি বলল।

সমরসেন অস্থির হয়ে বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না, তারপর কী হল তাড়াতাড়ি আমাকে বল।'

'আমাদের সমস্ত প্রশ্নের জবাব আমরা দু-তিন দিনের মধ্যেই পেয়ে গেলাম। ওরা তির-ধনুক চালাতে জানে না। ওরা তির ছুড়ে কোনো জন্তুকে মেরে ফেলার দৃশ্য দেখে অবাক হয়েছিল। কুম্ভাণ্ড ওদের বুঝিয়ে ছিল যে তির ছুড়ে মারার কৌশল একমাত্র তারই জানা আছে। তাই সে আমাদের তির-ধনুক সমুদ্রের জলে ফেলে দিতে বলেছিল।' ওই লোকটি বলল।

সমরসেন প্রশ্ন করল, 'তারপর কী হল?'

'তারপর হঠাৎ কয়েক-শো লোক হইহই করতে করতে আমরা যেখানে ছিলাম সেখানে এল। কুম্ভাণ্ড ওদের যেন একটা নতুন জাদু শেখাচ্ছে। এমনভাবে একটা উড়ন্ত পাখিকে লক্ষ করে তির ছুড়ল যে তিরবিদ্ধ পাখিটি নীচে পড়ে গেল। তার পর সে এখটা ছুটন্ত হরিণকে তিরবিদ্ধ করে মেরে ফেলল। ওই দুটো ঘটনা দেখে ওরা কুম্ভাণ্ডকে মাথায় তুলে নাচতে লাগল। ওদের উৎসাহ দেখে কুম্ভাণ্ডও মনে মনে ঠিক করেছিল— ওদের সাহায্যে সে এই দ্বীপের রাজা হবে।' বলল ওই সৈনিক।

'এখানে কাদের উপর শাসন করবে? আর এই দ্বীপে কী আছে? হিংস্র জন্তু, অগ্নিপর্বত এবং দু-জন তান্ত্রিক। আমরা তো দ্বীপের অনেকখানি হেঁটেছি। কোনো দামি জিনিস অথবা জনবসতি দেখতে পেলাম না। যে উদ্দেশ্যে আমরা বেরিয়েছি তার কতটুকু সফল হবে এখানে?' সমরসেন বলল।

'হ্যাঁ, তান্ত্রিকদের কথা শুনেছিলাম বটে। ওরা কি এখানেই আছে?' ওই লোকটি প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ আছে। এই যে আমি তাদের মধ্যে একজন, আমাকে চিনতে পারছেন না!' বলে চারচোখা তান্ত্রিক ওদের সামনে হাজির হল।

আট

তান্ত্রিক চারচোখো হঠাৎ সামনে পড়ে যাওয়ায় সমরসেন এবং সৈনিকগণ ভয়ে কেঁপে উঠল। চারচোখোর সঙ্গী কালপেঁচা এবং নরবানর ধারে-কাছেই ছিল।

চারচোখো হাসতে হাসতে বলল, 'কেউ ভয় পেও না। পরের অপকার করা আমার কাজ নয়। ওই একচোখো ছাড়া এই পৃথিবীতে আমার আর কোনো শত্রু নেই। ওকে আমি একবার উচিত শিক্ষা দিতে চাই। যতক্ষণ না আমি তাকে শাস্তি দিচ্ছি ততক্ষণ আমি ওকে শত্রু মনে করছি।'

তারপর সে নতুন সৈনিকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই লোকটা আবার কে?'

'আমার নাম ধনপাল। এরা আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে।' বলল নতুন সৈনিক।

চারচোখা তার ওই জবাব শুনে অবিশ্বাস করার মতো মাথা নেড়ে বলল, 'এখন কিন্তু তোমরা সবাই একটা বিরাট বিপদে পড়তে যাচ্ছ। আমি যতদূর জানি, ওই একচোখো ছাড়া অন্য কেউ তোমাদের ক্ষতি করতে পারে না। এখন ওই দক্ষিণ কোণ থেকে, পাহাড়ের ওপর থেকে, তোমাদের ক্ষতি করার জন্য তোমাদের মতো কিছু মানুষ আসছে। এখন প্রাণে বাঁচার চেষ্টা কর।'

ওরা যখন এই ধরনের কথা বলাবলি করছিল তখন ঝোপের আড়াল থেকে দুটো লোক ওদের ওপর নজর রেখেছিল। ওদের দিকে না তাকিয়ে সমরসেন চারচোখোকে বলল, 'ভাই চারচোখো, তুমি তান্ত্রিক হলেও দেখে মনে হচ্ছে, তুমি ভালো লোক। আমরা এখন সত্যি প্রাণের ভয়ে ভীত হয়ে আছি। এখন তুমিই বল আমরা কীভাবে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে পারি।'

চারচোখো তৎক্ষণাৎ জবাব না দিয়ে কিছুক্ষণ ভেবে বলল, 'সমরসেন, এই দ্বীপে এত যে ঝামেলা হচ্ছে, এত যে কৌশল, ঝগড়া লড়াই সব কিছু হচ্ছে একটি কারণে। ওই পশ্চিম দিকের সমুদ্রে আধডোবা অবস্থায় একটা জাহাজ আছে। সকলের ধারণা, ওই জাহাজে অগাধ ধনসম্পত্তি আছে। আবার কেউ কেউ মনে করে, ওই জাহাজে কিছু নেই। একচোখো তান্ত্রিকটা চায় ওই জাহাজের সমস্ত সম্পত্তি। আর আমি চাই ওই জাহাজটাকে যে নাগকন্যা পাহারা দিচ্ছে সেই নাগকন্যাকে। তোমরা যে ঠিক কী চাও যদি আমাকে খুলে বল তাহলে আমি তোমাদের সাহায্য করতে পারি।'

সমরসেন যখন কথা বলছিল তখন নতুন সৈনিক ধনপাল ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছিল। হঠাৎ সে আর্তনাদ করে উঠল। সমরসেনের সৈনিকরা তার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল কী হয়েছে?'

অদূরে ঝোপের আড়ালে যারা ছিল তাদের দিকে তাকিয়ে ধনপাল বলল,
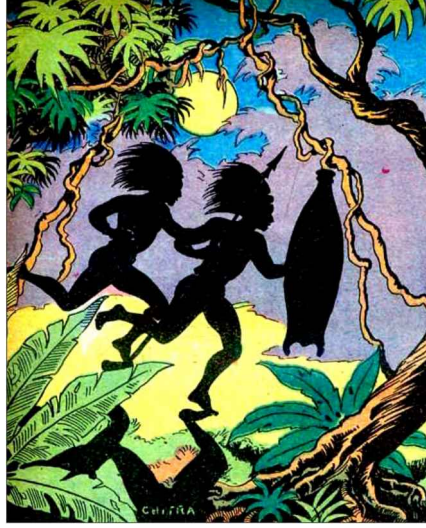
'ওই দিকে তাকাও। ওই শিকারিরা আবার এসেছে। ওরাই আমাকে গাছে ঝুলিয়ে বেঁধে রেখেছিল।'

সমরসেন এবং তার সৈনিকরা যেদিকে ধনপাল তাকাতে বলল সেদিকে তাকাল। তৎক্ষণাৎ সমরসেন ধনুকে তির চড়াল।

চারচোখোটা শান্ত হওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলল, 'সমরসেন, তোমার তিরের আঘাতে আকাশের উড়ন্ত পাখি অথবা ধাবমান চিতাবাঘ মারা যেতে পারে। কিন্তু ওই লোকগুলো তোমার তিরের চেয়ে দ্রুত ছুটতে পারে। ওদের ব্যাপার আমার হাতে ছেড়ে দাও, আমি দেখছি।'

তারপর চারচোখো নরবানর এবং কালপেঁচাকে ডাকল। ডাকার সঙ্গেসঙ্গে ওরা তার কাছে এল। তখন চারচোখো বলল, 'নরবানর, ওই যারা ঝোপের আড়াল থেকে তাকাচ্ছে ওদের তুমি শাস্তি দাও। আর শোনো, কালপেঁচা, তুমি ওই গোটা অঞ্চলে একবার চক্কর দিয়ে এসো।' চারচোখো ওদের এই নির্দেশ দিল।

নরবানর তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়ে ধাবমান একটা লোককে ধরে ফেলল। যাকে ধরল সে ভয়ে কাঁপতে লাগল। গোটা বনে তার আর্তনাদ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। নরবানর তাকে দু-তিন বার বাঁই বাঁই করে ঘুরিয়ে ওপরের দিকে ছুড়ে দিল। লোকটা আর্তনাদ করতে করতে একটি পাথরের উপর পড়ে গেল।

অন্য যে লোকটা ছুটছিল তাকে অনুসরণ করল কালপেঁচা। কিছুক্ষণের মধ্যে তার মাথায় ঠোক্কর মারতে লাগল।

ওইসব ভয়ংকর দৃশ্য দেখে ধনপাল সমরসেনের সৈনিকদের সকাতরে বলল, 'আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। আমি একটু জল খেতে চাই।'

চারচোখো হাত তুলে বলল, 'যতই তৃষ্ণা পাক, এখানকার কোনো জল হঠাৎ খেয়ে ফেলো না। খাবার জলের সন্ধান আমি দেব। এই দ্বীপ সমস্ত দিক থেকে একটা ভয়ংকর দ্বীপ। এই দ্বীপে কোথায় যে কী আছে তা কেউ বলতে পারে না। সমস্ত দিক থেকে, সাবধান না থাকলে, যেকোনো মুহূর্তে ভয়ংকর বিপদে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। আমার সঙ্গে এসো। আমি তোমাদের এমন জায়গায় নিয়ে যাব যেখানকার জল খেলে তোমাদের বিপদ ঘটবে না।' বলে চারচোখো এগিয়ে গেল।
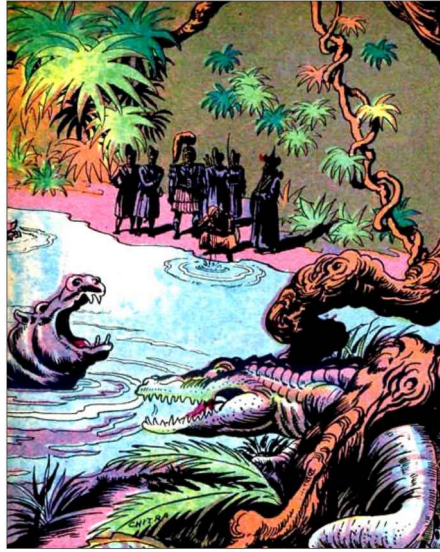
কিছুদূর যাওয়ার পর একটি জলাশয়ের কাছে চারচোখোটা দাঁড়াল। ওই জলাশয়ে কুমির এবং অন্যান্য হিংস্র জন্তু থাকে। সেসব যে প্রান্তে ছিল না সে সেই প্রান্তে গিয়ে, তীরে বসে তৃষ্ণা মিটিয়ে নিল। সমরসেনও তীরে বসে আঁজলা করে জল নিয়ে পান করল। জলপানের পর সমরসেন ভাবল, 'যে দুটো লোক আড়াল থেকে তাদের লক্ষ করছিল তারা হয়তো কুম্ভাণ্ডের লোক।' ইতিমধ্যে তার মাথায় আর একটা চিন্তা এল। সেই আধডোবা জাহাজের চিন্তা। চারচোখো চায়, সেই জাহাজকে যে নাগকন্যা পাহারা দিচ্ছে তাকে। তার বিষয়ে সমরসেনের কৌতূহল জাগল। সে চারচোখোকে বলল, 'আচ্ছা, আমি একটা কথা ভাবছি, তুমি বলেছিলে তোমার ধনসম্পত্তির কোনো লোভ নেই। ওই জাহাজে তেমন কিছু আছে বলে তোমার বিশ্বাস হয় না। তাই যদি সত্য হয়, তাহলে নাগকন্যাই বা ওই জাহাজ পাহারা দিচ্ছে কেন? ধনদৌলত না থাকলে তো নাগকন্যা পাহারা দেয় না।'

'আমি একটি কথাও মিথ্যা বলিনি। জাহাজ বল, নাগকন্যা বল, যদি দেখতে চাও চলে এসো আমার সঙ্গে। ওসব খুব বেশি দূরে নেই, কাছেই আছে। এসো।' চারচোখো বলল।

সমরসেন হ্যাঁ, না কিছু না বলেই চারচোখোকে অনুসরণ করল। কিছুক্ষণের মধ্যে এরা পৌঁছে গেল একটা উঁচু পাহাড়ে। সেখান থেকে দেখতে পেল সমুদ্র। সমুদ্রকে সেখান থেকে দেখে মনে হল সমুদ্র শান্ত, নিস্তরঙ্গ।

'ওই দেখ, ওই সেই আধডোবা জাহাজ।' তর্জনী দিয়ে চারচোখো আধডোবা জাহাজটাকে দেখিয়ে দিল।

সমরসেন এবং তার সঙ্গী সৈনিকরা আধডোবা জাহাজটাকে পরিষ্কার দেখতে পেল। মনে হচ্ছিল ঠিক অর্ধেকটা জাহাজ সমুদ্রের জলে ডুবে আছে। পাল ছিঁড়ে গেছে। সবাই জাহাজ দেখতে পেল বটে কিন্তু দেখা গেল না নাগকন্যাকে।

কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক তাকানোর পর সমরসেন চারচোখোকে প্রশ্ন করল, 'জাহাজ তো দেখতে পেয়েছি, কিন্তু নাগকন্যা কোথায়?'

তার প্রশ্নের জবাবে একটু হেসে চারচোখো বলল, 'সমরসেন, তুমি যদি এই সাদাচোখেই নাগকন্যাকে দেখতে পেতে তাহলে এই তান্ত্রিকরা আছে

কী করতে? ওই নাগকন্যাকে আমি এবং একচোখো দেখতে পাই মন্ত্র বলে। একচোখো চায় জাহাজের ধন তাই সে নাগকন্যাকে শত্রু মনে করে আর আমি চাই নাগকন্যাকে। তাই দিনরাত আমি তাকে স্মরণ করি।'

সমরসেন ভেবে পেল না আর কোন প্রশ্ন করবে। তবে একটা ব্যাপারে সে নিশ্চিন্ত হল। সে ভেবেছিল এখানকার ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করে কুণ্ডলিনী দ্বীপে ফিরবে। তার সেই আশা যে অত সহজে পূরণ হওয়ার নয় তা এখন জলের মতো পরিষ্কার। এমনিতেই দুই তান্ত্রিকের ঝগড়া এখানে আছে তার উপর জুটেছে কুম্ভাণ্ড। এ যেন গোদের উপর বিষফোঁড়া। সবচেয়ে বড়ো কথা, কোন মন্ত্রশক্তি বলে যে নাগকন্যার খপ্পর থেকে ওই জাহাজকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া যায় তা সমরসেনের জানা ছিল না।

সমরসেনকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ করে, তার মনের গতিবিধি টের পেয়ে যাওয়ার মতো মুচকি হাসি হেসে চারচোখো বলল, 'সমরসেন, তুমি যে কী ভাবছ, আমি তা অনুমান করতে পারি। এক্ষুনি আমি একটা কথা ভাবছি। তোমার চোখও যে ওই জাহাজের উপর নিবদ্ধ হবে এটা আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি। তবে একটা কথা মনে রেখ, ওই জাহাজের জন্য তোমার সঙ্গে আমার কোনোদিন বিরোধ দেখা দেবে না। সে ব্যাপারে তোমাকে লড়তে হবে একচোখোর বিরুদ্ধে। এখন তোমাকে ভাবতে হবে, তুমি আর আমি যদি এক হই তাহলে আমাদের উভয়ের ইচ্ছা পূরণ হবে কি না।'

চারচোখোর এই কথা শুনে সমরসেনের মনে নতুন উৎসাহ জাগল। মাত্র কিছুক্ষণ আগে, সমরসেন ভেবেছিল কোনোরকমে প্রাণ নিয়ে ওই দ্বীপ থেকে পালানোর কথা আর এখন তার মনে জেগেছে নতুন আশা। ঠিক করল, তার প্রথম কাজ হবে কুম্ভাণ্ডকে শাস্তি দেওয়া তারপর ওই জাহাজের ধনসম্পত্তি উদ্ধার করা এবং জাহাজের অন্য রহস্য জানা।

এইভাবে কিছুক্ষণ ভেবে সমরসেনের মনে হল জাহাজের রহস্যটাই আগে জানা দরকার। সে চারচোখোকে বলল, 'আচ্ছা, চারচোখো, তুমি তো জানো যেকোনো মানুষ একটা তান্ত্রিককে ভয় করে। এই দ্বীপে তোমার এবং একচোখোর অনিচ্ছায় কিছু হওয়ার নয়। তোমার এবং একচোখোর যা ক্ষমতা আছে, যে মিল আছে, তাতে মনে হয় তোমরা দু-জনেই একই পরিবারভুক্ত। আমার ভীষণ কৌতূহল জাগছে ওই জাহাজ সম্পর্কে। ওই জাহাজের ব্যাপারে বলবে?'

চারচোখো কিছুক্ষণ ভেবে বলল, 'দেখ, ওই জাহাজ এবং নাগকন্যার বিষয় বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে। আর সব কথা শুনতে তোমার ইচ্ছা নাও করতে পারে। যাই হোক, সংক্ষেপে বলছি শোনো। তুমি হয়তো

শমন দ্বীপের নাম শুনেছ। অথবা একই দ্বীপকে অন্য নামে জেনেছ। ওই শমন দ্বীপের রাজা ছিল শাকাই। শাকাই-এর নাম শুনে থাকবে। শাকাই ছিল চণ্ডীর ভক্ত। মন্ত্রতন্ত্রের ব্যাপারে তার জুড়ি ছিল না।

শমন দ্বীপটা ছোটো ছিল। শাকাই রাজার সৈন্যসংখ্যা বেশি ছিল না। কিন্তু যেহেতু শাকাই রাজা জটিল মন্ত্রতন্ত্র জানত সেইহেতু তাকে কেউ ঘাঁটাত না। ওই দ্বীপের উপর আক্রমণ চালানোর কথা স্বপ্নেও কেউ ভাবত না।

একবার রাজধানীতে দুর্গা পুজো হচ্ছিল। শাকাই নিজে পুজো করছিল। সবাই যখন করজোড়ে পুজো করছিল তখন দেবী বলে উঠল, 'তোমরা এত জন ভক্ত রয়েছ আমার জন্য একটা ভালো মন্দির তৈরি করতে পার না? আমার জন্য একটা মন্দির চাই।'

তৎক্ষণাৎ শাকাই বলল, 'দেবী, তোমার জন্য আকাশছোঁয়া চূড়াসহ একটা মন্দির তৈরি করব।'

সঙ্গেসঙ্গে দেবী বলল, 'পাথরের নয়, আমার মন্দির হবে রুপো এবং সোনার।'

দেবীর কথা শুনে শাকাইয়ের বুক কেঁপে উঠল। দেবীর এই দাবি পূরণ করলে হয়তো দেবী আরও প্রসন্ন হবে। দেবী যদি প্রসন্ন হয়, সারা বিশ্বের সোনা রুপো দিয়ে নিজের রাজকোষাগার ভরে উঠবে। তাই সে প্রতিশ্রুতি দিল দেবীকে।

নয়

শমন দ্বীপের রাজা শকাই সম্পর্কে চারচোখো যা বলল তা শুনে সমরসেন অবাক হয়ে গেল। চণ্ডীদেবী তার মন্দিরটাকে রুপো এবং সোনা দিয়ে গড়ে তোলার যে নির্দেশ দিয়েছে তা সমরসেনের কাছে রীতিমতো বিস্ময়ের।

গোটা মন্দিরকে সোনা এবং রুপো দিয়ে তৈরি করা সহজ ব্যাপার নয়।

'চারচোখো, সত্যি কথা বলতে কী, ভক্তের উপর এত বড়ো চাপ দেওয়া চণ্ডীদেবীর উচিত হয়নি। শুনে আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকছে।' সমরসেন বলল।

চারচোখো হো-হো করে হেসে বলল, 'সমরসেন, শক্তির উপাসনা বলতে যে কী বোঝায় তা তুমি জানো না। ইহলোকের সুখ, আনন্দ, কে কতটা শক্তি প্রয়োগ করতে পারে, কে কতখানি ক্ষমতা রাখে এসব কিছুই দেবতা পরীক্ষা করে দেখেন। আমাকে তো দূরের কথা, আমাদের রাজা শকাইকে চণ্ডীদেবী অনেকভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন।'

'তাহলে অত রুপো, সোনা শকাই কি সংগ্রহ করতে পেরেছিল?' সমরসেন প্রশ্ন করল।

'তোমার এই প্রশ্নের জবাবইতো আমি দিতে যাচ্ছিলাম। শুনলেই বুঝতে পারবে কেন নাগকন্যা অত সম্পদে ভরা জাহাজকে পাহারা দিচ্ছিল। আমি এবং একচোখো আজ পরস্পরের এতটা যে শত্রু হয়ে উঠেছি তার মূলে আছে ওই জাহাজ। আবার এই সমস্ত ঘটনার মূলে আছে শমন দ্বীপের দেবী—চণ্ডীদেবী। চণ্ডীদেবীর কথায় শকাই যদি মাথা না নাড়ত তাহলে এতসব ঝামেলা কাউকেই পোয়াতে হত না।' বলে চারচোখো তার কাহিনি শুরু করল—

শকাই প্রতিজ্ঞা করল, দেবীর আকাঙ্ক্ষা অনুসারে মন্দির গড়ে তুলবে। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে, মন্দির গড়ে তোলা যেন দেবীর ইচ্ছা। আসলে দেবী ইচ্ছা প্রকাশ করেনি, করেছে নির্দেশ। দেবীর নির্দেশ, যদি সত্যি সত্যি পালন করতে হয় তাহলে শকাইকে, তোমাদেরই মতো অন্যের রাজ্য দখল করতে হত। এ ছাড়া অন্য কোনো পথ তো খোলা নেই।

শকাই সৈনিকদের সংগ্রহ করার জন্য সারা দেশের লোককে খুঁজে খুঁজে বের করল। যাদের দেহে বল আছে, বুকে সাহস আছে, তাদের মল্লযুদ্ধ, তরবারি চালানোর প্রতিযোগিতা করিয়ে তার থেকে বাছাই করে অল্পসংখ্যক সৈনিকদের নিয়ে নির্দিষ্ট কাজের জন্য বাহিনী গঠন করা হল।

শকাই যখন এইভাবে নিজে সেনাবাহিনীতে লোক নিচ্ছিল তখন আমার বয়স ছিল কুড়ি। যুবক বলা চলে। একচোখোর বয়সও তখন আমার বয়সের সমান। আমরা দু-জনে একই গ্রামে থাকতাম।

আর একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, আসলে একচোখোর সঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই আমার ঝগড়া হত। ছেলেবেলার সেই মনোভাবই বাড়তে বাড়তে এখানে এসে দাঁড়িয়েছে। আজ আমরা পরস্পরের ঘোর বিরোধী। আজকের এই একচোখোটা আগে কিন্তু একচোখো ছিল না। এই দ্বীপে আসার পর সে হল একচোখো।

একচোখো এবং আমি যে এক গ্রামেরই ছেলে সে-কথা আগেই বলেছি।

শুধু এক গ্রামের নয়, আমাদের বাড়ি ছিল পাশাপাশি। ছেলেবেলা থেকে ওর সঙ্গে মাঝেমধ্যে তিক্ত সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তবে এতটা আগে ছিল না।

আসলে আমরা দু-জনে রাখালের কাজ করতাম। পশু চরানোই ছিল আমাদের কাজ। মাতব্বরের নাম ছিল পতঙ্গ। ওর ছিল অনেকগুলো ছাগল। আমরা ওর ছাগল চরাতে নিয়ে যেতাম। তখন আমাদের বয়স ছিল খুব কম। ছাগল চরাতে চরাতে বনের ভেতর ঢুকতে আমাদের ভয় করত। বড়োরা ওই বনে ঢুকত, শিকার করে ফিরত। কিন্তু আমরা কখনোই যেতাম না। কিন্তু যাওয়ার ইচ্ছা, বনের ভেতরে কী আছে তা দেখার কৌতূহল আমাদের মনে যথেষ্ট ছিল।

একবার আমি এবং একচোখো সহ কয়েকটি ছেলে ছাগল চরাতে চরাতে বনের ভেতরে ঢুকে গেলাম। বনটা ছিল অত্যন্ত ঘন। সেই বনে ছিল বাঘ, সিংহ এবং অন্যান্য হিংস্র পশু। দেখে মনে হল, চরানোর পক্ষে অত ভালো জায়গা আর নেই।

ছাগলগুলোকে সেখানে চরতে দিয়ে আমরা, সব ছেলেরা, একটা গাছের নীচে বসলাম। কিছুক্ষণ পরে একটা সুন্দর ছোট্ট হরিণের বাচ্চা আমার ছাগলগুলো যেখানে ছিল সেখানে এল। খুব সম্ভব সেটা তার মাকে পথে হারিয়ে, পথ ভুলে সেদিকে চলে এসেছিল।

হরিণের ওই বাচ্চাটিকে দেখার সঙ্গেসঙ্গে আমার ইচ্ছা করল, সেটাকে ধরে পুষতে। উঠে একলাফে ওই হরিণের বাচ্চার কাছে গেলাম। ইতিমধ্যে একচোখোও ওই হরিণটাকে দেখেছিল। সে বলে উঠল, 'ওটাকে আমি আগে দেখেছি।' বলেই

সে আমার পেছনে পেছনে ছুটতে লাগল। আমি আগে পৌঁছে গেলাম হরিণ বাচ্চার কাছে। আমার হাতে যে দড়িটা ছিল সেই দড়িটা তার গলায় বেঁধে টানতে যাচ্ছি এমন সময় একচোখো আমার কাছে গিয়ে দড়িটা ধরে টানতে লাগল। সেও ওটাকে নেবে, আর আমিও দেব না। শেষে রাগে আমি একটা পাথর তুলে ওর মাথায় মারলাম, ও পড়ে গেল।

সেই সুযোগে গলায় দড়ি বাঁধা অবস্থায় হরিণ বাচ্চাটি ছুটে পালিয়ে গেল। আমিও তার পেছনে পেছনে ছুটলাম। বনবাদাড় পেরিয়ে শেষপর্যন্ত হরিণটাকে ধরতে পারলাম। ততক্ষণে আমি হাঁপিয়ে পড়েছি। হরিণটি আসতে চায় না আর আমিও দড়ি ধরে টানছি। এই টানাপোড়েনের সময় হঠাৎ আমার কানে এল সিংহের গর্জন।

সিংহের গর্জন কানে যেতেই আমার বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। গর্জন শুনে মনে হল সিংহটা খুব কাছেই আছে। আমি রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। আমি তৎক্ষণাৎ হরিণটিকে গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেলেছিলাম। বাঁধার পর হরিণশিশুটি তারস্বরে আর্তনাদ করতে লাগল। আমি গাছের ওপরে উঠে আশঙ্কা করছিলাম, হরিণশিশুটির আর্তনাদ শুনে সিংহ যেন না এসে পড়ে। কয়েক মুহূর্ত যেতে-না-যেতেই সিংহটা সেখানে পৌঁছে গেল।

আমি গাছের ওপরে বসে আছি, আমার নিজের সম্পর্কে কোনো ভয় ছিল না। সিংহ এসেই হরিণশিশুটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেই মুহূর্তে হরিণশিশুটির আর্তনাদ শুনে আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। গাছের একটা ডাল ভেঙে সিংহের উপর ছুড়লাম। সেটাই আমার মস্তবড়ো ভুল হল। গাছের ডাল নীচে পড়ার সঙ্গেসঙ্গে সিংহ মাথা তুলে আমাকে দেখে নিল।

তারপর সিংহ হরিণশিশুটিকে মেরে খাওয়া শুরু করে দিল। খেতে খেতে সিংহ মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাচ্ছিল। যতটা খেতে ইচ্ছে করল ততটা খেয়ে সিংহ এক লাফে গাছের ওপরে ওঠার চেষ্টা করল। আমি তৎক্ষণাৎ আরও ওপরের দিকে উঠে গেলাম। সিংহও নাছোড়বান্দা। সে ঠায় গাছের নীচে বসে রইল। সূর্যাস্ত পর্যন্ত তাকে দেখেছিলাম, সে সেখানেই বসেছিল।

সেইরাত্রে আমি গাছের ওপরে সারারাত ঘুমোতে পারিনি। সারারাত ভয়ে কাঁটা হয়েছিলাম। সকালে দেখলাম নীচে সিংহ নেই। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি নেই, তবু গাছ থেকে নামার সাহস হল না। শুধু মনে হল, ধারে-কাছেই সিংহ আছে। আমার ধারণা যে সত্য তার প্রমাণ পেলাম কিছুক্ষণের মধ্যেই। পরিষ্কার শুনতে পেলাম সিংহের গর্জন। ঠিক কত দূরে গর্জন হচ্ছে তা আমি বুঝতে পারিনি। যত বার গাছ থেকে নামতে গেলাম তত বারই আমার বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগল।

সকাল পেরিয়ে দুপুর হয়ে গেল। তখনও সাহস করে আমি নামতে পারিনি।

হঠাৎ কোলাহল শুনতে পেলাম। খুব সম্ভব আমার সঙ্গে যে রাখালরা ছিল তারা গ্রামবাসীকে বলেছে যে আমি গভীর বনে আটকে গেছি। গ্রামবাসীরা হয়তো আমাকে উদ্ধার করতে আসছে। ওরা যে ক্রমশ আমার দিকে এগিয়ে আসছিল তা আমি টের পাচ্ছিলাম। ভাবলাম, গাছ থেকে নেমে ওদের দিকে এগিয়ে যাই কিন্তু পা কাঁপতে লাগল। অনেক বার চেষ্টা করেও একটু নীচে নামতে পারিনি। সর্বক্ষণ আমার মনে হচ্ছিল, ধারে-কাছেই সিংহ ঘাপটি মেরে বসে আছে।

বিভিন্ন অস্ত্র নিয়ে কম করে চল্লিশ-জন লোক আমার দিকে আসছিল। ওরা হাততালি বাজাতে বাজাতে নানা ধরনের আওয়াজ করতে করতে ওই গাছ থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে পৌঁছে গেল।

সকাল থেকে আমি যে আশঙ্কা করেছিলাম সেটাই সত্য হল। ঝোপঝাড়ের আড়ালে সিংহ ঘাপটি মেরে বসেছিল। ওদের এগিয়ে আসতে দেখেই সিংহ গর্জন করতে করতে ওদের দিকে এগিয়ে গেল, এই ধরনের বিপদ যে ঘটলেও ঘটতে পারে তারজন্য আমার গ্রামবাসীরা আগে থেকে প্রস্তুত ছিল। গ্রামবাসীরা সঙ্গেসঙ্গে ছড়িয়ে কৌশলে সিংহকে আক্রমণ করতে এগিয়ে গেল।

কেউ তাকে সামনের দিক থেকে কেউ তাকে পিছন দিক থেকে জব্দ করার চেষ্টা করল। সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করে শেষপর্যন্ত সিংহকে ওরা ঘায়েল করল। সিংহ পড়ে গেল। সিংহ পড়ে যাওয়ার সঙ্গেসঙ্গে ওরা তাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারতে লাগল। গাছের উপর থেকে এই দৃশ্য পরিষ্কার দেখতে পেয়ে আমার খুব আনন্দ হচ্ছিল। আমি হুড়মুড় করে গাছ থেকে নেমে মনের আনন্দে চিৎকার করে ওদের দিকে এগিয়ে গেলাম।

আমি যখন মনের আনন্দে ওদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম তখন যে দৃশ্য দেখলাম তা আমি কোনোদিন ভুলব না। একচোখোটা আমাকে দেখেই

চিৎকার করে উঠল। 'ভূত ভূত।' বলতে বলতে সে ছুটে পালিয়ে যেতে লাগল। অন্যরাও 'ভূত ভূত' বলতে বলতে যেদিকে পারল ছুটে পালাল।

চারচোখো এতক্ষণ যা বলছিল তা অবাক হয়ে শুনে সমরসেন তাকে বলল, 'কী অদ্ভুত ব্যাপার। অতগুলো লোক তোমাকে দেখে ভয় পেয়ে পালাল?'

চারচোখো রাগে দাঁত কটমট করতে করতে বলল, 'এইসব কিছুর মূলে আছে ওই একচোখো। ও ইচ্ছে করেই ভূত ভূত বলে চিৎকার করেছিল। ও এত আতঙ্কিত হয়ে না ছুটলে অন্যেরা হয়তো আমাকে একবার ভালো করে দেখত। ভাবতে পার, অত অল্প বয়সে একচোখোটা আমাকে কীরকম বিপদে ফেলেছিল? কত কৌশল খাটিয়ে লোকজন নিয়ে পালাল। শুধু সেই মুহূর্তেই নয়, তারপর থেকে গ্রামবাসীদের মনে রীতিমতো ধারণা হয়ে গেল, আমি সিংহের পেটে চলে গেছি। এই দেহটা হল ভূতের। কী বলব, সেই দুঃখের কথা, তারপর থেকে টানা দশটি বছর আমি নিজের গ্রামে ঢুকতে পারিনি। ওই দশটি বছর আমাকে বনেবাদাড়ে কাটাতে হয়েছে।

দশ

চারচোখো সমরসেনকে নিজের কাহিনি শোনাবার সময় হঠাৎ কোলাহল শুনতে পেয়ে চুপ করে গেল। কান খাড়া করে শুনতে লাগল আওয়াজটা ঠিক কোন জায়গা থেকে আসছে। অনুমান করার চেষ্টা করল কাদের আওয়াজ, কীসের জন্য ওই কোলাহল।

মাত্র কিছুক্ষণ আগে সূর্যাস্ত হল। গোটা পাহাড়ি অঞ্চলে আস্তে আস্তে অন্ধকার নেমে আসছিল। অতগুলো মানুষের আওয়াজ ভেসে আসছিল বটে, কিন্তু পাহাড়ের বুকে ওদের কোলাহল ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হওয়ার ফলে ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছিল না লোকগুলো কোনদিক থেকে আসছে আর কোনদিকে

যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে শুনতে পেল, একচোখোর খনখনে গলা, 'হে কালভুজঙ্গ, হে কঙ্কাল!'

সঙ্গেসঙ্গে যেদিক থেকে আওয়াজ আসছিল সেইদিকে মুখ ঘুরিয়ে চারচোখোটা বলল, 'সমরসেন, একদিক থেকে তোমার কুণ্ডলিনীর লোকগুলো আসছে, আর অন্যদিক থেকে আসছে একচোখো। জাহাজ এবং নাগকন্যার কাহিনি পরে শোনাব। এক্ষুনি আমাদের উচিত এমন এক জায়গায় লুকোনো যেখান থেকে আমরা ওদের গতিবিধি দেখতে পাব, কিন্তু ওরা আমাদের দেখতে পাবে না।'

চারচোখোর কথা শুনেই সমরসেন ভেবে পেল না কী করবে। তার কথানুযায়ী অন্য কিছু করা যে সম্ভব নয় সেটাও সে বুঝতে পারল। কুণ্ডলিনীর যে লোকগুলোর কথা চারচোখো বলল, ওরা যে কুম্ভাণ্ডের নেতৃত্বে আসা লোক সে ব্যাপারে সন্দেহ ছিল না।

'ওই তো ওরা এদিকেই আসছে। ওরা পাহাড়ের উপর উঠছে।' বলতে বলতে চারচোখো ঘুরে-ফিরে পাহাড়ের নীচের দিকে তাকাতে লাগল। বলার সঙ্গেসঙ্গে সৈনিকরাও তাকাল পাহাড়ের নীচের দিকে। কম করে চল্লিশ-পঞ্চাশ জন লোক নানারকম ধ্বনি দিতে দিতে সোজা পাহাড়ের উপর উঠছিল।

ওই দৃশ্য দেখে সমরসেন তরবারি ধরে প্রশ্ন করল, 'চারচোখো, এখন আমাদের কর্তব্য কী হবে? একা কুম্ভাণ্ড যদি থাকত তাহলে তাকে জব্দ করা এমন কোনো ব্যাপার ছিল না। কিন্তু আমি দেখছি চল্লিশ-পঞ্চাশ জন লোক এদিকে এগিয়ে আসছে। শিকারিরা সুসজ্জিত আছে। ভালো কথা, ওই একচোখোকে মোকাবিলা করা হবে না?'

'তোমাকে একটা কথা বলে রাখছি। ওই একচোখোর ব্যাপারটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও। আর তুমি যে কুম্ভাণ্ডকে মোকাবিলার কথা ভাবছ সে ভাবনা তুমি এখন বাদ দাও। এই অন্ধকারে পাহাড়ের উপর থেকে ওদের মোকাবিলা

করা সহজ নয়। তুমি যাকে শত্রু ভাবছ তার সঙ্গে যদি একচোখোর ঝগড়া বাধে তাহলে তো তোমার ইচ্ছাই পূরণ হবে। কুম্ভাণ্ড এবং একচোখোর মধ্যে যুদ্ধ লেগে গেলে যেই মরুক সে তো তোমার অথবা আমার শত্রু। শত্রু যদি শত্রুর হাতে মরে তহালে তার চেয়ে আনন্দের আর কী আছে।'

চারচোখোর কথা শেষ হতে-না-হতেই একচোখো এবং কুম্ভাণ্ড মুখোমুখি হল। ওই দৃশ্য চোখে পড়তেই সমরসেন আনন্দে বলে উঠল, এই তো ঘটে গেছে সেই ঘটনা। এই ঘটনার জন্যেই তো আমরা অপেক্ষা করছিলাম।'

চারচোখো মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'সমরসেন ব্যাপারটাকে অত সহজ ভেবো না। ওই ধনভাণ্ডারপূর্ণ জাহাজ এবং নাগকন্যার কথা পুরোটা এখনও বলিনি। ওই জাহাজ এবং নাগকন্যাকে ঘিরে অসংখ্য ঘটনা আছে। ঘটনার খাঁজে খাঁজে মন্ত্রতন্ত্রও আছে। একচোখো অত সহজে ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়। ইতিমধ্যে কুম্ভাণ্ডও ওই জাহাজ সম্পর্কে নিশ্চয় কিছু জেনেছে। জানলে তার মনেও লোভ জাগা স্বাভাবিক। এখন চুপচাপ আমার সঙ্গে এসো।'

সবাই নিঃশব্দে চারচোখোকে অনুসরণ করতে লাগল। আস্তে আস্তে পা ফেলে কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা একটা বড়ো পাথরের আড়ালে গিয়ে পৌঁছাল।

ইতিমধ্যে কুম্ভাণ্ড একচোখোকে দেখে ভয়ে কাঁপতে লাগল। একচোখোকে দেখেই কুম্ভাণ্ডের সঙ্গে যারা এসেছিল তারা যে যেদিকে পারল পালাল। ওদের পালানো দেখে হো-হো করে হেসে একচোখো চিৎকার করে বলল, 'তোমরা যে যেখানে আছ সেখানেই দাঁড়িয়ে থাক। একটু নড়লেই মৃত্যু অনিবার্য। যাকে আমি দেখতে পাচ্ছি সে আমার চোখের আড়ালে পালাতে পারবে না।' বলতে বলতে অন্যদিকে ঘুরে বলল, 'কালভুজঙ্গ, কাপালিক এদের ঘিরে ফেল।'

সঙ্গেসঙ্গে কালভুজঙ্গ ওদের চারদিকে বনবন করে ঘুরতে লাগল। কাপালিক ঘুরে বেড়াতে লাগল বাতাসে। ওদের ঘোরাফেরা দেখে কুম্ভাণ্ড এবং তাদের লোকজন ভয়ে গুটিয়ে গেল। তাদের ওই ভয় পাওয়া অবস্থায় দেখে একচোখো ওদের রক্তচক্ষু দেখিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, 'তোমরা কারা? কোত্থেকে আসছ? কোথায় যাচ্ছ?'

একচোখোর প্রশ্ন শুনে কুম্ভাণ্ড আরও ভয়ে কাঁপতে লাগল। সে ভেবে পেল না সত্যি কথা বলবে না, মিথ্যে কথা বলবে। কোন কথা বললে যে পরিণতি কী হবে তা সে অনুমান করতে পারল না। ওইদিকে যে দুই তান্ত্রিক আছে, আর ওই দু-জন তান্ত্রিক যে যথেষ্ট ক্ষমতা রাখে সে-কথা স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে কুম্ভাণ্ড আগেই শুনেছিল। সাহস সঞ্চয় করে কুম্ভাণ্ড একচোখোকে বলল, 'আমি ওই শিকারিদের রাজা, আমার নাম কুম্ভাণ্ড।'

'এখন সদলবলে কোথায় চললে?' দাঁত কটমট করে একচোখো প্রশ্ন করল।

কুম্ভাণ্ড ভাবল, এবার সত্য কথা বলতেই হবে। সে যদি মিথ্যে কথা বলে তাহলেও সত্য চাপা থাকবে না। তার সঙ্গীদের যেকোনো একজনকে ধরে একচোখো যদি প্রাণের ভয় দেখায় তাহলে সব ফাঁস হয়ে যাবে। কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে কুম্ভাণ্ড বলল, 'শুনেছি, এই পাহাড়ের ওপর থেকে সমুদ্রের দিকে তাকালে একটি জাহাজ দেখতে পাওয়া যায়। যাচ্ছি সেই জাহাজটাকে দেখতে।'

তার কথা শুনে একচোখো হো-হো করে হেসে ফেলল। কুম্ভাণ্ডের বলার আগেই একচোখো জানত, এরা কোথায় যাচ্ছিল এবং কোন উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। জানত বলেই কুম্ভাণ্ডের কথা শুনে ওইভাবে হেসে বলল, 'এই ঘন অন্ধকারে তুমি পাহাড়ে উঠছ সমুদ্রে জাহাজ দেখতে? তোমার মাথায় যথেষ্ট বুদ্ধি আছে দেখছি। এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি শিকারিদের রাজা হয়েছ? আরও ধনসম্পত্তি সংগ্রহ করতে চাইছ এ-রকম বুদ্ধি নিয়ে? তুমি সত্যি কথা বল? তুমি কি চাও ওই জাহাজের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করতে? ওই জাহাজের ধনসম্পত্তি চুরি করতে চাও?'

কুম্ভাণ্ড আর কোনো কথা বলতে পারল না। সে নীচের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল। একচোখো ধমক দিয়ে বলল, 'আমি ঠিক কথা বলছি, কি না বল?'

থতমত খেয়ে কুম্ভাণ্ড বলল, 'হ্যাঁ, ঠিক কথাই বলছ।'

একচোখো মহানন্দে মাথা নেড়ে বলল, 'বেশ কিছুদিন আগে আমি এই দ্বীপে পাঁচ-ছ জন লোককে দেখেছি। ওদের পোশাক আর তোমার পোশাক একরকম। ওরাও এসেছিল ধনসম্পদের লোভে। তুমি কি ওদেরই একজন?'

কুম্ভাণ্ড বুঝতে পারল, একচোখো কাদের কথা বলছে। কুণ্ডলিনী দ্বীপ থেকে

তার আগে সমরসেন বেরিয়েছিল। একচোখো যে সমরসেনের কথাই বলছে তা সে ভালোভাবেই বুঝতে পারল।

সত্যকে গোপন করার জন্য কুম্ভাণ্ড বলল, 'আমি ওই দলের নই। কাদের কথা যে তুমি বলছ তা আমি জানি। ওদের আমিও খুঁজছি। ওরা খুব লোভী। ধনভাণ্ডারে ভরা জাহাজটাকে ওরা খুঁজছে আমি ওদের খুঁজতে খুঁজতে এদিকে এলাম তোমার দেখা পেয়ে গেলাম।'

ওদের কথাবার্তা শুনে চারচোখো ভাবল, এই হল উপযুক্ত সময়। সে চিৎকার করে ডাকল, 'পেঁচা, নরবানর, তোমরা কোথায় আছ, এসো।' আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে সমরসেনকে ইশারায় ডাকল। সমরসেন তার ইশারা বুঝতে পেরে সদলবলে চারচোখোকে অনুসরণ করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমরসেন ও তার দলের লোক সমানে তির নিক্ষেপ করতে লাগল কুম্ভাণ্ড ও তার লোকজনের উপর।

'পেঁচা' শব্দটা শুনেই একচোখো হকচকিয়ে গেল। ঘুরে ঘুরে চারদিকে তাকাল। দেখতে দেখতে কুম্ভাণ্ডের দলের কিছু লোক তিরবিদ্ধ হয়ে নীচে পড়ে গেল। হঠাৎ কুম্ভাণ্ড সবাইকে ছেড়ে এক লাফ মেরে প্রাণপণে ছুটে পালাতে লাগল। দেখাদেখি তার দলের অন্যরাও ছুটে পালাতে লাগল। ওরা যত ছুটতে লাগল ওদের ধাওয়া করবার ইচ্ছা তত বেশি সমরসেনের দলের লোকের বেড়ে গেল। ওই অন্ধকারে, ঠিক লক্ষ করে, তির ছোড়া সহজসাধ্য ছিল না। কুম্ভাণ্ড হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল নিজের দলের লোকের উদ্দেশ্যে, 'তোমরা ওভাবে ছুটে পালিয়ো না। রুখে দাঁড়াও।'

এদিকে একচোখো পেঁচার ডাক শুনেই চমকে উঠে দাঁত কটমট করতে করতে বলল, 'ওহে চারচোখো, এতক্ষণে বুঝতে পারলাম তোমার চালাকি। এর আগে তো প্রচার করতে, তোমার চেয়ে বড়ো তান্ত্রিক আর নেই। আর সেই তুমি এখন অন্য লোককে দিয়ে আমাদের উপর তির ছুড়তে বলে জব্দ করার চেষ্টা করছ? আমি যদি একটু চেষ্টা করি তাহলে ওদের সবাইকে মেরে ফেলতে পারি। ওদের মৃতদেহগুলোকে তোমার সামনে এনে ফেলে দিতে পারি।'

চারচোখো একচোখোর কথার কোনো জবাব না দিয়ে, চোখের পলক না ফেলে, তার দিকে তাকিয়ে রইল। চারচোখো সেখান থেকে শুনতে পাচ্ছিল কুম্ভাণ্ডের চিৎকার এবং তার দলের লোকের আর্তনাদ।

চারচোখো কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে একচোখোকে বলল, 'একচোখো, তোমার আজেবাজে কথার জবাব দেবার মতো সময় আমার নেই। তোমার সঙ্গে তর্ক করে এখন আমার কোনো লাভ নেই। তোমার তরবারি বা অন্য কোনো অস্ত্র আমাকে যে কিছু করতে পারবে না তা তুমি জানো। তবে একদিন তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া হবেই।'

একচোখো কী যেন বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় চারচোখো নিজে অলংকৃত টুপিটা নাড়তে নাড়তে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে নজরে পড়ল কুম্ভাণ্ডের সঙ্গে সমরসেন যুদ্ধ করছে।

এতক্ষণে আকাশে চাঁদ উঠেছে।

চারচোখো হঠাৎ দূরে সরে গিয়ে ভাবতে লাগল কী করবে। সেই সুযোগে কুম্ভাণ্ড একচোখোর কাছে গিয়ে তার সাহায্যের জন্য কী যেন বলল। সমরসেন ভাবল, একচোখো কুম্ভাণ্ডকে সক্রিয় সাহায্য করার আগে যদি তাকে জব্দ না করা যায় তাহলে আর কুম্ভাণ্ডকে পরাস্ত করা যাবে না।

চারচোখো এবং সমরসেন যখন ভাবছিল তখন দূর থেকে অনেকগুলো বাঘের গর্জন শোনা গেল। চাঁদের আলোয় ওরা বেরিয়ে পড়েছে শিকারের সন্ধানে।

বাঘের গর্জন শোনার সঙ্গেসঙ্গে সকলে কান খাড়া করে শুনতে লাগল। চাঁদের আলোয় সবাই দেখতে পেল, বাঘগুলো তাদের দিকে ধেয়ে আসছে। এই অবস্থায় সকলের মাথায় এক চিন্তা, এই হিংস্র জন্তুর হাত থেকে কীভাবে রক্ষা পাওয়া যায়। এই অবস্থায় সমরসেন ও কুম্ভাণ্ড পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থামিয়ে যার লোক যেদিকে ছুটল তাদের নেতা সেদিকে ছুটল। গর্জন শোনার অল্পক্ষণের মধ্যে সমস্ত পরিস্থিতি বদলে গেল। সবাই ছুটছে।

এগারো

সমরসেন এবং সৈনিকরা কিছুদূর ছোটার পর থামল। কুম্ভাণ্ডের সঙ্গে যে শিকারিরা ছিল তাদের আর্তনাদ সেখান থেকে শোনা যাচ্ছিল। ওরা নেকড়েদের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে প্রাণপণ ছুটে পালাচ্ছিল। তান্ত্রিক একচোখো এবং চারচোখো ধারে-কাছে কোথাও ছিল না। নেকড়েগুলো তখনও গর্জন করছিল।

ক্লান্ত সৈনিকরা তো বটেই, সমরসেনও গাছের নীচে বসে বিশ্রাম করতে লাগল। এতক্ষণে সমরসেন পরিষ্কার বুঝতে পারল যে কুম্ভাণ্ড চায় ধনসম্পত্তি ভরা সেই জাহাজ। সমরসেন ভাবল, তাহলে এক জাহাজের পেছনে এখন লেগে আছে চার জন। চার জনেরই লক্ষ্য ধনভাণ্ডারে ভরা একটি জাহাজ। একচোখো, চারচোখো, কুম্ভাণ্ড এবং সমরসেন নিজে। মনে মনে প্রত্যেকে চায় ওই জাহাজের ধনভাণ্ডার।

সমরসেন যখন এই ধরনের কথা ভাবছিল তখন তার সঙ্গী সৈনিকরা ভাবছিল দেশে ফিরে যাওয়ার কথা। ওরা আর ওই দ্বীপের ভয়ংকর পরিবেশে থাকতে ইচ্ছুক ছিল না।

একজন সৈনিক সঙ্গীদের বলল, 'আর কতদিন আমরা এই ভয়ংকর দ্বীপে পড়ে থাকব। এখান থেকে কত তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়া যায় সে-কথা সবাই ভাব।'

সঙ্গেসঙ্গে কয়েক জন সৈনিক বলল, 'কে চায় এই জঘন্য দ্বীপে থাকতে। কিন্তু আমরা যাব বললেই তো যাওয়া হচ্ছে না।'

'সত্যি তাই, যাওয়া যাবে না। আমিও তোমাদের মতো এই দ্বীপ ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ভেবেছি। কিন্তু ব্যাপারটা আমাদের হাতের মধ্যে নেই। আমরা চাই বা না চাই আমাদের আরও কিছুদিন এখানে থাকতেই হবে। তোমরা কি একবারও ভেবেছ কোন পথে যাবে? পালানোর কোনো পথ কি আছে?' সমরসেন বলল।

সত্যি তাই সৈনিকরাও জানে না কোন পথে পালানো যায়। সমুদ্রতীরে ওরা যে জাহাজ ছেড়ে এসেছে সেই জাহাজগুলো যে কোন অবস্থায় আছে তা ওরা জানে না। এখন ওদের শত্রু হল একচোখো এবং কুম্ভাণ্ড। এমনভাবে পালাতে হবে যাতে ওদের চোখে না পড়ে। ওদের চোখে পড়লেই সর্বনাশ। কোনোক্রমেই বাঁচার উপায় থাকবে না।

অনেকক্ষণ পরে একজন সৈনিক সমরসেনকে বলল, 'তান্ত্রিক চারচোখোর তো অসীম ক্ষমতা। তার সাহায্যে কি আমরা পালাতে পারি না।'

সৈনিকটির প্রশ্নের জবাব সমরসেন সঙ্গেসঙ্গে দিতে পারল না। ওই ভয়ংকর দ্বীপ থেকে কুণ্ডলিনী দ্বীপে যাওয়ার জন্য চারচোখোকে অনুরোধ করতে হবে? চারচোখোর মতো একজন তান্ত্রিকের সাহায্য প্রার্থনা করে কুণ্ডলিনী দ্বীপে পৌঁছানো সমরসেনের কাছে রীতিমতো অপমানজনক লাগল। সমরসেন আরও ভাবল, এমনও হতে পারে যে চারচোখোকে অনুরোধ করা হল অথচ কার্যত দেখা গেল একচোখো অথবা কুম্ভাণ্ডের নজর এড়িয়ে কুণ্ডলিনী দ্বীপে পালানোর সুযোগ চারচোখো করে দিতে পারল না। তখন তো ব্যাপারটা আরও লজ্জার হবে।

শুধু যে সমরসেন ভাবছিল তাই নয়, সমরসেনের সৈনিকরাও ভাবছিল। এমন সময় হঠাৎ একটা তির এসে সমরসেনের মাথার উপর দিয়ে একটা গাছে বিদ্ধ হল। ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে সমরসেন সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করল, প্রত্যেকে গাছের আড়ালে দাঁড়াও। নিশ্চয় কুম্ভাণ্ড আমাদের দিকে তির ছুড়ছে।' বলে সমরসেন সৈনিকদের নিয়ে গাছের আড়ালে গেল।

সৈনিকরা সমরসেনকে অনুসরণ করল। পরক্ষণেই কুম্ভাণ্ডের বজ্রকণ্ঠ শোনা গেল, 'ধর, প্রাণ থাকতে ছেড়ো না।'

ওই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে কুম্ভাণ্ডের অনুচররা বিভিন্ন গাছের আড়াল থেকে বিচিত্র আওয়াজ করতে করতে বেরিয়ে এল।

সমরসেন পরিষ্কার বুঝতে পারল যে সে একটা বিপদে পড়েছে। কিছুক্ষণ ভেবে সে ঠিক করল, তার সঙ্গে মাত্র পাঁচ জন সৈনিক আছে। মাত্র ওই পাঁচ জন সৈনিককে নিয়ে কুম্ভাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ওদের পরাস্ত করা যাবে না। তাই সে সৈনিকদের ইশারা করে গাছের আড়ালে আড়ালে অনেক দূর

পালিয়ে গেল। পালাতে পালাতে ওরা তখনকার মতো বিপদ কাটিয়ে উঠে একটি পাহাড়ের কোণে আশ্রয় নিল। তখনও তাদের মনে হচ্ছিল কুম্ভাণ্ড চুপি চুপি খুঁজছে তাই নয়, খুব চিৎকার করে নানা ধরনের আওয়াজ করে করে খুঁজছিল। ততক্ষণে জ্যোৎস্নার আলো কমে গিয়ে অন্ধকার নেমে এসেছিল। এই অন্ধকার নেমে যাওয়ার ফলে সমরসেনের মন খুশিতে ভরে উঠল। সে রাত্রিটা কোনোরকমে সেখানেই কাটিয়ে দেওয়াই ঠিক করল। আস্তে আস্তে আশেপাশে খুঁজে একটা গুহা পেল। গুহার মধ্যেটা ভালো করে পরীক্ষা করে দেখে নিল। ততক্ষণে সৈনিকরা গুহার ভেতরে আশ্রয় নেওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সমরসেন ওদের বলল, 'ব্যস্ত হলে কিন্তু বিপদ ঘটতে পারে। আগে ভালো করে গুহাটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। কারণ সাধারণত গুহার ভেতরে হিংস্র জন্তু থাকে। হিংস্র জন্তুর হাত থেকে রেহাই পেতে হলে গুহার ভেতরে ঢোকার আগে সাবধান হতে হবে।'

সমরসেনের কথা শুনে একজন সৈনিক বলল, 'সেনাপতি, আপনি যা বলছেন তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কিন্তু মনে করুন, আমরা এই গুহার ভেতরে রইলাম আর কুম্ভাণ্ডের লোক এসে গেল তখন কী হবে? তখন কি গুহার ভেতরে আটকে পড়ব না? কুম্ভাণ্ড কি আমাদের শেষ, করে ফেলবে না?'

ওর কথা শেষ হতে-না-হতেই আর একজন সৈনিক বলল, 'গুহার ভেতরে কোনো হিংস্র জন্তু আছে কি না তা জানা যবে কী করে? আর জানা গেলেও আমরা কি অন্ধকারে অন্য কোনো গুহার সন্ধান পাব? আমরা কি পারব সেই হিংস্র জন্তুর কাছ থেকে নিজেদের বাঁচাতে?'

সৈনিকদের কথা শুনে সমরসেন মনে মনে হাসল। তারপর ওদের বলল, 'যে গুহার ভেতরে তোমরা কোনোদিন ঢোকনি সেই গুহার ভেতরে কি একটু দেখে-শুনে ঢোকা উচিত নয়? হিংস্র জন্তু থাকলে আমি মনে করি তোমরা মোকাবিলা করতে পারবে। আমরা কি এর আগে বড়ো বড়ো বিপদের মোকাবিলা করিনি? যাই হোক, এখন তোমাদের হাতে যা অস্ত্র আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত হও। আমি প্রথমে ঢুকছি। আমার পেছনে পেছনে তোমরাও ঢুকবে। আমি ধনুকে তির চড়িয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকব। তোমরা ধরে নাও সিংহ তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। ঝাঁপিয়ে পড়লে তোমরা যা করবে তারজন্য প্রস্তুত হয়ে, আমার পেছনে পেছনে এসো। বলে দিচ্ছি, খুব সাবধান।'

এ এক রোমঞ্চকর চরম মুহূর্ত। গুহার ভেতরে কী আছে তা কেউ জানে না। অথচ অত্যন্ত সাবধানে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে তাদের পা ফেলতে হচ্ছে। স্বীকার করতেই হবে যে অন্যদের তুলনায় সমরসেন যথেষ্ট দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। কারণ কিছুদূর এগোতে না এগোতেই ওরা গুহার ভেতর থেকে সিংহের

গর্জন শুনতে পেল। সঙ্গেসঙ্গে সমরসেন তো বটেই, তার সৈনিকরাও সিংহকে আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইল। সেইমুহূর্তে সৈনিকদের চোখে-মুখে আত্মবিশ্বাস ফিরে এল। ওরা নিশ্চিত হল যে ওরা সিংহকে আক্রমণ করে মেরে ফেলতে পারবে। শুরু হয়ে গেল সিংহের উপর আক্রমণ। ক্ষতবিক্ষত হয়ে সিংহ গুহা থেকে বেরিয়ে বনে পালিয়ে গেল।

তারপর খাপখোলা তরবারি নিয়ে সমরসেন গুহার আরও ভেতরে ঢুকল। গুহার ভেতরে আরও কয়েক পা এগোতেই কীসের যেন আর্তনাদ ওরা শুনতে পেল।

সমরসেন ঝট করে পিছু হটে নিজের লোকজনকে বলল, ‘আমার মনে হচ্ছে গুহার ভেতরে আরও একটা সিংহ আহত অবস্থায় পড়ে আছে। তার আঘাত কম না বেশি জানি না। পশুরাজ সিংহকে বিশ্বাস নেই। সবাই মিলে ভেতরে ঢুকে পড়া ঠিক নয়। এবার আগুন ধরাও।

সঙ্গেসঙ্গে দু-জন সৈনিক গুহার মুখে লতাপাতা জড়ো করে পাথরের গায়ে পাথর ঘষে আগুন জ্বালাল। ওই আগুনের মশাল ধরিয়ে মশালের আলোতে সমরসেন দেখতে পেল একটি সিংহশাবক আহত অবস্থায় পড়ে গোঙাচ্ছিল।

‘কোনো ভয় নেই। ভেতরে এসো। আমাকে অনুসরণ কর।’ সমরসেন বলল। সিংহশাবকটি গোঙাতে গোঙাতে গুহার আরও ভেতরে চলে গেল। সমরসেন এবং তার সৈনিকরা সেখানে বসল।

তখন রাত অনেক হয়েছে। কুম্ভাণ্ড এবং তার সঙ্গীরা তখনও গোটা অঞ্চলে সমরসেনকে খোঁজাখুঁজি করছিল। মাঝে মাঝে দূর থেকে ওদের গলা ভেসে আসছিল। ওদের আওয়াজ পেয়ে গুহার মুখে যে আগুন ধরানো হয়েছিল সেই আগুন নিভিয়ে দেওয়া হল। গুহার ভেতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার ছিল। তিরের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত সিংহ মরেছে কি না সন্দেহ। সিংহশাবকটির গোঙানি

তখনও শোনা যাচ্ছিল। সমরসেন ভাবল, হয়তো নিজের সন্তানকে দেখার জন্য আহত সিংহ আবার আসতে পারে। তারজন্য প্রস্তুতি দরকার। কুম্ভাণ্ড যদি আসে তাহলে কীভাবে তাকে মোকাবিলা করতে হবে তাও সে ভাবছিল।

শুধু যে সমরসেন এইসব কথা ভাবছিল তাই নয়, তার সৈনিকদের মনেও এই প্রশ্নগুলো জেগেছিল। হঠাৎ সমরসেনের মনে একটা প্রশ্ন জাগল। যদি কুম্ভাণ্ড টের পায় যে ওরা ওই গুহার ভেতরে আছে, সে যদি একটা মস্তবড়ো পাথর গুহার মুখে রেখে দেয় তাহলে তো গুহার ভেতরে না খেতে পেয়ে অসহায় অবস্থায় মরে যেতে হবে।
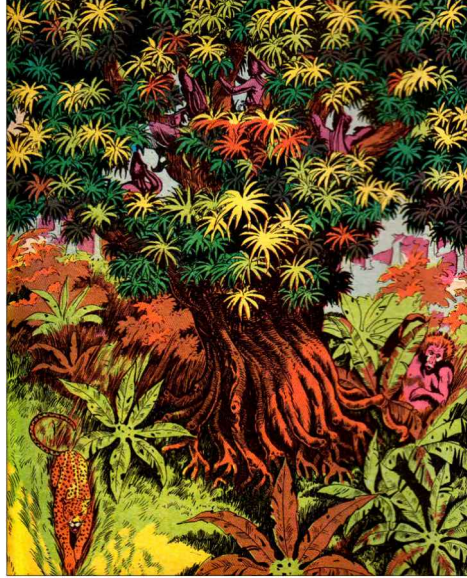
এদিকে রাত গভীর হওয়ায় সৈনিকরা ক্লান্ত হয়ে ঘুমে ঢলে পড়ছিল। সঙ্গীদের এই অবস্থা দেখে সমরসেন ওদের বলল, ‘দেখ, আমরা এই গুহার ভেতরে নিশ্চিন্তে বসে আছি। আমাদের কারও ঘুম পাচ্ছে। এত গভীর রাত্রে ঘুম পাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে এখনও কুম্ভাণ্ড আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে আমি ওদের গলা পাচ্ছি। ভয়ে ভয়ে গুহার ভেতরে থাকার চেয়ে সবাই মিলে যদি গুহার বাইরে থাকি, গাছের ওপরে যদি ঘাপটি মেরে বসে থাকি তাহলে ভালো হয়। আপাতত তোমরা সবাই যাও।’

সৈনিকরা গাছের ওপরে উঠে পড়ল। এই ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যে সমরসেনের মনে হল কাছাকাছি কেউ কথা বলছে। যারা কথা বলছে তাদের মধ্যে কেউ যে সৈনিক নয় সে ব্যাপারে সমরসেন নিশ্চিত। তার মনে হল কুম্ভাণ্ডের অনুচররাই ধারে-কাছে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে।

সমরসেন ভাবল, তাহলে কি গুহার ভেতরে কোনো সুড়ঙ্গ পথ আছে! পাহাড়ের গুহার ভেতরে যে অন্য দিক থেকে ঢোকার পথ থাকে তা সমরসেনের জানা ছিল না। প্রবল কৌতূহল জাগল মনে। সে আস্তে আস্তে পেছনের দিকে কোনো গুহা আছে কি না তা খোঁজার চেষ্টা করল। সেই অন্ধকারে হাতড়ে

হাতড়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ একটা পেরেকের মতো তার হাতে কী যেন ঠেকল। পেরেকটাকে নাড়াচাড়া করতেই দরজার মতো কী যেন সরে গেল। সরে যেতেই সেখান থেকে একফালি আলো গুহার ভেতরে পড়ল। সমরসেন সেখান থেকে লক্ষ করল, যেখান থেকে আলো আসছে সেখানে দুটো লোক দাঁড়িয়ে কথা বলছে। ওদের দেখে মনে হল ওরা স্থানীয় অধিবাসী নয়।

কী যে করবে ভেবে না পেয়ে, সমরসেন ওদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ ওরা সমরসেনকে দেখতে পেল। চোখের পলকে এসে ওরা সমরসেনকে জাপটে ধরল।

বারো

বলিষ্ঠ দু-জন হঠাৎ ধরে ফেলায় সমরসেন আত্মরক্ষার কোনো চেষ্টাই করতে পারল না। সে একটি কথাও বলতে পারল না। এমন সময় গুহার মুখ থেকে ভয়ংকর এক সিংহের গর্জন শোনা গেল। সিংহ গর্জন কানে যেতেই ওই দু-জন সমরসেনকে কাঁধে ফেলে সেখান থেকে ছুটে পালাল।

সমরসেন কিছুই করতে পারল না। শুধু ভালো করে দেখে নিল, কোনদিক থেকে কীভাবে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সে পরিষ্কার বুঝতে পারল লোকগুলো তাকে নিয়ে নামছে। ওরা যে পাহাড়ের চূড়া থেকে নীচের দিকে নামছে সেটা সে সহজেই বুঝতে পারল।

'তোমরা কারা? আমাকে ধরে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?' সমরসেন প্রশ্ন করল। ওর প্রশ্নের জবাবে ওরা কোনো কথাই বলল না।

কিছুক্ষণ পরে সমরসেন ওদের আবার একই প্রশ্ন করল। তখন ওদের মধ্যে একজন বলল, 'তোমার প্রশ্নের জবাব আমাদের নেতা দেবে।'

অনেকক্ষণ পরে ওরা সমরসেনের বাঁধন খুলে ফেলল। সমরসেনকে হাঁটতে বলল। সমরসেন হাঁটতে লাগল। সে যাতে না পালায় তারজন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখল।

কিছুদূর যাওয়ার পর গাছের ওপর থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, 'আমাদের লোক কাকে যেন বন্দি করে আনছে। ওদের জন্য পথ করে দাও।'

এই আওয়াজ নানা কণ্ঠে আরও জোরে উচ্চারিত হল। ওই গম্ভীর পরিবেশে এই ধরনের হাঁকডাক শুনে সমরসেন শুধু যে অবাক হল তাই নয় তার ভয়ও হল।

কিছুক্ষণ পরে ওই দু-জন সমরসেনকে একটি ঘরের দিকে নিয়ে গেল। দরজায় টোকা মারতেই একজন দরজা খুলে দিল। সমরসেনকে ওই ঘরে ঢুকিয়ে তার হাত-পা বেঁধে ওদের মধ্যে একজন তাকে বলল, 'আজকের রাতটা তোমার এইখানেই কাটবে। সকালে তোমার ব্যবস্থা হবে।' বলে দরজা বন্ধ করে চলে গেল।

সমরসেন কী করবে কিছুই ভেবে পেল না। নিরুপায় হয়ে অন্ধকার ঘরে সারারাত কাটাল। মোরোগের ডাক শুনে সে বুঝতে পারল ভোর হয়েছে। আরও কিছুক্ষণ পরে মন্দিরের ঘণ্টা বেজে উঠল। ঘণ্টা বাজার কিছুক্ষণ পর সশব্দে দরজা খুলে গেল। সমরসেন মুখ ঘুরিয়ে দেখল, দুটো নতুন লোক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। ওরা চোখের ইশারায় নিজেদের মধ্যে কোনো কাজের কথা সেরে নিল। তা লক্ষ করে সমরসেন ওদের প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা কিছুক্ষণ আগে যে ঘণ্টা বেজেছিল সেগুলো কি মন্দিরের ঘণ্টা?'

ওই প্রশ্ন শুনে ওদের মধ্যে একজন হাসতে হাসতে বলল, 'ওটা মন্দিরের ঘণ্টা নয়। কাউকে বধ করতে ওই ধরনের ঘণ্টা বাজানো হয়। আমাদের ব্যাঘ্রদত্তের প্রশ্নের জবাব যদি ঠিক ভাবে না দাও তাহলে তোমার আয়ু আজকেই শেষ।'

সমরসেনের মনে প্রশ্ন জাগল, 'এই ব্যাঘ্রদত্ত কে? তার কাছে প্রশ্ন করার কি আছে?' লোকগুলোর হাবভাব দেখে সমরসেনের মনে হল এইসব প্রশ্ন ওদের করে কোনো লাভ হবে না।

ওরা সমরসেনের হাতে-পায়ে বাঁধা দড়ি খুলে ফেলল। তারপর তাকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে গেল।

সমরসেন সবিনয়ে প্রশ্ন করল, 'আমাকে তোমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?'

তার ওই প্রশ্ন শুনে লোক দুটো কটমট করে তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বলেছি তো, আমাদের ব্যাঘ্রদত্তের কাছে নিয়ে যাচ্ছি।' বলা তো নয় যেন ধমক দিল।

কিছুদূর হাঁটার পর একটি অট্টালিকায় ওরা পৌঁছাল। সেখানে নানা ধরনের অস্ত্রধারী অনেকগুলো লোক ছিল। হঠাৎ অট্টালিকার একটি দরজা খুলে গেল। সমরসেন লক্ষ করল, একটি উঁচু আসনে একজন বসে আছে। দেখে বুঝতে পারল ওই ব্যাঘ্রদত্ত।

'সমরসেন, আমার নাম ব্যাঘ্রদত্ত। ব্যাঘ্রমণ্ডলের পক্ষ থেকে তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। সম্ভবত তোমার পূর্বপুরুষ এবং আমার পূর্বপুরুষ কুণ্ডলিনী দ্বীপের একই নগরে ছিল। ওদের উত্তরপুরুষ হিসেবে আমরা যারা এই তান্ত্রিক দ্বীপে আছি তাদের দেখে তুমি নিশ্চয় অবাক হয়ে গেছ।' ব্যাঘ্রদত্ত বলল।

বন্দি করার পর থেকে এখন পর্যন্ত যেসব ঘটনা ঘটল তার কারণ যে কী তা এখনও সমরসেন বুঝতে পারল না। এমনকী ব্যাঘ্রদত্ত কেন যে নিজের এবং তার পূর্বপুরুষদের কথা তুলল তাও সে বুঝতে পারল না। ব্যাঘ্রদত্তকে কিছু বলা উচিত ভেবে সমরসেন বলল, 'ব্যাঘ্রদত্ত আমার কাছে সব কিছুই অদ্ভুত ঠেকছে। তোমার অনুচররা আমাকে যে কেন ধরে বেঁধে এখানে নিয়ে এল আমি জানি না। আমার জানতে ইচ্ছে করছে তোমরা কবে এই দ্বীপে এসেছিলে? কেন এসেছিলে?'

সমরসেনের প্রশ্ন শুনে ব্যাঘ্রদত্ত কিছুক্ষণ তার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর একটু হেসে বলল, 'সমরসেন, তুমি এমনভাবে প্রশ্ন করছ

যেন এই প্রশ্ন করার পেছনে তোমার কোনো উদ্দেশ্য নেই। চমৎকার অভিনয় করতে পার তো? যাই হোক, তোমার যখন ইচ্ছে করছে আমিও তোমার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। শমন দ্বীপের রাজা শকাই সম্পর্কে তুমি কিছু জানো? সে অনেক দেশ আক্রমণ করেছে। আমাদের দেশও সে আক্রমণ করেছিল। তারপর সে দখল করে নিল আমাদের কুণ্ডলিনী দ্বীপ। আমাদের কয়েক জন

পুরুষকে ক্রীতদাস বানিয়ে এই দ্বীপে এনে রাখতে চাইল। তারপর সে এই দ্বীপ সহ আরও নতুন নতুন দ্বীপ দখল করার উদ্দেশ্যে রওনা দিল জাহাজে করে। এই দ্বীপে কিছুদিন থাকার পর শকাইয়ের কঠিন অসুখ করল। তার মৃত্যুর পর আমাদের যে ক্রীতদাস এই দ্বীপে ছিল তারা এখানেই থেকে গেল। শকাইয়ের দু-জন শিষ্য ছিল। ওই দু-জন শিষ্যকে তুমি ইতিমধ্যেই দেখেছ।'

'হ্যাঁ, দেখেছি।' সমরসেন বলল।

'তাহলে এখন বল, ওই শকাইয়ের ত্রিশূল এখন কোথায় আছে? ওই ত্রিশূলে চণ্ডীদেবী যথেষ্ট শক্তি আরোপ করেছে। এই খবর নিশ্চয় কারও মুখে শুনেছ।' ব্যাঘ্রদত্ত বলল।

ত্রিশূলের কথা কানে যেতেই সমরসেন অবাক হয়ে গেল। ব্যাঘ্রদত্ত শমন দ্বীপের রাজা শকাই সম্পর্কে যা বলল তার কিছুই সমরসেন জানে না। চারচোখো একবার কথা প্রসঙ্গে শাকইয়ের নাম করেছিল। তবে শকাই যে কোনোদিন কুণ্ডলিনী দ্বীপ দখল করেছে এই দ্বীপের চণ্ডীদেবী অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন ত্রিশূল যে তাকে দিয়েছে এসব তার জানা ছিল না।

'ব্যাঘ্রদত্ত, তোমার কোনো প্রশ্নেরই জবাব আমি দিতে পারছি না। তুমি হয়তো অনেক কিছু ভেবে আমাকে বন্দি করিয়েছ কিন্তু দুর্ভাগ্য এসব বিষয়ে আমি কিছুই জানি না।' সমরসেন বলল।

সমরসেনের কথায় ব্যাঘ্রদত্ত রেগে গিয়ে বলল, 'তুমি বোকা বোকা ভাব
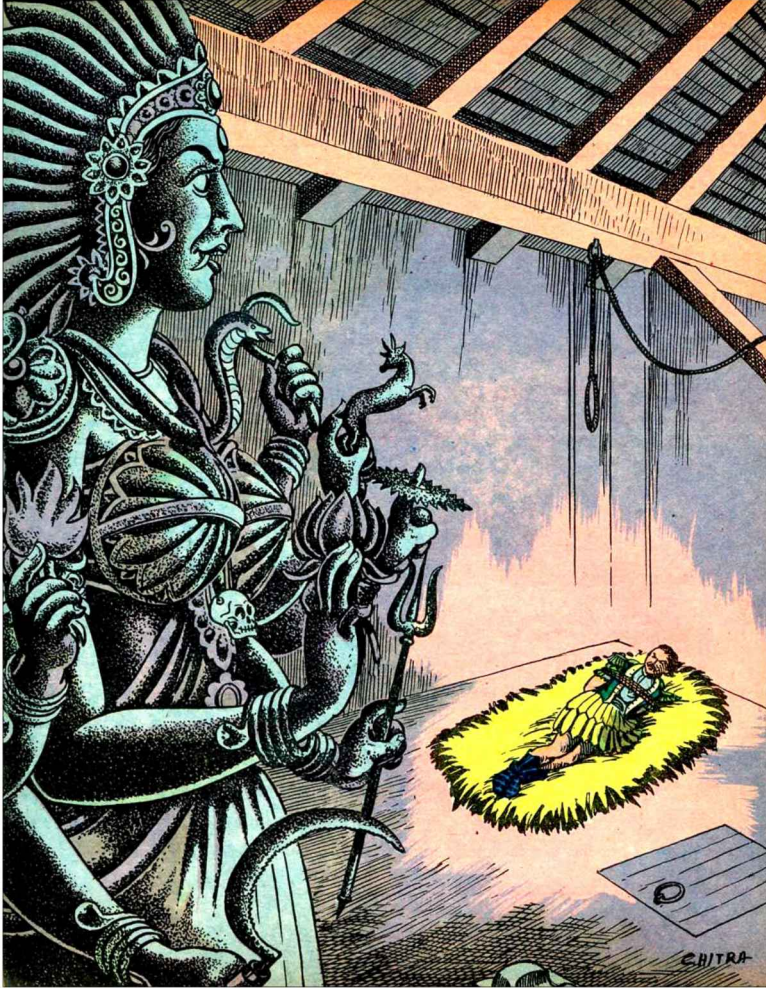
করে আমাকে ঠকাতে পারবে না। আগামীকাল সকাল দশটা পর্যন্ত তোমাকে সময় দিলাম। যদি বাঁচতে চাও তাহলে সকাল দশটার আগেই সত্যকথা বলবে। তোমার ওপরে কঠোর অত্যাচার হবে। তুমি শত আর্তনাদ করলেও তোমাকে কেউ বাঁচাতে আসবে না।'

সমরসেন হতভম্ব হয়ে গেল। যে বিষয়ে সে কিছুই জানে না সে বিষয়ে সে কী বলবে! কিছুক্ষণ পরে ব্যাঘ্রদত্ত রেগে গিয়ে ইশারায় দু-জন লোককে ডাকল। ওরা সমরসেনকে ধরে একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে বন্দি করে রেখে দিল। ওই ঘরে ছিল একটি মূর্তি।

ওই দুটো লোক সমরসেনকে বললে, 'ওই দেখ দেবীমূর্তি। কাল সকাল দশটার মধ্যে তুমি যদি সঠিক জবাব না দাও তাহলে তোমাকে ওই দেবীমূর্তির সামনে বলি দেওয়া হবে।'

বলে ওরা সমরসেনের হাত-পা বেঁধে ফেলে চলে গেল।

সমরসেনের খুব খিদে পেয়েছিল। হাত-পা বেঁধে রাখার ফলে কষ্টও হচ্ছিল খুব। সকাল হলেই তার মৃত্যু অবধারিত সে ব্যাপারে তার কোনো সন্দেহ রইল না। এই ধরনের বিপদ থেকে চারচোখোর মতো তান্ত্রিকই উদ্ধার করতে পারে। কিন্তু চারচোখোর সাহায্য নেওয়া যায় কী করে।

রাত গভীর হল। সমরসেন এই ধরনের কথা ভাবতে ভাবতে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে রইল। শেষ রাত্রের দিকে তার চোখ বুজে আসছিল। এমন সময় কারা যেন দরজা খুলল। সমরসেন মুখ ঘুরিয়ে দেখল, দুটো লোক অস্ত্র হাতে ঘরের ভেতর ঢুকছে। সমরসেন ভাবল, ওরা ব্যাঘ্রদত্তের লোক।

যে দু-জন ঢুকল ওরা সমরসেনের বাঁধন খুলে ফেলল। ওরা কোনো কথা বলছে না। শুধু আপনমনে বাঁধন খুলে যাচ্ছে। ওদের হাবভাব দেখে সমরসেন ভেবে পেল না ওদের কোন প্রশ্নটা করবে। ওরা ইশারায় সমরসেনকে ঘরের বাইরে আসতে বলল। ওদের নির্দেশ অনুসারে সমরসেন ওদের পেছনে হাঁটতে লাগল। কিছুদূর যাওয়ার পর ওরা লক্ষ করল ব্যাঘ্রদত্তের দুটো লোক ওদিকে আসছে। ওদের দেখেই এই দুটো লোক সমরসেনকে নিয়ে অন্ধকারে লুকিয়ে পড়ল।

ওরা সমরসেনকে বলল, 'ভয় পেও না আমরা তোমার বন্ধু। ওই যারা আসছে ওরা এমনভাবে হাঁটছে যেন বেড়াতে বেরিয়েছে। আসলে ওরা ব্যাঘ্রদত্তের লোক। ওরা যদি এদিকে আসে আমরা ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব। আমরা ওদের উচিত শিক্ষা দেব।'

যথাসময়ে ওই দু-জন লোক সেখানে এল। সমরসেনকে নিয়ে যে দু-জন লুকিয়ে ছিল ওরা হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল ওই দু-জনের ওপর। এমনভাবে ওদের গলা টিপে ধরল যাতে ওরা কোনোরকম শব্দ করতে না পারে। এসবের কিছুই

সমরসেন বুঝতে পারছিল না। সমরসেনের চোখের সামনে ওরা ওই দু-জনকে কুয়োতে ফেলে দিল।

গুহার ভেতরে সমরসেন লুকিয়েছিল। ব্যাঘ্রদত্তের সেনারা হঠাৎ তার উপর লাফিয়ে পড়ে, ধরে ব্যাঘ্রদত্তের কাছে নিয়ে যায়। তাকে দেখেই ব্যাঘ্রদত্ত তাকে শকাই ও তার ত্রিশূলের সম্পর্কে প্রশ্ন করল। কোনো বিষয়েই কিছু জানে না বলে সমরসেন জানাল। ব্যাঘ্রদত্ত সমরসেনকে মেরে ফেলবে ঠিক করল। কিন্তু সেইদিন রাত্রে হঠাৎ অচেনা দুটো লোক এসে সমরসেনকে মুক্ত করল।

সমরসেনকে যে দু-জন মুক্ত করল সে তাদের সঙ্গে তাদের পাড়ায় যাচ্ছিল। সেখানে কীসের যেন গোলামাল ছিল। ব্যাঘ্রদত্তের লোক ওই পাড়ার ঘরবাড়ি সব পুড়িয়ে দিচ্ছিল। পাড়ার লোক সব ভয়ে ছুটোছুটি করছিল। কেউ গেল পাহাড়ে, কেউ গেল গাছের আড়ালে।

'শিবদত্ত কোথায়? কে জানো বল?' যারা চোখের সামনে পড়ল তাদেরই ব্যাঘ্রদত্তের লোক প্রশ্ন করতে লাগল। যাকে ধরে সেই বলে, 'আমি জানি না।' যারা জানি না বলে তাদের উপর আরও অত্যাচার করতে লাগল।

বেশ কিছুদূর থেকে সমরসেন ও তার সঙ্গে যারা ছিল তাদের চোখে পড়ল ওই ভয়ংকর দৃশ্য। ওরা তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে না গিয়ে আড়াল থেকে সব কিছু লক্ষ করতে লাগল।

'ওরা যে শিবদত্তকে খুঁজছে সে হচ্ছে আমাদের নেতা। তারই নির্দেশে আমরা আপনাকে মুক্ত করেছি। যারা আগুন লাগিয়ে অত্যাচার চালাচ্ছে, তারা হচ্ছে ব্যাঘ্রদত্তের লোক।' একজন সঙ্গী বলল।

তারপর সমরসেন সহ ওরা তিন জন পাহাড়ের পাশ দিয়ে এগোতে লাগল। সেসময় পূর্ব দিগন্ত আলোকিত করে সূর্য উঠল। সকাল নাগাদ ওরা একটি ছোট্ট পল্লিতে পৌঁছাল।

তেরো

ওই দু-জন লোক সমরসেনকে নিয়ে নিজেদের আস্তানায় যাচ্ছিল। অদূর থেকে সমরসেন দেখল কিছু ঘরবাড়ি পুড়ছে, চারদিকে আর্তনাদ। ধোঁয়া এবং আগুনের আড়ালে আকাশ ঢাকা পড়েছে। চারদিকে লোক ছোটাছুটি করছিল। ওই সময় ওরা যে কে কাকে কী বলছে কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। ছুটে গেল কেউ পাহাড়ের ওপরে, কেউ-বা গাছে।

ব্যাঘ্রদত্তের লোক হাতের কাছে যাকে পেল তাকেই ধরে জিজ্ঞেস করল শিবদত্তের খোঁজখবর।

গোটা গ্রামের লোককে জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও কেউ স্বীকার করল না যে তারা শিবদত্তের খবর জানে।

যে লোকটার সম্পর্কে ব্যাঘ্রদত্তের লোক এত জনকে ধরে প্রশ্ন করছে সেই শিবদত্ত সম্পর্কে সমরসেনের মনে প্রশ্ন জাগল। সে ভাবল, 'শিবদত্তের কী এমন ক্ষমতা আছে যে ব্যাঘ্রদত্তের লোক তন্নতন্ন করে লোকটাকে খুঁজছে। সাধারণ লোক যা করে তা-ই যদি শিবদত্ত করত তাহলে নিশ্চয় ব্যাঘ্রদত্তের লোক তাকে অত করে খুঁজত না।' মনের প্রশ্ন মনে বেশিক্ষণ চেপে রাখতে পারল না। যে দু-জন সমরসেনকে উদ্ধার করে এনেছিল তাদের মধ্যে একজনকে প্রশ্ন করবে ভাবল।

মনের প্রশ্ন মনে চেপে রেখে সমরসেন তাকে মুক্ত করা দুই সৈনিককে প্রশ্ন করল, 'তাহলে এখন আমরা কী করব? সৈনিক দু-জন কী জবাব দেবে ভেবে পেল না। ওরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে জবাব খুঁজতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ ভেবে ওদের মধ্যে এক সৈনিক বলল, 'ব্যাপার হচ্ছে কি জানেন, শিবদত্ত বলেছিলেন, আপনাকে মুক্ত করে এখানে আনতে। আমরা এনেছি। খুব সম্ভব উনি আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চান। তবে উনি যে এই অঞ্চলে আছেন সেটা ব্যাঘ্রদত্তের জেনে যাওয়া বড়ো আশ্চর্যের। ওকে খুঁজে বার করার জন্যই এই অঞ্চলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। আমার ধারণা এ-রকম বিপদের কথা টের পেয়ে শিবদত্ত আগেভাগে কোথাও চলে গেছেন।'

এই কথার পর সমরসেন এবং ওই দু-জন সৈনিক পরিষ্কার বুঝতে পারল, শিবদত্তের সঙ্গে দেখা না হলে ওরা নতুন বিপদে পড়তে পারে। ঠিক সেই মুহূর্তে দূর থেকে একটা ক্ষীণ আওয়াজ শুনতে পেল। যেদিক থেকে আওয়াজ আসছিল তিন জনেই সেইদিকে তাকাল। ওরা দেখতে পেল অদূরের একটি গাছের ডাল থেকে একটা লোক ইশারা করে ডাকছে।

ওই লোকটার ইশারা দেখে সমরসেন ভাবতে লাগল, 'লোকটা কি শত্রু

না বন্ধু! যেই হোক আমি এখানে নতুন। আমার এই সৈনিকরা যা বলবে আমি তাই করব। এ ছাড়া আমার কিছু করার নেই।'

ওই দু-জন সৈনিকের মধ্যে একজন ডালে বসা লোকটার উদ্দেশ্যে একটা ইশারা করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে তার ইশারার পালটা সংকেত পেল।

এই সংকেত পেয়ে সৈনিকটি বলল, 'ওই লোকটা আমাদের বন্ধু। আমাদের সংকেত সে বুঝতে পেরেছে। এবং বুঝতে পেরেছে বলেই আমি নিশ্চিত যে ও আমাদের বন্ধু। আমার সংকেত শিবদত্তের লোক ছাড়া আর কেউ জানে না। এখন চলুন, সেদিকে যাওয়া যাক।'

ডালে বসা লোকটার দিকে সমরসেন ও ওই দু-জন সৈনিক যাওয়ার সঙ্গেসঙ্গে সে গাছ থেকে নামল।

লোকটা একবার চারদিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য শিবদত্ত আমাকে পাঠিয়েছে। আজ ভোরে ব্যাঘ্রদত্তের লোক এই অঞ্চলে আগুন ধরিয়েছে। গোটা গ্রাম পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ঘটনার আগে জানতে পেরে শিবদত্ত নিজের অনুচরদের নিয়ে অন্যত্র চলে গেছেন।'

ওর কথা শুনে সমরসেন সহ সকলের ধড়ে প্রাণ ফিরে এল। কিন্তু সকলের মনে এক প্রশ্ন, 'কীভাবে শিবদত্তের সঙ্গে দেখা করা যায়। শিবদত্ত কোথায় আছে?' মনের কথা চেপে না রেখে তাদের মধ্যে একজন লোকটাকে বলল, 'ইনি হলেন সমরসেন। ব্যাঘ্রদত্তের কারাগার থেকে মুক্ত করে এনেছি। যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি এর সঙ্গে শিবদত্তের দেখা হওয়া দরকার। এখন শিবদত্ত কোথায়?'

ওই লোকটা বলল, 'উনি যে কোথায় আছেন, আমাকে বলেননি। তবে এই মানচিত্র আঁকা কাগজ আমার হাতে দিয়েছেন। এটা দেখে নাকি যে বোঝার সে বুঝে নেবে উনি কোথায় আছেন। এটা তুমি ভালো করে দেখ।' বলে গোল করে পাকানো কাগজটা সমরসেনের হাতে তুলে দিল।

সমরসেন ওই কাগজ হাতে নিয়ে অবাক হয়ে গেল। কেন যে কাগজটা ওর হাতে দিল তা বুঝতে পারল না। সেই মানচিত্রে একটি বন, কিছু গুহা, কূপ, পুকুর প্রভৃতি আঁকা আছে। প্রত্যেকটির নীচে নামও লেখা আছে। কিন্তু শিবদত্ত যে কোথায় আছে তার কোনো চিহ্ন ওই মানচিত্রে নেই।

অনেক্ষণ ভেবে সমরসেন বলল, 'আমার ধারণা শিবদত্ত বন, পাহাড়, পেরিয়ে কোথাও চলে গেছে। আমার মনে হয় গুহা, পুকুর এবং কুয়োগুলো ভালো করে দেখা দরকার।'

সমরসেনের কথায় সকলে রাজি হল। ঠিক কোন দিন থেকে রওনা হওয়া উচিত এবং কোন পথে যাওয়া উচিত তা ঠিক করার ভার পড়ল সমরসেনের ওপর। সমরসেন এই মানচিত্র ধরে এগিয়ে গেল। এগোতে এগোতে পুড়তে থাকা গ্রামের ভেতরেই ঢুকল। লক্ষ করল, ব্যাঘ্রদত্তের লোক হইচই করতে করতে লম্ফঝম্ফ করছে।

ওদের আচরণ দেখে সমরসেনের ভীষণ রাগ হল। ইচ্ছে হল ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের উচিত শিক্ষা দেয়। পরক্ষণেই সমরসেনের মনে হল তড়িঘড়ি করে কিছু করার নেই। শিবদত্তের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর সে যা বলবে তাই করা উচিত।

এই দ্বীপে একমাত্র শিবদত্তই তাকে বন্ধু হিসেবে পেতে চায়। এই চাওয়ার পেছনে কোনো গূঢ় রহস্য থাকতে পারে, স্বার্থ থাকতে পারে। অথবা নিজের কোনো খেয়াল বা ইচ্ছা পূরণের জন্য সে এই উপকার করতে পারে।

কোনো মানুষকে ঠিকভাবে যাচাই না করে সন্দেহ করা উচিত নয়। কিন্তু আজকে যে অপরিচিত, আলাপের মধ্যে দিয়ে পারস্পরিক আদানপ্রদান ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে সেই সম্পর্কই নিকটতর হয়। এই ভাবেই এক মানুষ অন্য মানুষকে চেনে। চেনাজানার মাধ্যমে গভীরতা বাড়ে। কে বলতে পারে যে শিবদত্ত আজকে তার বন্ধুত্ব চায় সেই শিবদত্ত আগামীকাল তার চরম শত্রু হবে না। আবার যে এই দ্বীপে উপকার করতে এগিয়ে আসে তাকে অহেতুক অন্যভাবে সন্দেহ করাও ঠিক নয়।

এই ধরনের কথা ভাবতে ভাবতে আবার ওই মানচিত্র খুলে নতুন কোনো চিহ্ন খোঁজার চেষ্টা করল। নতুন কিছু আবিষ্কৃত হল না। এখন যতদূর এগোতে হবে খুব সাবধানে এগোতে হবে।

কিছুদূর যাওয়ার পর ওদের সামনে পড়ল পাহাড়। পর পর অনেকগুলো ছোটো ছোটো পাহাড়। কোথাও মানুষের কোনো চিহ্ন নেই। মানুষের পায়ে হাঁটা পথেরও কোনো চিহ্ন নেই। একটি পাহাড়ের ওপর উঠে সমরসেন নীচের দিকে তাকাল। সেখান থেকে দেখতে পেল, নীচে একটা পথ ঘুরে ঘুরে কোথাও চলে গেছে। আবার পাহাড়ের ওপর থেকে নীচে নেমে মানচিত্র খুলে বার বার, কোনোকিছু নজর পড়ে কি না খুঁজতে লাগল। একটা সরু পথ গেছে একটি ঘরের দিকে। সেই ঘরের চারদিকে ঘন বন। কিছুদূর যাওয়ার পর ওরা বুঝতে পারছিল ওরা ক্রমশ বন্ধুর পথে পা বাড়াচ্ছে। সেই পথ ধরে এগোতে না এগোতেই অদ্ভুত একটা দৃশ্য তাদের চোখের সামনে পড়ল।

এক উঁচু পাহাড় থেকে ঝরনাধারা নীচে পড়ছিল। ঠিক যে জায়গা থেকে জল বেরিয়ে আসছিল সেই জায়গাটা যেন একটা বাঘের মুখ। আর একটু এগিয়ে লক্ষ করল, বাঘ নয়, মুখটা রাক্ষসের। রাক্ষসের মুখ থেকে জল ঝরে পড়ার দৃশ্য আরও ভয়ংকর দেখাচ্ছিল।

ওই রাক্ষসের মুখ দেখে সমরসেন অবাক হয়ে গেল। ওইরকম একটা ভয়ংকর দ্বীপে কে বা কারা যে দিনের পর দিন পাথর কেটে কেটে অমন ভয়ংকর সুন্দর রাক্ষসের মুখ খোদাই করেছে তা জানতে ইচ্ছে করে। যেকোনো খোদাই করা কাজ যেকোনো শিল্পকর্ম, তা সে একজন সৃষ্টি করুক অথবা একাধিকজন তার মূলে একটি সংস্কৃতি ভিত্তি থাকে। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে এই দ্বীপকে মনে হয় অশিক্ষিত, অসভ্য, আদিবাসীদের দ্বীপ। কিন্তু এই শিল্পকর্ম দেখে রাক্ষসের চোখ-মুখ প্রভৃতি যেভাবে খোদাই করা হয়েছে তা দেখে পরিষ্কার বোঝা যায় এখানে একটি গোষ্ঠী আছে অথবা ছিল যারা পারত এই ধরনের শিল্পকর্ম সৃষ্টি করতে।

‘এ তো বড়ো বিচিত্র দৃশ্য। আশেপাশে কোথাও মানুষ নেই। অথচ ওই রাক্ষসের মুখ দেখে মনে হচ্ছে কোনো-না-কোনো মানুষ পাথর কেটে ওটা তৈরি করেছে।’ বলতে বলতে অবাক দৃষ্টি মেলে সমরসেন ওই দিকে তাকিয়ে রইল। তার সঙ্গে যারা ছিল তাদের মুখে কোনো কথা ছিল না। আরও কাছে গিয়ে সমরসেন লক্ষ করল, যেখান থেকে জল আসছে তার পাশ দিয়ে যেন একটি সুড়ঙ্গের পথ করা আছে। কোনো লোকের সন্দেহ হবে না যে ওই জলধারার পাশ দিয়ে একটা পথ থাকতে পারে।

সমরসেন আর একবার ওই মানচিত্র খুলে দেখল, এখন ওই জলধারা দেখে মানচিত্রে ওই ধরনের কিছু আছে কি না খুঁজল। এতক্ষণ মনে মনে যা অনুমান করেছিল এখন সে ওই মানচিত্রে তা লক্ষ করল। মনে সাহস

সঞ্চয় করে সমরসেন ওই সুড়ঙ্গ পথে পা বাড়াল। অচেনা পথ, অজানা সুড়ঙ্গ, এতে যে কী আছে, কীসের সঙ্গে এর যোগাযোগ জানা নেই তবু এগিয়ে যেতে হল।

সুড়ঙ্গের ভেতরে যেন চাপ চাপ অন্ধকার। অনেক কষ্টে কিছুদূর এগোনোর পর সরু আলোর রেখা চোখে পড়ল। সেই রেখার আশেপাশে মনে হল অসংখ্য ছোটো-বড়ো পাহাড় আছে। আর কিছুদূর এগোনোর পর হঠাৎ ওরা সুড়ঙ্গের বাইরে এসে গেল। সেখানে রয়েছে অনেক ময়ূর। কোনো কোনো ময়ূর সেখানে নাচছিল আবার কোনো কোনোটা ঘোরাঘুরি করছিল।

‘এতগুলো ময়ূর আমি কোনোদিন একসঙ্গে দেখিনি।’ এই অপরূপ দৃশ্য দেখে সমরসেন কিছু বললেও অন্যেরা কিন্তু সেই দৃশ্য চুপচাপ অবলোকন করছিল।

বেশ কিছুক্ষণ ময়ূরনাচ দেখার পর হঠাৎ ওরা হাতির ডাক শুনতে পেল। সকলের মনে এক প্রশ্ন, ‘কোন দিকে পালাব।’

খুব কাছ থেকে যার ডাক ওরা শুনতে পেল সেই হাতি গুহা থেকে বেরিয়ে আসছিল। তাকে দেখেই যে যেদিকে পারল সরে গেল। সমরসেন গেল একটা পাহাড়ের আড়ালে। সমরসেন হাতিকে দেখে বুঝল হাতিটা কোনো বিপদে পড়ে হঠাৎ সেখানে এসে গেছে। পরক্ষণেই তার মনে প্রশ্ন জাগল, ‘হাতিকে ভয় পাইয়ে দেওয়ার মতো জন্তু এখানে আর কী থাকতে পারে। সে ভাবল, তাহলে কি আমি ঠিক ঠিক ভাবে মানচিত্রকে বুঝতে পারিনি।’

চোদ্দো

সমরসেন এক বড়ো পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে হাতির দিকে তাকাচ্ছিল। পরক্ষণেই তার মৃত্যু ঘটবে কি না সে জানে না। এদিকে তার সঙ্গীরা ভেবেছিল হয়তো হাতিগুলো সমর সেনকে মাড়িয়ে চলে যাচ্ছে। ওরা না পারছে এগোতে না পারছে পেছতে। সেখান থেকে পালানো অত সহজ নয়।

ঠিক এইসময় সমরসেনের সঙ্গে যারা ছিল তারা এবং সমরসেন একসঙ্গে দু-তিন জনের আর্তনাদ শুনতে পেল। আর্তনাদ শুনতে পেয়েও কারও কিছু করার ছিল না। পাথরের আড়াল থেকে বাইরে আসার সাধ্য ছিল না ওদের। হাতির ডাক শুনে সমরসেন এবং তার অনুচররা ভয় পেয়ে আরও নিরাপদ জায়গায় লুকোনোর চেষ্টা করল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা শুনতে পেল প্রস্রবনের আওয়াজ। আর ওরা শুনতে পাচ্ছিল মানুষের আর্তনাদ।

একজন বলল, 'নিশ্চয় কেউ ভয়ংকর কোনো বিপদে পড়েছে।'

'সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু হাতিটা ওইদিক থেকে অত দ্রুত এল কী করে? এমনও তো হতে পারে শত্রু আমাদের দিকে তাড়া করেছে অথবা আমাদের ফাঁদে ফেলার জন্য কোনো লোক আর্তনাদ করছে।' সমরসেন এ-ধরনের কথা বলছিল। তার কথা শেষ হতে-না-হতেই অদূর থেকে কয়েক জনের কোলাহল শোনা গেল।

সমরসেন ভাবল এখানে বেশিক্ষণ চুপচাপ বসে থাকা ঠিক নয়। গুহার ওদিকে শত্রুই থাক আর মিত্রই থাক, নিশ্চয় ওরা বিপদে পড়েছে। তাই ধীরস্থিরভাবে, সাবধানে এগিয়ে কারণটা জানা দরকার।

সমরসেন নিজের লোকেদের অনুসরণ করতে বলে গুহার ভেতর অনেকখানি এগিয়ে গেল। কিছুদূর যাওয়ার পর সমরসেন পরিষ্কার বুঝতে পারল যে এই গুহা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সামনেও একটা পথ আছে। আরও কিছুদূর যাওয়ার পর সমরসেন লক্ষ করল, তিনটে লোক জলে বন্দি অবস্থায় আটকে আছে। দূর থেকে বোঝা যাচ্ছে না ওদের কীভাবে আটকে রেখেছে। তিন তিন জনকে যারা আটকে রেখেছে তারা যে ওই ধরনের তিন জনের চেয়ে বলশালী এবং বিশেষ উদ্দেশ্যে যে ওই তিন জনকে আটকে রাখা হয়েছে সেটা ভাববার বিষয়। সমরসেন ভাবতে লাগল, কীভাবে ওই তিন জনকে উদ্ধার করা যায়। সেই মুহূর্তে ওই তিন জনকে মুক্ত করা যায় কিন্তু মুক্ত করার পর নতুন কোনো বিপদে পড়ে যাবে কি না, সংকট আরও বাড়বে কি না, সেটাই সমরসেন বার বার ভাবতে লাগল। যেদিকে তাকায় কাকপক্ষীও তারা দেখতে পেল না। এদিকে সমরসেন ভাবছিল আর অন্য তিন জন আরও বেশি করে আর্তনাদ করছিল। যে লোকটা জলে বাঁধা অবস্থায় আছে তাকে উদ্ধার করতে হলে সমরসেনকে নামতে হবে জলে। সেখানে যেতে হলে জলের গভীরতা যে কত, মাঝপথে বিপদের কোনো আশঙ্কা আছে কি না তা কেউ জানে না।

সমরসেন নিজের অস্ত্র ঠিকভাবে ধরে জলে নামল। তার নামার সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গীসাথীরাও তাকে অনুসরণ করল। কিছুদূর যাওয়ার পর কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার মতো আর্তনাদ করে উঠল তিন জন। পরক্ষণেই জলে ঢেউ খেলে গেল। পরিষ্কার বোঝা গেল তলা দিয়ে কিছু-একটা ঘটে যাচ্ছে।

সমরসেন অবাক হয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল। একটা কুমির হাঁ করে ওই লোকটার দিকে ধেয়ে আসছিল। পরক্ষণেই বুঝতে পারল জলবন্দি লোকটার আর্তনাদের কারণ। তরবারিটিকে খাপে পুরে নিয়ে সমরসেন ধনুকে তির চড়াল। সেই মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করল যে মুহূর্তে তির নিক্ষেপ করলে কুমিরকে মেরে ফেলা যায়। অন্যত্র মারলে তো হবে না। কুমির যখন মুখটা হাঁ করবে ঠিক সেইসময় তার মুখগহ্বরে তিরটাকে বিদ্ধ করতে হবে। একবার যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তাহলে আর ওই কুমিরকে বাগে পাওয়া যাবে না।

সেই মোক্ষম মুহূর্ত এসে গেল। সমরসেনের তির তীব্রগতিতে গিয়ে কুমিরের হাঁ করা মুখে বিদ্ধ হল। চোখের পলকে সমস্ত জল তোলপাড় হল। কিছুক্ষণের জন্য কুমিরটা জলে ডুব দিয়ে আবার জেগে উঠে লোকটার দিকে বড়ো বড়ো চোখ মেলে এগিয়ে আসতে লাগল।

ঠিক সেইসময় তরবারির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে তুলল কুমিরটাকে। এতক্ষণ যারা প্রাণের ভয়ে জলে কাঁপছিল তাদের ধড়ে প্রাণ এল।

দূর থেকে ওদের চেনা চেনা লাগছিল। কাছে এসে সমরসেন ওদের ভালোভাবে চিনতে পারল। ব্যাঘ্রদন্তের লোকের হাতে ধরা না পড়ে এরাই ছিল সমরসেনের সঙ্গে। সমরসেন ভাবতে লাগল, 'শুধু এই তিন জন তো নয়, ছিল আরও এক জন। সে গেল কোথায়?' ওদের আনন্দ আর ধরে না। এতক্ষণ ওরা যাকে হারিয়েছিল সেই নেতাকে ওরা ফিরে পেল। আনন্দে ওরা জোরে বলে উঠল, 'হে সেনাপতি, আপনাকে যে আবার ফিরে পাব তা ভাবতে পারিনি।'

সমরসেন ওদের প্রশ্ন করল, 'তোমরা তিন জন কেন, আর একজন কোথায় গেল?'

আপনার আসার আগে আমদের ওই সঙ্গীকে কুমিরে নিয়ে গেছে। আপনি না এলে আমাদেরও ওই কুমিরের পেটে যেতে হত।' অন্য এক সৈনিক বলল।

'কিন্তু আমার প্রশ্ন হল, তোমাদের থামের সঙ্গে কে বাঁধল?' সমরসেন প্রশ্ন করল।

যা ঘটেছে তা সৈনিকরা সংক্ষেপে জানাল। ওরা নাকি সমরসেনকে খুঁজতে খুঁজতে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে পড়ে এগোতে এগোতে একটা গুহায় ঢুকেছিল। সেই গুহায় ছিল একটা ছোট্ট পথ। মনে হচ্ছিল ওই পথই সুড়ঙ্গ পথ। কিছুদূর এগোনোর পর ব্যাঘ্র্যদন্তের লোক ওদের বন্দি করে এখানে বেঁধে রেখেছে।

'ওরা আমাদের বেঁধে রেখে চলে গেছে। খুব বেশি আগে নয়। এখনও দ্রুত এগিয়ে গাছের ডালে উঠে চারদিকে তাকালে হয়তো ওদের দেখতে পাওয়া যাবে।' সৈনিকরা বলল।

তারপর সবাই ব্যাঘ্রদত্তের লোক কোথায় আছে, কতদূর গেছে তা ঘুরে ঘুরে এমনভাবে খোঁজ করতে লাগল যাতে ধারে-কাছে থাকলেও ওদের নজরে না পড়তে হয়। যা অনুমান করেছিল তাই হল। ওদের নাগাল পাওয়া গেল। ব্যাঘ্রদত্তকে দেখেই সমরসেন দাঁতে দাঁত ঘষল। সঙ্গেসঙ্গে এও বুঝতে পারল নিজের ওই ক-টা সৈনিক দিয়ে ব্যাঘ্রদত্তকে জব্দ করা সম্ভব নয়। তাকে জব্দ করতে হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন শিবদত্তের সঙ্গে জোট বাঁধা। শিবদত্ত এবং সমরসেন ঐক্যবদ্ধ হলে ব্যাঘ্রদত্তের দাপট ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া সম্ভব।

সমরসেন এই ধরনের কথা ভাবছিল এমনসময় তার এক সৈনিক কাছের এক গাছের ডালের দিকে তাকাতে ইশারা করল। সমরসেন লক্ষ করল গাছের ডাল থেকে একটা কাগজ ঝুলছে। সে হাত বাড়িয়ে ওই কাগজটাকে নিয়ে ভাঁজ খুলে পড়তে লাগল। তাতে লেখা ছিল:

'দ্বীপের এই অংশ অত্যন্ত ভয়ংকর। এখানে বেশিক্ষণ থাকা উচিত নয়।'

সমরসেন পরিষ্কার বুঝতে পারল এসব শিবদত্তেরই নির্দেশ। চিঠিতে যে ধরনের আঁকাবাঁকা লেখা রয়েছে তাতে পরিষ্কার বোঝা যায় চিঠিটা তড়িৎ গতিতে লেখা হয়েছে। তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে সরে পড়া উচিত বলে মনে হল সমরসেনের। সমরসেন যে পথে এসেছিল সেই পথেই ঘুরে যাওয়ার জন্য ফিরে দাঁড়াতেই তার এক সৈনিক কাছের একটি গুহা তাকে দেখিয়ে

বলল, 'এই গুহার ভেতরে যেভাবে পথটা গেছে তাতে মনে হয় এই পথে অনেকেরই যাতায়াত আছে।'

সমরসেন ওই পথে গজিয়ে ওঠা ছোটো ছোটো ঘাস এবং পাথরের টুকরো দেখে ভাবল সৈনিকের কথাই ঠিক। পরক্ষণেই মনে হল শিবদত্ত হয়তো ওই পথেই চলে গেছে।

সমরসেন গুহার কাছে গেল। উঁকি মেরে গুহার ভেতরটা যতটা দেখা যায় ততটা দেখল। গুহার ভেতরে অন্ধকার। একজন সৈনিক মশাল ধরাল। ওই আলোতে কিছুপথ দেখা গেল। ওরা গুহার ভেতরে এগোতে লাগল। গুহার ভেতরে কিছুদূর যাওয়ার পর যা নজরে পড়ল তাতে ওরা রীতিমতো বিস্মিত হল। এক জায়গায় পাথরের সিংহাসন রয়েছে। খোদাই করা সিংহাসন। সিংহাসনের গায়ে অনেকগুলো মূর্তি। সেইসব মূর্তিগুলোর হাতে যে ধরনের অস্ত্রগুলো রয়েছে তাতে পরিষ্কার বোঝা যায় ওরা আদিবাসী। সমরসেন কিছুক্ষণ ওইসব দেখে বলল, 'খোদাই করা মূর্তিগুলোর হাতে যে ধরনের অস্ত্র রয়েছে, যে ভঙ্গিতে মূর্তিগুলো আছে তা দেখে আমার মনে হচ্ছে, আদিবাসীদের নেতার সমাধিস্থল হল এটা। একচোখোকে দেখে একসময় ভীষণ ভয় করেছিল। এখন এই জায়গাটা দেখে রীতিমতো গা ছমছম করছে। এর আগে কখনোও আমার এটা মনে হয়নি। এখানে যা-কিছু দেখছি সবই ভয়ংকর।'

সমরসেনের মুখে এই ধরনের কথা শুনে স্বাভাবিক ভাবেই তার সৈনিকদের মনে আরও বেশি করে ভয় ঢুকল। ওরা পরস্পরের মুখের দিকে এমনভাবে তাকাতে লাগল যেন ওরা অসহায় বোধ করছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সৈনিকদের চোখ-মুখের অবস্থা দেখে সমরসেন বুঝতে পারল সে যা বলেছে তা তার বলা উচিত হয়নি। কোনো সেনাপতির এমন কথা কখনোই উচ্চারণ করা উচিত নয় যে-কথা শুনে সৈনিকরা ভীষণ ঘাবড়ে যায়।

তারপর সমরসেন সৈনিকদের এমন কিছু কথা বলল যাতে ওদের মনোবল ফিরে আসে। হঠাৎ সে ওদের ইশারায় ডেকে গুহার ভেতরে এগোতে লাগল। সমরসেনের মনে হল ওই জায়গায় বেশিক্ষণ থাকা তার উচিত নয়। এখন তার প্রথম কাজ হবে শিবদত্তকে খুঁজে বের করা। কোনদিকে যে যাবে, কোনপথে গেলে যে শিবদত্তের খোঁজ পাওয়া যাবে সেই প্রশ্ন সমরসেনের মনে থেকেই গেল। একদিকে একচোখোর হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে হবে, অন্যদিকে সতর্ক থাকতে হবে যাতে কুম্ভাণ্ড ওদের আক্রমণ করতে না পারে। একচোখো এবং চারচোখোর গুরু শকাইয়ের ত্রিশূলে আছে অসীম ক্ষমতা। সেই ত্রিশূল পাওয়া গেলে জগৎ জয় করা যাবে। কিন্তু এই মুহূর্তে যেটা প্রয়োজন তা হল শিবদত্তের সন্ধান করা।
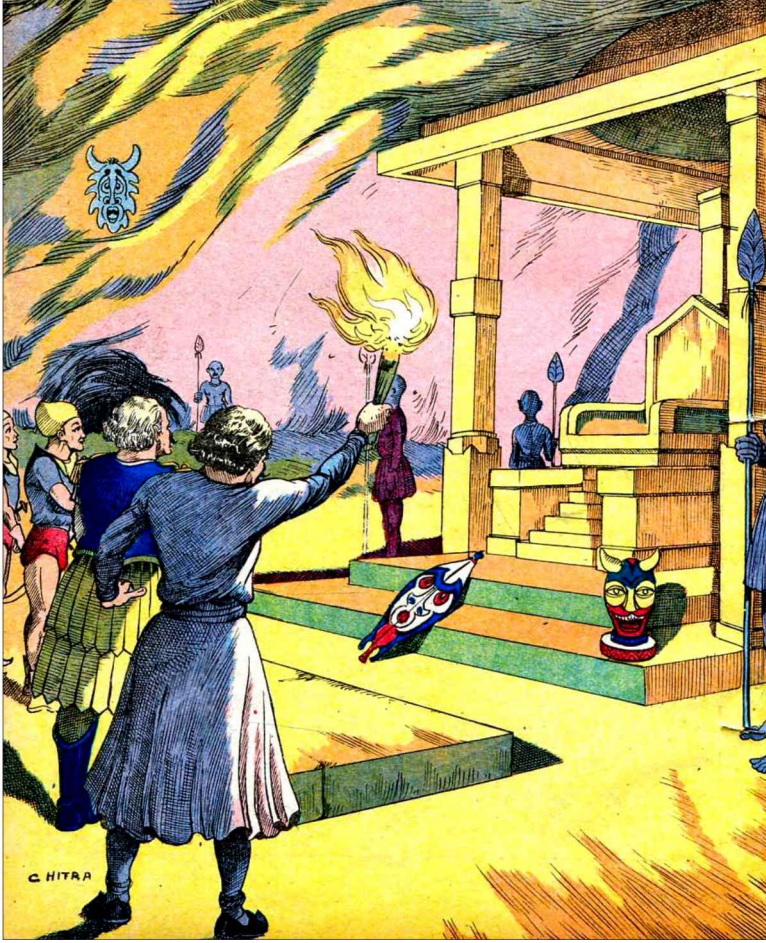
হঠাৎ সমরসেনের মনে প্রশ্ন জাগল, 'আচ্ছা, যে শিবদত্তকে আমি এত খোঁজ করছি, যাকে বন্ধু হিসেবে পাব আশা করছি, সে তো শেষপর্যন্ত আমার শত্রুও হতে পারে। সে যদি আমার শত্রু হয়ে যায় তাহলে এই ভয়ংকর অঞ্চলে আমার এবং আমার সৈনিকদের পরিণতি কী হবে!'

আধডোবা জাহাজে যে ধনরত্ন আছে তা যে নাককন্যা পাহারা দিচ্ছে সেই খবর সবাই জানে। শুধু যে একচোখো এবং চারচোখো ওই সম্পদ পাওয়ার জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা করছে তাই নয়, তলে তলে নিশ্চয় ব্যাঘ্রদত্ত এবং শিবদত্তও চেষ্টা করছে। এই চার চারটে শক্তিশালী লোকের নজর এড়িয়ে জাহাজের সম্পদ পাওয়া কি সহজ!

এই ধরনের কথা সমরসেন ভাবছিল। সমরসেন ভেবেছিল ওই সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ার পর শিবদত্তের সন্ধান পাবে। কিন্তু তা আর হল না। এমন সময় কয়েকটা তির ওদের সামনে পড়ল। 'শত্রু এসে গেছে। পাথরের আড়ালে দাঁড়াও।'

সমরসেন এই নির্দেশ দিয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখল। লক্ষ করল পাহাড়ের ওপর থেকে কয়েক জন তির ছুড়ছে। সমরসেন বুঝতে পারল না ওরা ব্যাঘ্রদত্তের লোক না কুম্ভাণ্ডের?

পনেরো

সমরসেন কিছুক্ষণ পর বুঝতে পারল তার দিকে কে তির নিক্ষেপ করছে। কারণ যারা তির ছুড়ছিল তারা চিৎকার করে ধ্বনি দিচ্ছিল, 'ব্যাঘ্রদত্তের জয়। ব্যাঘ্রমণ্ডলীর জয়।' ওদের চিৎকার ওই অঞ্চলের পাহাড়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল।

'শোনো, ওই যারা তির ছুড়ছে তারা ব্যাঘ্রদত্তের লোক। ওরা ইতিমধ্যে জেনে গেছে আমরা কোথায় আছি। ওরা আমাদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করবে।' এই কথা বলে সমরসেন নিজের সৈনিকদের সতর্ক করে দিল।

ব্যাঘ্রদত্তের লোক ওপর থেকে শুধু তিরই নয়, পাথরও ছুড়ছিল। ওইভাবে ছুড়তে ছুড়তে ওরা সমরসেনের দিকে এগিয়ে আসছিল। এই অবস্থায় সমরসেনের মনে হল ওদের চোখে ধুলো দিয়ে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে হেঁটে সেখান থেকে সরে পড়া বুদ্ধিমানের কাজ। শত্রু যখন অতর্কিতে আক্রমণ করছে তখন কৌশলে সেখান থেকে সরে পড়া যে ভালো তা সমরসেনের জানা আছে। তাই সে কালমাত্র বিলম্ব না করে সেখান থেকে কেটে পড়ার সিদ্ধান্ত নিল। ওরা ক্রমশ সাগরের দিকে এগোল। এগোনোর সময় ওরা জানে না, পাহাড়ের ওপারে ওদের কোন অবস্থায় পড়তে হবে। আপাতত ব্যাঘ্রদত্তের নাগালের বাইরে যাওয়াই প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য। অনেক দূর এগোনোর পর ওরা আর ব্যাঘ্রদত্তের লোকের ধ্বনি

শুনতে পেল না। সমরসেন ভাবল, 'ব্যাঘ্রদত্তের লোক হতাশ হয়ে ফিরে গেছে।' হাঁটতে হাঁটতে ওরা গুহায় ঢুকে সূর্যের ক্ষীণ আলো দেখতে পেল। আরও কিছুদূর হাঁটার পর ওরা গুহার বাইরে এল।

গুহা থেকে বেরোতেই সমরসেনের চোখে যা পড়ল তাতে সে অবাক হয়ে গেল। শিবদত্তের মূর্তি খোদাই করা আছে বিভিন্ন ভবনে। বিরাট বিরাট অট্টালিকা ভেঙে পড়ে আছে। অনেক দেওয়ালে ফাটল ধরেছে। দেখলে মনে হবে ভূমিকম্প অথবা ওই ধরনের কোনো প্রলয়কাণ্ড ঘটে গেছে।

সমরসেনের সামনে যে বাড়িটা ছিল, সমরসেনের ধারণা হল ওই বাড়িতেই শিবদত্ত আছে। তার ধারণা এত দৃঢ়বদ্ধ ছিল যে সে ওই ভবনে ঢুকবে ঠিক করল। তার সৈনিকরাও সেখানকার পরিবেশ দেখে কম অবাক হয়নি।

সমরসেন ওই অট্টালিকায় ঢুকতে যাবে এমন সময় চারদিক কাঁপিয়ে শঙ্খধ্বনি শোনা গেল। পরক্ষণেই পঞ্চাশ-ষাট জন সৈনিক নিয়ে ব্যাঘ্রদত্ত সেদিকে এল।

সমরসেন তার সৈনিকদের আড়ালে দাঁড়াতে বলে ব্যাঘ্রদত্তের দিকে তাকাল। সমরসেনের মনে হল তার কথা ব্যাঘ্রদত্তের মনে নেই।

ব্যাঘ্রদত্ত তার সৈনিকদের সামনে এমনভাবে হাঁটছিল যেন সে বিশ্বজয় করেছে। তার সৈনিকরা মাঝে মাঝে তাকে প্রশংসা করে ধ্বনি দিচ্ছে।

সমরসেন ভাবল, 'ব্যাঘ্রদত্ত নিশ্চয়ই শিবদত্তকে বন্দি করার জন্য এসেছে। ব্যাঘ্রদত্তের লোক কোনো লোককে এখনও পর্যন্ত বন্দি করতে পারেনি। শকাইয়ের ত্রিশূল যে কোথায় আছে ইতিমধ্যে ব্যাঘ্রদত্তের কি জানা হয়ে গেছে?' এই প্রশ্ন জাগল সমরসেনের মনে।

ব্যাঘ্রদত্ত সৈনিকদের নিয়ে ওই পাথরের অট্টালিকার ভেতর ঢুকল। সে সামনে যাচ্ছিল আর তার সৈনিকরা তাকে অনুসরণ করতে লাগল।

ঠিক এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল সমরসেন। একটা ভেঙে পড়া অট্টালিকার থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে সব কিছু লক্ষ করছিল।

যেতে যেতে হঠাৎ থেমে গিয়ে ব্যাঘ্রদত্ত ঘোষণা করল, 'হে ব্যাঘ্রযোদ্ধাগণ, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা আমাদের পরিশ্রমের ফল পাব। আমি আগেই বলেছি, তোমাদের এক-একটা অঞ্চলের অধিপতি করে দেব। তোমরা ওই সামনে ভেঙে-পড়া বাড়িটার ইট পাথর ভেঙে রাস্তা তৈরি কর। আমরা যে অমূল্য বস্তু খুঁজছি সেটা ওই অট্টালিকার মধ্যেই আছে।'

ব্যাঘ্রদত্তের মুখে ওই কথা শুনে তার সৈনিকদের মনে উৎসাহ জাগল। তারপর ওরা ওই অট্টালিকার বিভিন্ন অংশ ভেঙে ফেলার জন্য অগ্রসর হল। সেইসময় ওদের মনে এত বেশি উৎসাহ জেগেছিল যে কী করলে কী পরিণতি হবে তা ওরা ভাবেনি।

সমরসেন অদূরে দাঁড়িয়ে আড়াল থেকে সব কিছু লক্ষ করছিল। অট্টালিকাটি ভাঙার সঙ্গেসঙ্গে অন্য কোনো কিছু ঘটতে পারে এই ধারণা সমরসেনের মনে আগেই ছিল।

ব্যাঘ্রদত্ত নিরাপদ স্থানে দাঁড়িয়ে তার সৈনিকদের উৎসাহ দিচ্ছিল। ব্যাঘ্রদত্ত যেভাবে মাঝে মাঝে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল তা দেখে সমরসেনের মনে হচ্ছিল যে সে যেকোনো মুহূর্তে বিপদের আশঙ্কা করছে।

সমরসেন ভাবল, ব্যাঘ্রদত্ত হয়তো জেনেশুনেই একটা বিপদের ঝুঁকি নিচ্ছে। সমস্ত বাড়িটাকে একসঙ্গে ভাঙতে গিয়ে যা ঘটার তাই ঘটল। হঠাৎ গোটা বাড়িটা ধসে পড়ল। আর ব্যাঘ্রদত্তের বহু লোক মোটা থাম এবং দেওয়ালে চাপা পড়ে মারা গেল। মাত্র কিছু সৈনিক আহত অবস্থায় বেঁচে রইল। এত বড়ো একটা ঘটনা চোখের পলকে ঘটে গেল।

আহত সৈনিকদের নিয়ে ব্যাঘ্রদত্ত দূরে গিয়ে দাঁড়াল। তার কথামতো কাজ করতে গিয়ে এতগুলো সৈনিক যে মারা গেল সে ব্যাপারে তার মনে যেন কোনোরকম দুঃখ জাগেনি।

‘ব্যাঘ্রেশ্বরীর নিশ্চয় কোনো বিপদ ঘটেছে। নিশ্চয় তিনি রুষ্ট হয়েছেন। তা না হলে এতগুলো সৈনিকের বলি হত না। শোনো সৈনিকগণ, যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন সাহস সঞ্চয় কর। আমি বলছি তোমাদের কোনো ভয় নেই।’ বলে ওদের একটি ছবি দেখিয়ে বলল, ‘অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন শকাইয়ের ত্রিশূল সম্পর্কে তোমাদের আগেই বলেছি। ওই ত্রিশূলের প্রভাবে যাদের মৃত্যু ঘটার তাদের মৃত্যু ঘটে গেছে। আমাদের সামনে আর কোনো ভয় নেই। আমরা যারা

বেঁচে আছি, আমরাই দিকে দিকে রাজা হব। এই চিত্রে পরিষ্কার চিহ্নিত আছে ত্রিশূলের স্থান। হাতিদের বনে, বিষবৃক্ষের এক-শো গজ দূরে, মৃত বীরদের সমাধির নীচে, গুরুদ্রোহীর হাড় দিয়ে তৈরি পিঞ্জরে শকাইয়ের ত্রিশূল অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে রাখা আছে।'

আড়াল থেকে কথাগুলো শুনে সমরসেন রীতিমতো ভয় পেল। 'ওই ত্রিশূলের জন্য তান্ত্রিক দ্বীপে কত যুদ্ধ, কত মৃত্যুর ঘটনা ঘটে গেল। আর শেষপর্যন্ত ওই মারাত্মক শক্তিশালী ত্রিশূল ব্যাঘ্রদত্তের হাতে পড়বে।' সমরসেন ভাবল।

ওদের গতিবিধি দেখতে দেখতে সমরসেন চিন্তা করল, 'এখন শিবদত্তের কী হবে? সে এখন কোথায় আছে? ত্রিশূল যে কোথায় আছে তা সে কি

জানে? আমার সঙ্গে আছে মাত্র ছ-জন সৈনিক। এই ছ-জনকে নিয়ে শিবদত্তকে খুঁজেতে বেড়ানো এখন কি নিরাপদ? একবার যদি ওই ত্রিশূল ব্যাঘ্রদত্তের হাতে পড়ে তাহলে তো রক্ষে থাকবে না। মস্তবড়ো তান্ত্রিক একচোখো এবং চারচোখোকে ব্যাঘ্রদত্তের সামনে নতজানু হতে হবে। ওই ত্রিশূল হাতে পেলে আধডোবা জাহাজকেও ব্যাঘ্রদত্ত দখল করতে পারবে। অফুরন্ত সম্পদে ভরা ওই জাহাজটাকে পাহারা দিচ্ছে নাগকন্যা। কিন্তু পরে ওই নাগকন্যা ত্রিশূলের সামনে মাথা নীচু করে হয়তো জাহাজ ছেড়ে চলে যাবে। যে জাহাজটাকে দখল করার জন্য, জাহাজের যে ধনসম্পত্তি পাওয়ার আশায় বহু লোকের জীবন বিপন্ন হয়েছে সেই জাহাজ শেষপর্যন্ত ব্যাঘ্রদত্তের কবলে যাবে? এই ধরনের কথা সমরসেন অকেক্ষণ ভাবল।

'এইসময় একমাত্র চারচোখো ছাড়া আর কারও সাহায্য পাব বলে মনে হয় না। চারচোখো চায় নাগকন্যাকে। তার ধারণা, নাগকন্যার ক্ষমতা অসীম। কিন্তু সে কি জানে ত্রিশূলের ক্ষমতা কত বেশি? একবার ওই ত্রিশূল পাওয়া গেলে শুধু এই দ্বীপ কেন, সারা বিশ্ব দখল করা যায়।'

সমরসেন ভাবতে লাগল, আমার সামনে আছে দু-ধরনের দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্বই হচ্ছে যেকোনো সমস্যার মূল। দ্বন্দ্ব যেমন সমস্যার সমাধান করে তেমনি আবার নতুন সমস্যারও সৃষ্টি করতে পারে। এখন আমার সামনে দ্বন্দ্ব রয়েছে দুটো। এক হচ্ছে শত্রুর সঙ্গে আর এক হচ্ছে আমার নিজের অনুচরদের সঙ্গে। শত্রু যে কে হবে এখনও আমি ঠিক জানি না। শেষপর্যন্ত কোন শত্রুর বিরুদ্ধে যে আমাকে লড়তে হবে তাও আমার জানা নেই। আবার এমনও হতে পারে যাকে এখন শত্রু ভাবছি সে হয়তো কিছুকাল পরে শত্রু থাকবে না। আবার যাকে এখন মিত্র ভাবছি সেও যে ওই ত্রিশূলের লোভে আমার শত্রু হবে না তার কি মানে আছে! যাতে লোভ দানা বাঁধতে না পারে, তাকে যাতে বিপথচালিত করতে না পারে তারজন্য অনেকে লোককথা শুনিয়েছে। মানুষের মনে যাতে সীমাহীন লোভের স্থান না থাকে তারজন্য বিভিন্ন মানুষের গল্প এবং জীবজন্তুর গল্প শুনিয়েছে। কিন্তু লোভ এমন জিনিস, যারা লোভ না করতে বলে তাদের মনেও গোপনে লোভ নিজের আসন পেতে নেয়। মাঝে মাঝে তারাও লোভে পড়ে লোভী হয়ে কোনো-না-কোনো জিনিসের পেছনে ছোটে। যখন ছোটে তখন তার খেয়াল থাকে না কতদূর সে ছুটে গেল। কারণ লোভের একটা টান আছে। অদৃশ্য দড়ি দিয়ে লোভ টানতে টানতে মানুষকে তুলে নেয় সুউচ্চ পাহাড়ের চূড়ায়। আবার কখনোও নিয়ে যায় সমুদ্রের গভীরে। আলেয়ার চেয়ে ভয়ংকর এই লোভ। অন্তহীন, সীমাহীন এই লোভ। লোভের কোনো দিগন্ত নেই। লোভের কোনো তীর নেই। হঠাৎ

সমরসেনের মনে হল আমিও তো কম লোভী নই। কোত্থেকে কোথায় এসেছি। একের-পর-এক কত বিপদে পড়ছি। বিপদে পড়েও যখন পেছিয়ে যাচ্ছি না তখন নিশ্চয় নতুন নতুন বিপদের মুখোমুখি হতে এগিয়ে চলেছি। আমার এই চলার পথ বিপদসংকুল। তা সত্ত্বেও আমি থেমে নেই। আমার সঙ্গীদের কয়েক জন মারা গেছে। তার ফলে আমার সঙ্গীদের সঙ্গে আমার দ্বন্দ্বের আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। যেকোনো মুহূর্তে আমার সাথীরা যদি বেঁকে বসে তখন আমাকে আরও জটিল অবস্থায় পড়তে হবে। তাই এখন প্রথম কাজ হল সঙ্গীদের সঙ্গে সম্পর্ক গভীরতর করা।

হঠাৎ সমরসেনের কানে এল ব্যাঘ্রদত্তের নির্দেশ। 'শোনো ব্যাঘ্রযোদ্ধাগণ, কাল আমাদের উৎসবের দিন। অমাবস্যার রাত। রবিবার। খুব ভালো দিন। তাই আজকের রাতটা আমরা এখানেই বিশ্রাম করব। আগামীকাল ঠিক রাত একটার মধ্যে আমাদের হাতির বনে পৌঁছোতে হবে।'

এই ঘোষণা করে ব্যাঘ্রদত্ত একটি পাথরের ওপর বসল। সঙ্গেসঙ্গে তার সৈনিকরাও তাকে ঘিরে বসে পড়ল।

ব্যাঘ্রদত্তের কথা শুনে সমরসেনের মনে আশা জাগল, 'টানা চব্বিশটি ঘণ্টা হাতে সময় আছে। এই সময়ের মধ্যে ব্যাঘ্রদত্তের উপর অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে তাকে এবং তার সৈনিককে জব্দ করা যায়। ইচ্ছা করলে নিজেরাও অনেক সময় বিশ্রাম করতে পারি।' সমরসেন ভাবছে, এমন সময় হঠাৎ একটা থাম ভেঙে পড়ল। পোড়-খাওয়া গোরু যেমন সিঁদুরে মেঘ দেখলে চমকে ওঠে ঠিক সেই রকম ব্যাঘ্রদত্ত চমকে উঠল। সে দাঁড়িয়ে পড়ে চারদিকে সজাগ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। দেখাদেখি তার সৈনিকরাও দাঁড়িয়ে পড়ল। এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে ব্যাঘ্রদত্তের দৃষ্টি যেদিকে নিবদ্ধ হল সেদিকেই ছিল সমরসেন এবং তার সৈনিকগণ।

ষোলো

সমরসেন সৈনিকদের নিয়ে যেখানে লুকিয়েছিল সেইদিকে ব্যাঘ্রদত্ত কিছুক্ষণ তাকিয়ে নিজের সৈনিকদের বলল, 'ওহে, এই পাথরের বাড়ির অন্তরালে কেউ লুকিয়ে আছে বলে মনে হচ্ছে। ওরা হয়তো আমাদের ঘোর বিরোধী, শিবদত্তের অনুচর। তা সে যাই হোক, এখানে যখন এসেছে তখন বন্দি কর।'

ওদের কথা শুনে সমরসেন ভাবল, 'মাত্র ছ-জন সৈনিক নিয়ে ব্যাঘ্রদত্তের বিরুদ্ধে লড়াই করা মূর্খতার পরিচয়। গা-ঢাকা দেওয়া ভালো। যত তাড়াতাড়ি পারি এখান থেকে পালিয়ে যাই। তা না হলে আত্মহত্যার সামিল হবে।'

ইতিমধ্যে ব্যাঘ্রদত্ত তার লোকজন নিয়ে সমরসেন যেখানে ছিল সেখানে পৌঁছে গেল। ফলে সমরসেন তখনকার মতো যুদ্ধ না চাইলেও যুদ্ধে তাকে জড়িয়ে পড়তে হল। যুদ্ধ মানেই জীবন নিয়ে টানাটানি। শত্রুকে হত্যা না করলে নিজেকে মরতে হয়। ফলে ওই ছ-জন সৈনিককে নিয়েই সমরসেনকে ব্যাঘ্রদত্তের কুড়ি জনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হল।

চোখের পলকে ওই পাথরের অট্টালিকার বিভিন্ন আনাচেকানাচে লুকোনোর চেষ্টা করল সমরসেন ও তার সৈনিকগণ। কয়েকটা থাম ছিল ভাঙা। ওই থামগুলোর আড়ালে দাঁড়িয়ে ব্যাঘ্রদত্তের লোকের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। সমরসেন ভাবল, 'ব্যাঘ্রদত্তের কিছু লোককে খতম না করে মুক্তি পাওয়ার কোনো উপায় নেই।'

এদিকে ব্যাঘ্রদত্ত সৈনিকদের যথেষ্ট উত্তেজক কথা বলে, তাদের মনে উত্তেজনা সৃষ্টি করে, সমরসেনের লোককে মেরে ফেলার নির্দেশ দিল। তার নিজের ইচ্ছে ছিল সমরসেনের মোকাবিলা করার।

ব্যাঘ্রদত্তের ইচ্ছে যাই থাকুক, ইতিমধ্যেই সমরসেনের তরবারির আঘাতে তার দলের চার-পাঁচ জনের মৃত্যু ঘটেছে। যারা আহত হল তারা কিন্তু চুপ করে রইল না। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে লাগল। ওদের আর্তনাদের কাতর ধ্বনি ওই ভবনের দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে এমন আবহাওয়া সৃষ্টি করল যাতে
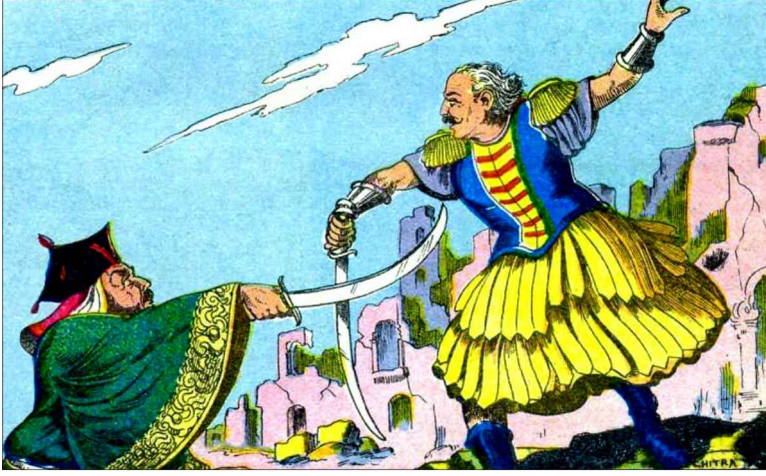
মনে হল, প্রায় অর্ধেক লোক আহত হয়েছে। এ-রকম একটা অবস্থায় হঠাৎ ব্যাঘ্রদত্ত সমরসেনের সামনে পড়ে গেল। চোখের পলকে দুই ক্ষমতাবানের মধ্যে অসিযুদ্ধ শুরু হল। ওদের তরবারির তীব্র ঝনঝনায় গোটা বাড়ি স্তম্ভিত হল। এক এক সময় তরবারির আঘাতে এক-একটা থাম ভেঙে যেতে লাগল। সমরসেনের সুতীব্র আঘাতে ব্যাঘ্রদত্ত ক্ষতবিক্ষত হল। সমরসেনের চেয়ে সে বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। যে মুহূর্তে সমরসেন টের পেল যে ব্যাঘ্রদত্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সেই মুহূর্তে সে তার আক্রমণ তীব্রতর করল।

ওদিকে সমরসেন যখন প্রচণ্ড জোরে ব্যাঘ্রদত্তের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল সেইসময় সমরসেনের দু-তিনটি সৈনিক আহত অবস্থায় ব্যাঘ্রদত্তের সৈনিকদের হাতে বন্দি হল। বন্দি করতে পেরে যথেষ্ট উৎসাহিত হয়ে ব্যাঘ্রদত্তের সৈনিকগণ তাদের নেতাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এল।

সমরসেন অনেকক্ষণ নিজের লোকের কোনো আওয়াজ না পেয়ে মনে মনে ভাবতে লাগল ওদের সম্পর্কে। একসময় তার মনে প্রশ্ন জাগল, 'তাহলে কি আমার সৈনিকরা ব্যাঘ্রদত্তের সৈনিকদের হাতে বন্দি হয়েছে? ব্যাঘ্রদত্তের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে সুযোগ বুঝে পালাতে হবে।'

এ ধরনের কথা ভাবতে ভাবতে প্রবল বিক্রমে সমরসেন ব্যাঘ্রদত্তকে আক্রমণ করতে লাগল। যুদ্ধ করতে করতে সমরসেন একটি দেওয়ালের ওপরে উঠে গেল। ওপরে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করার সময় সমরসেন ভাবতেই পারেনি দেওয়ালটা ভাঙা।

ব্যাঘ্রদত্তের লোক সমরসেনের প্রত্যেকটি সৈনিককে বন্দি করে ব্যাঘ্রদত্তকে কৌশলে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এল। সমরসেন দেওয়ালের ওপর থেকে
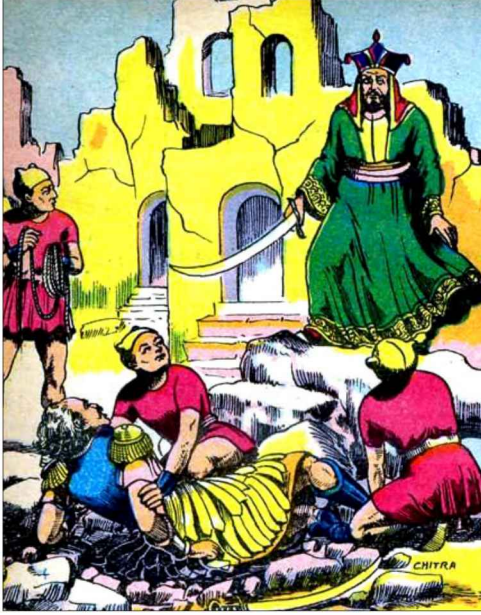
ব্যাঘ্রদত্তের ওপর লাফিয়ে পড়ার উপক্রম করল। সমরসেন এমনভাবে লাফাতে গেল যে ব্যাঘ্রদত্ত যা আশা করেছিল তাই হল। ওই লাফানোর ফলে দেওয়ালটা পেছন দিকে পড়ে গেল। সমরসেন ছিটকে পড়ল দেওয়ালের ওপারে। অগত্যা অনেকগুলো পাথরের মধ্যে দাঁড়িয়ে সে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। সে যে কি করবে ভেবে পেল না।

তাকে অসহায় অবস্থায় দেখে আনন্দে চিৎকার করে ব্যাঘ্রদত্ত তার উপর হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল। অন্যদিক থেকে ব্যাঘ্রদত্তের লোক মহানন্দে এগিয়ে এসে সমরসেনকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল। সেই অবস্থায় সমরসেন বন্দি হল। তার হাত-পা বেঁধে ফেলল। সমরসেনের তরবারি ব্যাঘ্রদত্ত কেড়ে নিল। তার করার কিছুই ছিল না। সে নিরুপায় হয়ে ওদের কাণ্ডকারখানা দেখছিল। সমরসেন জানে না তার ক-টা সৈনিক বেঁচে আছে, ক-টা বন্দি দশায় আছে আর ক-টা কোথায় আছে।

সমরসেনকে বন্দি করার আনন্দে আত্মহারা হয়ে নিষ্ঠুর হাসি হেসে ব্যাঘ্রদত্ত তাকে বলল, 'তাহলে শেষপর্যন্ত তুমি আমার হাতে বন্দি হলে? আগেভাগে যদি ধরা দিতে তাহলে তোমাকে এই করুণ অবস্থায় পড়তে হত না। যাক শোনো, শুনলে হয়তো তোমার দুঃখ একটু বাড়বে, তবু বলছি। অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন শকাইয়ের সেই ত্রিশূল কোথায় যে সুরক্ষিত আছে তা আমি জানি। আর এও জানি যে তোমার মৃত্যু আমার হাতে। দুনিয়ার কোনো কিছুই আর তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। তুমি ভেবেছিলে আমার সৈনিকদের শেষ করে ফেলতে পারবে। তুমি বোধ হয় আমাকেও মেরে ফেলার স্বপ্ন দেখেছিলে। যাই হোক, তোমার জীবন এখন আমার হাতের মুঠোয়। তুমি নিরস্ত্র, তুমি অসহায়।'

সমরসেন শুধু ব্যাঘ্রদত্তের দিকে তাকিয়ে রইল। তার মনে তখন অন্য চিন্তা। সে ভাবছিল 'আমার নেতৃত্বে যে সৈনিকরা এসেছিল তারা হয়তো জীবন

দিয়েছে। প্রত্যেক সৈনিকের জীবন অমূল্য জীবন। আমার অযোগ্য পরিচালনার ফলে ওদের মৃত্যু ঘটেছে। এখন আমি কী করব? ব্যাঘ্রদত্তের কাছে আত্মসমর্পণ করব? যে সৈনিকরা আমার নির্দেশে যুদ্ধ করতে করতে মৃত্যুবরণ করেছে তারা তো জীবন ফিরে পাবে না।' অতএব ব্যাঘ্রদত্তের মতন বিধর্মী, নিষ্ঠুর, নীতিহীন লোকটার কাছে আত্মসমর্পণ করব না।'

সমরসেন যখন এইসব কথা ভাবছিল তখন ব্যাঘ্রদত্ত তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাবল, 'ওরে শুয়োর, তোমার মতলব আমি বুঝতে পেরেছি। তুমি যে কেন চুপচাপ আমার কথাগুলো হজম করছ, আমি তোমাকে এত খারাপ কথা বলছি তা সত্ত্বেও তুমি যে কেন জবাব দিচ্ছ না তা আমি বুঝতে পেরেছি। তুমি অপেক্ষা করছ এমন একজনের যে এসে আমার বলিষ্ঠ খপ্পর থেকে তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। ওরে মূর্খ, তোমার সেই স্বপ্ন কখনো সফল হবে না।' এ ধরনের কথা ভাবলেও ব্যাঘ্রদত্তের মনে আশঙ্কা জাগল, হয়তো সমরসেনের কেউ আছে। মনের কথা চাপতে না পেরে ব্যাঘ্রদত্ত শেষে বলেই ফেলল, 'ওহে সমরসেন, তুমি যতই এদিক-ওদিক তাকাও এখানে তোমাকে উদ্ধার করার কেউ নেই। আমি জোর গলায় বলতে পারি তোমাকে বাঁচাতে এখানে কেউ আসবে না।' ব্যাঘ্রদত্তের এই কথা বলার উদ্দেশ্য ছিল অন্য। সে ভেবেছিল, সমরসেন আবেগে বলে ফেলবে তার উদ্ধারকারীর নাম।

সমরসেন মনে মনে হেসে ভাবল, 'ব্যাঘ্রদত্ত যখন একটা আশঙ্কা করছে তখন এমন কিছু করা যায় যাতে সে আরও ভয় পেয়ে অন্য ধরনের কিছু করে ফেলে।' সে রক্তচক্ষু করে গর্জে উঠল, 'শোনো ব্যাঘ্রদত্ত, তোমার মাথায় বুদ্ধি যে একটু কম আছে তা আমি বুঝতে পেরেছি। তুমি ভাবছ শকাইয়ের অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন ত্রিশূল কোথায় আছে তা একমাত্র তুমিই জানো। কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ তুমি যা জানো তা অন্যেরাও জানতে পারে। শুধু তাই নয় তুমি ভেবেছ ত্রিশূলটা সেখানেই আছে। সেখানে তো এখন নাও থাকতে পারে। যাই হোক, তোমার অহংকার নিয়ে তুমি থাক, আমার কিছু বলার নেই।'

সমরসেনের কথা শুনে ব্যাঘ্রদত্ত হকচকিয়ে গেল। একমাত্র শিবদত্ত জানে যে, শকাইয়ের ত্রিশূল ওই নগরের হাতির বনে আছে। সমরসেন হয়তো আড়াল-আবডাল থেকে শুনে থাকবে।

'সমরসেন তুমি আড়াল থেকে, আড়ি পেতে শুনে ভেবে নিয়েছ, তুমি যা জানো তা-ই সত্য। আর যাই হোক, আমি খুব ভালোভাবেই জানি যে, তোমার এবং শিবদত্তের মধ্যে এখনও ঐক্য স্থাপিত হয়নি। আমি ছাড়া একমাত্র শিবদত্ত জানে, ওই ত্রিশূল কোথায় আছে। ভালো কথা, তোমরা দু-জনে কি ঠিক করেছ আমাকে ফাঁকি দিয়ে ওই ত্রিশূল হাতিয়ে নেবে? তোমাদের সে গুড়ে বালি।'

জবাবে সমরসেন কোনো কথা না বলে এমন হাসি হাসল যাতে ব্যাঘ্রদত্তের মনে প্রশ্ন জাগে, আশঙ্কা ঢোকে। সমরসেন যা ভেবেছিল তাই হল। ব্যাঘ্রদত্ত আশঙ্কাভরা দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল।

তার ওই অবস্থা দেখে সমরসেন দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, 'শোনো ব্যাঘ্রদত্ত, ত্রিশূল কিন্তু তুমি পাবে না। আমাকে বন্দি করলেই, তুমি হয়তো ভেবেছ ত্রিশূল উদ্ধার করতে পারবে। কিন্তু তোমার সেই ধারণা ভুল। আমি একাই তো ত্রিশূলের সন্ধানী নই যে আমাকে বন্দি করলেই তোমার পথ প্রশস্ত থাকবে? তুমি ত্রিশূল উদ্ধার করতে পারবে? তুমি আমাকে বন্দিদশায় রেখে ত্রিশূল উদ্ধার করতে যাওয়ার অনেক আগেই তোমাকে মাঝপথ থেকে ফিরিয়ে দেওয়ার লোক আছে। যে

তোমাকে ফিরিয়ে দেবে আমি তারই নির্দেশে তোমাদের হাতে ধরা দিয়েছি। এটা আমাদের একটা কৌশল মনে করতে পার।'

গম্ভীর গলায় ব্যাঘ্রদত্ত বলল, 'সমরসেন, মিথ্যে কথা বলার একটা সীমা থাকা উচিত। সাহস থাকলে বল সেই লোকটির নাম।'

'নাম চারচোখো।' সমরসেন বলল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ব্যাঘ্রদত্ত বলল, 'তাহলে তুমি চারচোখোকে চেনো?'

'চিনি মানে! বলছি তো তারই নির্দেশে আমরা এখানে এসেছি। এটা আমাদের একটা কৌশল। যুদ্ধ সবসময় মুখোমুখি হয় না। একটু বাঁকা পথও নিতে হয়।' সমরসেন বলল।

এমন সময় ব্যাঘ্রদত্তের একটা লোক এসে বলল, 'প্রভু, শিবদত্ত সদলবলে এই ভবনের দিকে এগিয়ে আসছে। ওদের দেখে মনে হচ্ছে ওরা এই ভবন দখল করতে আসছে।'

তার কথা শুনে ব্যাঘ্রদত্ত ভেবে পেল না শিবদত্তের মোকাবিলা করবে না পালিয়ে বাঁচবে। যদি পালাতে হয় তাহলে সমরসেনকে কী করবে? সমরসেনকে যদি মেরে ফেলে তাহলে চারচোখো রেগে যাবে। চারচোখো যদি রেগে যায় তাহলে ব্যাঘ্রদত্ত এবং তার দলের কেউ আর বাঁচবে না!

ব্যাঘ্রদত্ত বলল, 'সমরসেন এতক্ষণ যা ঘটেছে সে-টা যদি তুমি ভুলে গিয়ে আমার সঙ্গে সন্ধি করতে চাও তাতে তোমার এবং আমার উভয়েরই মঙ্গল হবে। এখনকার মতো, এখান থেকে সরে পড়ে আমাদের নিজেদের স্বার্থের বিষয় নিয়ে অন্য কোনো গোপন জায়গায় আলোচনা করতে পারি।'

তারপর সমরসেন ওই নিরস্ত্র অবস্থায় সেখান থেকে রওনা দিল। ব্যাঘ্রদত্ত এবং তার লোকজন সমরসেনের সঙ্গে গেল। ওই ভবনের একদিক থেকে ওরা বের হল আর অন্যদিকে শিবদত্তের লোকজনের পদধ্বনি শোনা গেল।

সতেরো

শিবদত্ত নগরে এসে গেছে শুনে মনে মনে সমরসেন খুব খুশি হল। এখন পর্যন্ত সমরসেনের ধারণা কীভাবে শিবদত্তের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করা যায়। এই শিবদত্ত যদি কিছুক্ষণ আগে আসত সমরসেনের ধারণা তাকে বন্দি হতে হত না। উপরন্তু সে এবং সমরসেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে ব্যাঘ্রদত্তের বিরুদ্ধে লড়ে ত্রিশূলটাকে জোগাড় করে নিতে পারত।

এখন সমরসেন ভাবতে পারছে না ব্যাঘ্রদত্ত তাকে নিয়ে কী করবে। ব্যাঘ্রদত্ত ইচ্ছে করলেই তাকে মেরে ফেলতে পারে। বাধা দেবার কেউ নেই। সমরসেন ভাবল, 'এই সময় চারচোখো যদি এদিকে আসত তাহলে কত ভালো হত।'

এদিকে ব্যাঘ্রদত্ত ভাবছে, 'এ তো আচ্ছা মুশকিলে পড়া গেল। সমরসেনকে কী করি! ওকে মেরে ফেললে এই দ্বীপে ওর পক্ষ নিয়ে আমাকে কে আক্রমণ করবে? সত্যি চারচোখোর সঙ্গে সমরসেনের কি বন্ধুত্ব আছে?' ব্যাঘ্রদত্তের মনে এই সন্দেহ এবং সংশয় তীব্রভাবে জাগল। এইসব সন্দেহের দোলায় দুলতে দুলতে মাঝে মাঝে সে ভয় পেল।

অনেকক্ষণ ভেবে সে ঠিক করল, আর যাই হোক সমরসেনকে এক্ষুনি হত্যা করবে না। এসে সে কৌশল করবে। কারও বিরুদ্ধে লড়তে হলে কাকে নিয়ে লড়ব সেটা ঠিক করতে হবে। সে ঠিক করল, বন্ধুত্বের ভান করে সমরসেনের সাহায্যে শিবদত্তকে আক্রমণ করবে। এই আক্রমণ অত্যন্ত প্রয়োজন এবং সেই প্রয়োজন মেটাতে হলে সমরসেনের মতো লোকের সাহায্য নেওয়া অনিবার্য।

ব্যাঘ্রদত্তসহ সবাই পাহাড়ের উঁচু-নীচু পথ দিয়ে ছুটে পালাচ্ছিল। অনেক দূর ছুটে যাওয়ার পর ব্যাঘ্রদত্ত সমরসেনকে বলল, 'ভাই, কিছু মনে করো না, অনেক দূর তোমাকে ছোটালাম। এর জন্য আমি দুঃখিত। আমরা এখন শত্রুদের অনেক পেছনে ফেলে এসেছি। আর ভয় নেই। ওরা আর আমাদের নাগাল পাবে না। এখন আমরা একটু বিশ্রাম করতে পারি।'

ব্যাঘ্রদত্তের কথা শুনে সমরসেন অবাক হয়ে গেল। যতই হোক সে বন্দি। বন্দির সঙ্গে ব্যাঘ্রদত্ত যে-ধরনের কথা বলল তাতে অবাক হবারই কথা। সবচেয়ে মজার কথা, কথায় কথায় শিবদত্তকে সমরসেনের শত্রু হিসেবে গণ্য করা। কিন্তু আসলে তো সে সমরসেনের বন্ধু।

আর থাকতে না পেরে সমরসেন বলল, 'ভাই বলেছ বলেই আমিও আমার মনের কথা বলছি। এখানে আসার পর থেকে শিবদত্তের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছে। শিবদত্ত যদি আমার বন্ধু হয়ে থাকে তাহলে সে

তোমার শত্রু, আমার নয়। আমি তাকে শত্রু হিসেবে গণ্য করতে পারি না।'

একটানা অনেকটা ছোটার ফলে ব্যাঘ্রদত্ত হাঁপাচ্ছিল। সমরসেনের কথা শুনে সে ভেবে পেল না কী বলবে। সে তক্ষুনি কোনো জবাব দিল না। সে মনে মনে ঠিক করল যেকোনোভাবে সমরসেনকে হাতে রাখবে। ওকে হাতে রাখতে হলে, ও যাদের বন্ধু ভাবছে তারা যে আসলে কত খারাপ লোক তা আস্তে আস্তে বোঝাতে হবে।

'সমরসেন, আমার মনে হচ্ছে তুমি শিবদত্তকে চিনতে পারনি। আসলে আমি তোমাকে বন্দি করেছি বলেই তুমি আমাকে ঘোরতর শত্রু ভাবছ। আমি তোমাকে এখনই মুক্তি দিলাম। মুক্তির পর আমরা পরস্পরের বন্ধু হতে পারি।' ব্যাঘ্রদত্ত সবিনয়ে বলে নিজের লোককে ইশারা করল।

ইশারায় নির্দেশ পেয়ে ব্যাঘ্রদত্তের লোক সমরসেনের বাঁধন খুলে দিল। ইতিমধ্যে সমরসেনও মনে মনে ঠিক করল, সে ব্যাঘ্রদত্তের বিরুদ্ধে এক্ষুনি কিছু করবে না।

'শকাইয়ের ত্রিশূল যে কতটা ক্ষমতার অধিকারী, সেই ত্রিশূল সংগ্রহ করতে পারলে কারও কোনো কিছুর যে অভাব হবে না সেটা আমরা দু-জনেই জানি। আর সেই ত্রিশূল যে কোথায় আছে সেটা তুমি যেমন জানো আমিও তেমনি জানি। কিন্তু এক্ষুনি ওই ত্রিশূল সংগ্রহ না করলেই কি নয়? কীসের আশায়, কোন প্রয়োজনে এত ছটফট করছ?' সমরসেন প্রশ্ন করল।

এই প্রশ্ন শুনে ব্যাঘ্রদত্ত রীতিমতো ঘাবড়ে গেল। পরক্ষণেই তার মনে হল সমরসেন বুঝি ওই আধডোবা জাহাজের কথা জানে না। হঠাৎ তার

মনে হল কোন উদ্দেশ্যে সমরসেন ওই দ্বীপে এসেছে। সে তো এসেছে এই দ্বীপ থেকে অঢেল ধনসম্পত্তি নিয়ে যেতে। সে ভাবল, 'এখন সমরসেনকে ওই আধডোবা জাহাজের ব্যাপারে কিছু বলা যায়।'

'সমরসেন, তুমিও জানো আমিও জানি, ওই আধডোবা জাহাজে কি আছে? দু-জনেই যখন জানি, পরস্পরকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা বৃথা। আমি একটা কথা ভেবেছি। আমি যা ভেবেছি তা বলছি। আমার কথা ভালোভাবে শুনে, ভেবে জবাব দেবে। ওই জাহাজের ধনসম্পত্তি উদ্ধার করে আমরা যদি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিই, তাতে কি তোমার আপত্তি আছে?' ব্যাঘ্রদত্ত বলল।

'আপত্তির কী থাকতে পারে। কিন্তু তার আগে জানতে হবে ওই তান্ত্রিকগুলো কোথায় আছে, কী করছে!' সমরসেন হাসতে হাসতে বলল।

'তুমি কেন হাসছ আমি বুঝতে পেরেছি। জাহাজটাতে যে খালি হাতে যাওয়া যাবে না তা আমি জানি। সেখানে যাওয়ার আগে আমরা নিশ্চয় ত্রিশূল উদ্ধার করব। ত্রিশূল হাতে থাকলে জগতে এমন কোনো শক্তি নেই যা আমাদের কাজে বাধা দিতে পারে।' ব্যাঘ্রদত্ত বলল।

এই কথা শুনে সমরসেন হো-হো করে হাসল। ওই হাসি ব্যাঘ্রদত্তের ভালো লাগল না। সে কিছুটা বিরক্ত হয়ে সন্দেহের দৃষ্টিতে সমরসেনের দিকে তাকাল।

'শকাইয়ের ওই ত্রিশূল তোমার আগে শিবদত্ত যে পেতে পারে সে-কথা কি কল্পনা করেছ? অবস্থাটা একটু না বুঝে কথা বললে একটু হাসি পাবে বই কী। তাতে অত বিরক্ত হওয়ার কিছু নেই।' সমরসেন বলল।

'বিরক্ত এমনি হইনি। তুমি হয়তো জানো না যে ত্রিশূল যে কোথায় আছে তা শিবদত্ত জানে না। তা ছাড়া তুমি ভুলে গেছ ওদের বিরুদ্ধে আমার লোক লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। আমার লোককে হারিয়ে দিয়ে ওকে এগোতে হবে। সেটা যে এই মুহূর্তে কতখানি সম্ভব তাও ভেবে দেখার বিষয়। আমি যখন হাসি অথবা বিরক্ত হই তখন তার পেছনে তাৎপর্য থাকে। ত্রিশূল যে ঠিক কোথায় আছে তা জানতে হলে খুঁজে বের করতে হবে হাতির বনের বিষবৃক্ষ। সেখানে যাওয়ার মানচিত্র কি শিবদত্তের কাছে আছে?' বেশ মেজাজে ব্যাঘ্রদত্ত বলল।

ওর কথা শেষ হতে-না-হতেই একচোখোকে তাড়া করা কাপালিকের গগনভেদী কণ্ঠস্বর শোনা গেল। ওর গলা শুনে সমরসেন ঝট করে উঠে দাঁড়াল। সঙ্গেসঙ্গে ব্যাঘ্রদত্তও দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। তার সঙ্গীরা ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল। সেই মুহূর্তে সেখানে যে কাপালিক

হাজির হবে তা কেউ ভাবতে পারেনি। সমরসেন বলল, 'এ হল চারচোখো কাপালিক। তোমার উচিত তাড়াতাড়ি গুহার ভেতরে ঢুকে আত্মগোপন করা।'

ব্যাঘ্রদত্ত সন্দেহের চোখে সমরসেনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি তো বলেছিলে চারচোখো তোমার বন্ধু। সেটাই যদি সত্য হয় তাহলে অত ভয় পাবার কী আছে? আমার কীরকম যেন লাগছে। তুমি কি আমার কাছে কিছু লুকোচ্ছ?'
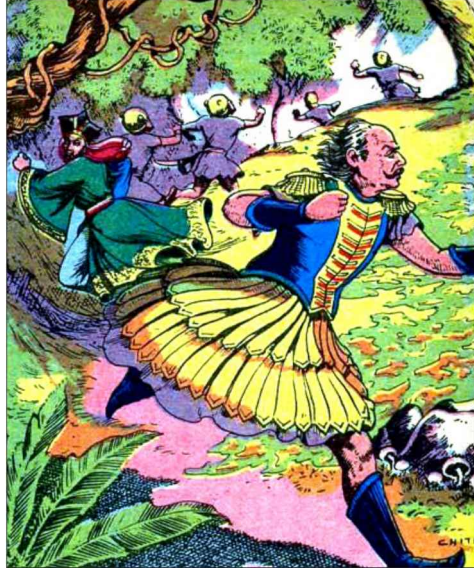
সমরসেন কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে ব্যাঘ্রদত্তকে বলল, 'দেখ, আমি যা বলি তাতে সন্দেহ করা উচিত নয়। আর এটা মনে রেখ, আমি যা বলি তা একটু ভেবে বলি। তোমাদের এই দ্বীপে এসে লক্ষ করেছি প্রত্যেকে, একে অন্যকে শত্রু মনে করে, কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। আমার আশঙ্কা চারচোখোর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার আগেই চারচোখো বা তার পোষা কেউ তোমাকে না আক্রমণ করে। একবার দুর্ঘটনা ঘটে গেলে কিছু করার থাকবে না।' সমরসেন এমনভাবে বলল যেন সে ব্যাঘ্রদত্তের মঙ্গল কামনা করে।

সমরসেনের কথা শেষ হতে-না-হতেই, 'কাপালিক! কালভুজঙ্গ!' একচোখোর কণ্ঠস্বর ভয়ংকর গম্ভীরগলায় শোনা গেল। ওই ধ্বনি শুনে ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে ব্যাঘ্রদত্ত এবং তার লোকজন ছুটে পালিয়ে গেল। সমরসেন ভাবল, এই হল পালানোর মোক্ষম সুযোগ। সে তৎক্ষণাৎ অন্যদিকে পালিয়ে গেল।

অনেক দূর ছোটার পর ব্যাঘ্রদত্ত পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখে সমরসেন নেই। তার মনে সন্দেহ জাগল, 'সমরসেন কি ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল? চারচোখো ও শিবদত্তের মতো অত শক্তিশালী লোক যদি ওর বন্ধু হয়ে থাকে তাহলে সে পালিয়ে গেল কেন? তাহলে কি সমরসেন আমার কাছে মিথ্যা কথা বলে আমাকে ধোঁকা দিচ্ছে?'

ব্যাঘ্রদত্ত এই ধরনের কথা ভাবছিল। এমন সময় একচোখো সেখানে পৌঁছে গেল। একচোখো ব্যাঘ্রদত্তকে দেখল। রাগে দাঁত কটমট করতে করতে একচোখো বলল, 'কাপালিক, কালভুজঙ্গ ধর ওদের। ওই চারচোখোর অনুচরদের আমি এক্ষুনি হত্যা করব। ওদের শেষ না করে আমার শান্তি নেই।'

এতক্ষণে ব্যাঘ্রদত্ত গোটা পরিস্থিতি অনুধাবন করল। সে বুঝতে পারল, 'যে লোকটা ধমক দিয়ে নির্দেশ দিচ্ছে সে সমরসেনের বন্ধু চারচোখো নয়। সমরসেন আমার ছোটাছুটির সুযোগ নিয়ে পালিয়ে গেছে। আমাকে ধোঁকা দিয়েছে। এখন কী করি? একচোখোর শত্রু তো চারচোখো। এখন আমি

এই একচোখোকে যদি বোঝাতে পারি যে আমি চারচোখোর শত্রু তাহলে সহজেই এখনকার মতো বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে পারি।'

একচোখোর নির্দেশ পেয়েই কাপালিক এবং কালভুজঙ্গ ব্যাঘ্রদত্ত এবং তার লোকজনকে ঘিরে ফেলল। সে এক অদ্ভুত অবস্থা। ওরা না পারছে এক-পা এগোতে আর না পারছে প্রতিআক্রমণ করতে। অসহায়ভাবে যে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। তাদের ওই অসহায় অবস্থা দেখে হো-হো করে হাসতে হাসতে একচোখো ব্যাঘ্রদত্তের সামনে এল। এতক্ষণে একচোখোর ভুল ভাঙল। দূর থেকে সে ব্যাঘ্রদত্ত ও তার লোকজনদের ভেবেছিল সমরসেন ও তার লোকজন। কিন্তু মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বুঝল এ সে নয়। একচোখো ওদের সামনে দাঁড়িয়ে, কটমট করে ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমরা কারা? কীসের জন্য এখানে ঘোরাঘুরি করছ? তোমরা কি কুম্ভাণ্ড এবং তার অনুচর?'

একচোখোর কথা শুনে ব্যাঘ্রদত্ত ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল। সে বুঝতেই পারল না কে কুম্ভাণ্ড। তবু প্রশ্ন যখন এসেছে তখন জবাব দিতেই হবে। তাই সে বুকে সাহস এনে বলল, 'আমি ব্যাঘ্রদত্ত। আমি এই ব্যাঘ্রমণ্ডলীর রাজা। আপনি যে কুম্ভাণ্ডের কথা বলছেন তাকে আমি চিনি না।'

'আচ্ছা তোমরা সমরসেনের নাম শুনেছ? তাকে দেখেছ? তার হদিস দিতে পার?' একচোখো বলল।

একচোখোর প্রশ্ন শুনে ব্যাঘ্রদত্ত বলল, 'হে তান্ত্রিক মহাশয়, আপনার অসীম ক্ষমতা সম্পর্কে আমি কিছুটা জানি। আপনি যে সমরসেনের কথা বলছেন সে আমার কাছে বন্দি ছিল। তাকে মুক্ত করেছি।'

ব্যাঘ্রদত্তের কথা শুনে একচোখো বলল, 'আমি তো ভেবে পাচ্ছি না, সমরসেনের সঙ্গে তোমার ঝগড়া হল কেন?'

ব্যাঘ্রদত্ত তৎক্ষণাৎ জোড়হাত করে বলল, 'আপনি সর্বজ্ঞ। আমি আপনাকে বলে কতখানি বোঝাতে পারব। আপনি ইচ্ছে করলে সব কিছু বুঝে নিতে পারবেন।'

আঠারো

এখন একচোখো আর ব্যাঘ্রদত্ত দু-জনেই পরিষ্কার বুঝতে পারল সমরসেন তাদের কীভাবে ঠকিয়েছে। ধনভাণ্ডারে ভরা জাহাজের উপর তারও যে নজর ছিল সেটা এখন ওদের কাছে জলের মতো পরিষ্কার।

'ধনরত্নে ভরা ওই জাহাজকে করায়ত্ব করা সাধারণ মানুষের কাজ যে নয় তা কি তুমি জানো না?' একচোখো প্রশ্ন করল। এই প্রশ্নের জবাবে মাথা নেড়ে সম্মত হয়ে ব্যাঘ্রদত্ত বলল, 'শকাইয়ের ত্রিশূলটা আছে?'

শকাইয়ের ত্রিশূলের কথা শুনেই একচোখো হতবাক হয়ে গেল। একচোখোর ধারণা ছিল ওই ত্রিশূলের খবর একমাত্র সে জানে আর জানে তান্ত্রিক চারচোখো। ব্যাঘ্রদত্তের জানার কথা নয়।

কথার পিঠে কথা এগিয়ে গেল। একচোখোর নানা প্রশ্নের জবাবে ব্যাঘ্রদত্ত প্রাণের ভয়ে ত্রিশূল যে সেই হাতির বনে আছে তা জানিয়ে দিল। শিবদত্ত যে ওটার জন্য চেষ্টা করছে, সঙ্গে সমরসেনও যে লেগে আছে এসব কথাই ব্যাঘ্রদত্ত বলে ফেলল। তার কথা শুনে একচোখো রীতিমতো আশঙ্কায় কাঁপতে লাগল।

'ব্যাঘ্রদত্ত এখন আমাদের যদি কাজ উদ্ধার করতে হয় তাহলে সব ঐক্যবদ্ধ হয়ে করতে হবে। আমার ধারণা সমরসেনকে এক সাধারণ তান্ত্রিক, চারচোখো সাহায্য করছে। তাই আমাদের কর্তব্য হবে ত্রিশূল যেখানে আছে সেখানে তাড়াতাড়ি যাওয়া আর ত্রিশূল উদ্ধার করা। জায়গাটা তুমি জানো। তুমি সামনে হাঁটো। আমি তোমার পিছনে আছি।' একচোখো বলল।

কিছুদূর যাওয়ার পর একচোখো চিৎকার করে বলল, 'কাপালিক! কালভুজঙ্গ! তোমরা এগিয়ে যাও। এগিয়ে গিয়ে সমরসেনকে খোঁজ।'

নির্দেশ পাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই একচোখোর আজ্ঞাবাহীরা যেভাবে ছুটে গেল তাতে ব্যাঘ্রদত্ত রীতিমতো ভয় পেল। বেশ কিছুক্ষণ পরে চারচোখোর আজ্ঞাবাহী সেই পেঁচা একচোখোর মাথার ওপর পাক খেতে লাগল। পাক খেতে খেতে সে বলতে লাগল, 'চারচোখো, একচোখো, একচোখো। চারচোখো, একচোখো, একচোখো।'

এই ঘোষণা শুনে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে একচোখো হাত দিয়ে চোখ বুঁজে ফেলল। ডান হাতে তরবারি ঘোরাতে ঘোরাতে সে চিৎকার করতে লাগল, 'কাপালিক! কালভুজঙ্গ!'

একচোখো যতই চিৎকার করুক না কেন তার আজ্ঞাবাহীরা এল না। একচোখো ভাবতে লাগল কী করবে। এমন সময় কালপেঁচা সেখান থেকে উড়ে গেল।

ব্যাঘ্রদত্ত এবং একচোখো হাতির বনে ঢুকল। ঢোকার পর ব্যাঘ্রদত্ত বলল, 'একচোখো, এটাই হাতির বন। এই যে পাতাগুলো সাপের ফণার মতো ফোঁস ফোঁস করছে, এগুলো কোন বৃক্ষের পাতা জানো? এই পাতাগুলো হল বিষবৃক্ষের। ওই যে সমাধিটা দেখা যাচ্ছে, ওর নীচে আছে শকাইয়ের ত্রিশূল।'

এই কথা শুনে একচোখো খুব খুশি হল। সে বলল, বাঃ! খুব ভালো হল ব্যাঘ্রদত্ত। আরে ওই তো শিবদত্ত এদিকেই আসছে। তুমি এক কাজ কর লোকজন নিয়ে তুমি শিবদত্তের মোকাবিলা কর। ত্রিশূলের ব্যাপারটা আমি দেখছি।' বলে ব্যাঘ্রদত্তকে উৎসাহিত করে শিবদত্তের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য পাঠিয়ে দিল।

ব্যাঘ্রদত্ত অন্য কোনো কথা চিন্তা না করে, তৎক্ষণাৎ, ওদের সঙ্গে যে ক-জন লোক ছিল তাদের নিয়ে শিবদত্তের বিরুদ্ধে লড়তে এগিয়ে গেল।
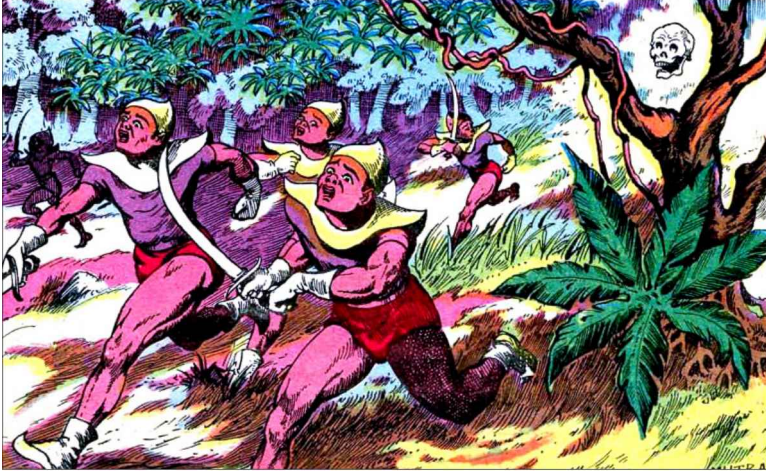
ব্যাঘ্রদত্তের কাছে যত লোক ছিল শিবদত্তের কাছে তার তিনগুণ লোক ছিল। তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই শিবদত্তের লোক ব্যাঘ্রদত্তের লোককে ধরাশায়ী করে ফেলল।

ব্যাঘ্রদত্তের অবস্থা দেখে একচোখো আরও ঘাবড়ে গেল। সে প্রাণপণে চিৎকার করতে লাগল, 'কাপালিক! কালভুজঙ্গ!' এবারে ডাক শুনেই তার আজ্ঞাবহরা এল।

ওদের দেখেই শিবদত্তের অনুচররা যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল। তখন মহানন্দে একচোখো বলল, 'ব্যাঘ্রদত্ত, এই হল মোক্ষম মুহূর্ত। এই মুহূর্তটাকে কিছুতেই হাত ছাড়া করা যায় না। সমাধি খোঁড়ার কাজ এক্ষুনি সেরে ফেলতে হবে। তোমার লোকজনকে তাড়াতাড়ি ডাক।'

একচোখোর কথা শুনে ব্যাঘ্রদত্তের মনে হল সত্যই সেটা সুবর্ণ সুযোগ। সমরসেন আর চারচোখো সেখানে আসার আগেই সেই অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন ত্রিশূল উদ্ধার করে নেওয়া উচিত। ব্যাঘ্রদত্ত নিজের লোকজনকে ডাকতে লাগল। তার লোকজন কাজে হাত দেওয়ার আগে ব্যস্ত হয়ে নিজেই খোঁড়া শুরু করে দিল। যেই খোঁড়া শুরু করল অমনি বিষবৃক্ষের প্রত্যেকটি পাতা ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। সেই সমাধি থেকে এক-শো গজ দূরে ছিল ওই বিষবৃক্ষ। অসংখ্য পাতার ফোঁসফোঁসানি শুনে রীতিমতো ভয় পেল ব্যাঘ্রদত্ত।

তান্ত্রিক একচোখো বিষবৃক্ষের কাছে গেল। তার হাতে যে তরবারিটা ছিল সেই তরবারি ধরে, মন্ত্র পড়ে কিছু করার আগেই ব্যাঘ্রদত্তের আর্তনাদ শোনা গেল। ওই আর্তনাদ কানে যেতেই একচোখো ঘুরে তাকিয়ে দেখল চারচোখোর

আজ্ঞাবাহ নরবানর ব্যাঘ্রদত্তকে দুই হাতে তুলে চরকির মতো ঘোরাচ্ছে। আর কাল পেঁচাটা 'একচোখো, একচোখো' বলে ডাকতে ডাকতে বিষবৃক্ষের দিকে উড়ে যাচ্ছে।

এই দৃশ্য দেখে একচোখো রীতিমতো ঘাবড়ে গেল। পরিষ্কার বুঝতে পারল চারচোখো যখন তার লোকজন নিয়ে পৌঁছে গেছে তখন সমরসেন হয় সেখানে পৌঁছে গেছে নয় আসছে। একচোখো কালভুজঙ্গকে ডেকে নরবানরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিল। ব্যাঘ্রদত্তকে ছুড়ে ফেলে নরবানর কালভুজঙ্গকে ধরল। অন্যদিকে কাপালিক এবং কালপেঁচা পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়তে লাগল।
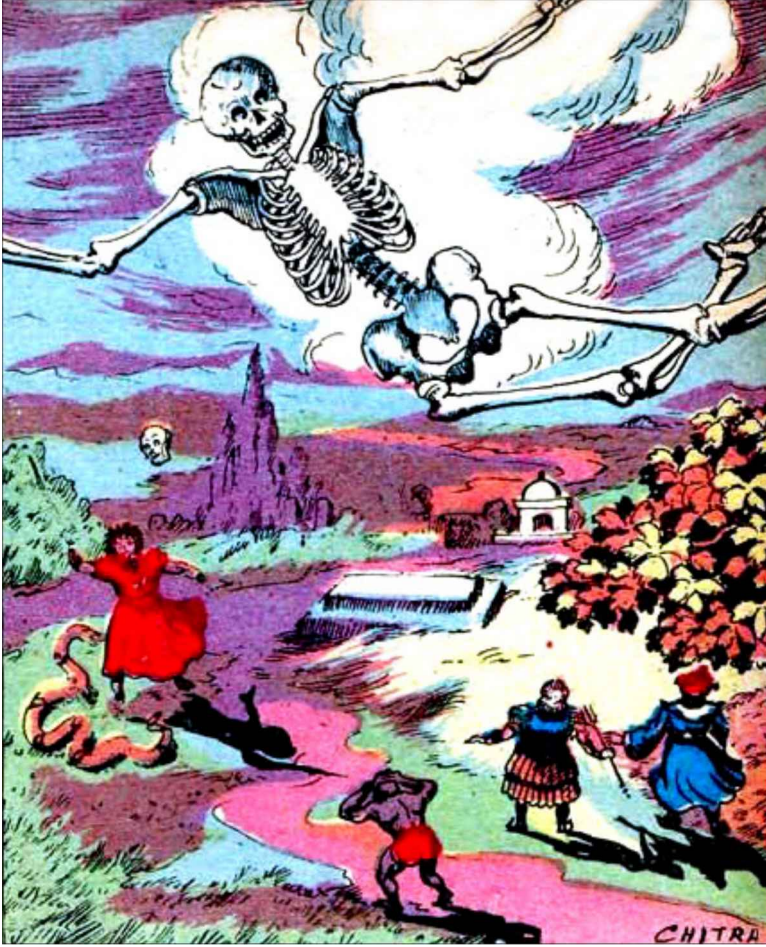
একচোখো আসলে যে চারচোখোকে ভয় করত তা নয়। সে আসলে ভয় করত তার আজ্ঞাবহদের। তার সেই কালপেঁচা আর নরবানর দুটোই ভয়ংকর। ওরা পারে না হেন কাজ নেই। হিংস্র কাজ তারা অতি সহজেই পারে।

ইতিমধ্যে সমরসেন সেখানে পৌঁছে গেল। পলায়মান শিবদত্ত এবং তার অনুচররাও সেখানে হাজির হল। মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে ওঠা ব্যাঘ্রদন্তের লোকজন ওদের মোকাবিলা করার চেষ্টা করল। কালভুজঙ্গ কম হিংস্র ছিল না, তবু নরবানর তাকে পাথরের গদা দিয়ে পেটাতে লাগল। কালপেঁচা কাপালিকের খপ্পর থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে, সুযোগ বুঝে, তাকে আক্রমণ করতে লাগল।

একচোখো পরিষ্কার বুঝতে পারল তার অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সে এমন এক পরিস্থিতিতে পড়ে যাবে যে সে নিজেকেও রক্ষা করতে পারবে না আর অন্য কেউ তাকে সাহায্য করতে আসবে না। মোকাবিলা যখন করতেই হবে তখন আগেভাগেই করা ভালো। চারচোখো কোনোরকম আক্রমণ করার আগেই একচোখো তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু হয়ে গেল চারচোখো ও একচোখোর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ। চারচোখো এবং সমরসেনের মধ্যে আগে থেকে ঠিক করা ছিল। কথা হয়েছিল আগে চারচোখো যাবে তারপর সমরসেন। সমরসেন সমাধি খুঁড়বে। আর চারচোখো অন্যদের মোকাবিলা করবে।

সমাধি খোঁড়ার সময় সমরসেন এবং তার লোকজন সমাধির ভেতর থেকে বিচিত্র ধরনের আর্তনাদ এবং বিকট হাসির শব্দ শুনতে পেল। ওইসব আর্তনাদ এবং হাসির শব্দে সমরসেন একটুও ভয় পেল না। সমরসেনের নির্ভীক মনের পরিচয় পেয়ে তার সৈনিকরাও খুঁড়ে যেতে লাগল। তাদের মনেও ভয় ছিল না।

এত বড়ো সমাধি খুঁড়ে একটি মাত্র অস্থিপিঞ্জর খুঁজে পাওয়া গেল। সেটাই যে গুরুদ্রোহীর অস্থিপিঞ্জর সমরসেন তা বুঝল। সেই অস্থির মধ্যে গোঁজা ছিল শকাইয়ের ত্রিশূল। ত্রিশূলটাকে ধরতে গিয়ে সমরসেনের হাত কেঁপে উঠল। যাই হোক সাহস করে সমরসেন ওই অস্থিপিঞ্জর থেকে ত্রিশূলটাকে তুলে নিল। সঙ্গেসঙ্গে অস্থিগুলো শূন্যে উঠে গেল। শূন্য থকে শোনা গেল, 'গুরু শকাই, আজ আমি অভিশাপ মুক্ত হলাম। এখন আমি ফিরে যাচ্ছি শমন দ্বীপে।' পরক্ষণেই দেখা গেল আকাশপথে অস্থিগুলো চলে গেল।

অস্থিগুলোর আকাশপথে যাওয়ার দৃশ্য দেখে সেখানে যারা ছিল তাদের প্রত্যেকেরই বুক ধড়ফড় করতে লাগল। একচোখো চারচোখোকে আঘাত করার জন্য তরবারি তুলেছিল। সে ওই অবস্থাতেই অস্থিগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। সমরসেন চারচোখোর কাছে এসে শকাইয়ের সেই ত্রিশূল চারচোখোর হাতে দিল।

অনেকক্ষণ ওই অস্থিগুলোর দিকে তাকানোর পর একচোখো চারচোখোর দিকে তাকাতেই তার চোখে পড়ল ঝকঝকে সেই ত্রিশূল। সেটা দেখেই একচোখো ছুটে পালাতে লাগল।

'চারচোখো ওই একচোখোটাকে ছেড়ে দিও না। তাহলে কিন্তু সর্বনাশ হবে।' সমরসেন বলল।

সমরসেনের কথা শুনে চারচোখো হেসে বলল, 'সমরসেন একচোখো কতদূর যাবে? আর যদি যায়, যাক না। ত্রিশূল তো আছে আমাদের। যেকোনো মুহূর্তে যেকোনো জায়গা থেকে তাকে তুলে আনা যাবে। শুধু ত্রিশূলকে একবার বলতে হবে।' সমরসেনকে এই কথা বলেই চারচোখো ত্রিশূলকে বলল, 'যাও, একচোখোকে ধরে নিয়ে এসো।'

চোখের পলকে ত্রিশূল হাওয়ায় উড়ে গেল। পলায়মান একচোখোর বুকে ত্রিশূলটা একেবারে গেঁথে গেল। সে 'মাগো' বলে আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে গেল। পরক্ষণেই ত্রিশূলটা চারচোখোর কাছে এসে গেল। সমরসেন উৎসাহের সঙ্গে বলল, 'চারচোখো, এরপর কাপালিক এবং কালভুজঙ্গকে মেরে আসতে বল।'

চারচোখো হাসিমুখে বলল, 'সমরসেন, একচোখো মারা গেছে। এখন ওদের আর কোনো ক্ষমতা নেই।'

তারপর কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে চারচোখো বলল, 'সমরসেন, আর আমাদের

এখানে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। এক্ষুনি ধনরত্ন ভরা জাহাজের কাছে যেতে হবে।'

ওরা সকলে অরণ্যপথে পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে হাঁটার পর জাহাজের কাছে পৌঁছাল। দেখতে পেলে নাগকন্যাকে।

চারচোখো ত্রিশূলটাকে ধরে, মন্ত্র পড়ে জাহাজের দিকে ছুড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজটা তীরে পৌঁছে গেল।

'আমি শমন দ্বীপের রাজা শকাইয়ের শিষ্য। এই ত্রিশূল মন্ত্রশক্তিসম্পন্ন। গুরুর নির্দেশ অনুসারে তুমি আমার স্ত্রী।' চারচোখো নাগকন্যাকে বলল।

নাগকন্যা চারচোখোকে প্রণাম করল।

চারচোখো সমরসেনের দিকে ঘুরে বলল, ‘সমরসেন, এখন আমরা এই দ্বীপে নিশ্চিন্তে স্বামী-স্ত্রী রূপে বাস করব। এই জাহাজে যত ধনরত্ন আছে, সব কিছু নিয়ে তুমি কুণ্ডলিনী দ্বীপে ফিরে যেতে পার।’

চারচোখোর কথা শেষ হতে-না-হতেই সমরসেন মহানন্দে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হল। টানা একমাস সমুদ্র পথে কাটানোর পর সমরসেন সদলবলে কুণ্ডলিনী দ্বীপে একদিন সকালে পৌঁছাল।

সমরসেন ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে কুণ্ডলিনী দ্বীপ উৎসব মুখর হয়ে উঠল। রাজা চিত্রসেন তো বটেই, প্রত্যেকটি প্রজা দু-হাত তুলে সমরসেনকে অভিনন্দন জানাল। সমরসেনের আনা জাহাজের ধনরত্নে কুণ্ডলিনী দ্বীপের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হল।